প্রেমময় অন্বেষণ
ওঁ বিষ্ণুপাদ জগদ্‌গুরু
শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

।। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়ত ।।

প্রেমময় অন্বেষণ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলবরেণ্য জগদ্‌গুরু

শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

।। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়ত :।।

প্রেমময় অন্বেষণ

প্রবক্তা

ওঁ বিষ্ণুপাদ

পরমহংসকুলবরেণ্য জগদ্‌গুরু

শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি-আচার্য্য

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ তথা শ্রচৈতন্য-সারস্বত

কৃষ্ণানুশীলন সংঘের বর্ত্তমান সেবাইত ও সভাপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-দেবগোস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ মহারাজের

কৃপানির্দ্দেশে

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ

কোলেরগঞ্জ নবদ্বীপ নদীয়া

হইতে প্রকাশিত

প্রকাশক ঃ
শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের পক্ষে
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রপন্ন তীর্থ

বাংলায় অনুবাদ ঃ
শ্রীমতী দেবময়ী দাসী

প্রথম বাংলা সংস্করণ ঃ
শ্রীগৌর আবির্ভাব তিথি
২৮ শে মার্চ, ২০০২

টাইপ সেটিং ও মুদ্রণ ঃ
গিরি প্রিন্ট সার্ভিস
৯১/এ বৈঠকখানা রোড
কোলকাতা —৭০০ ০০৯
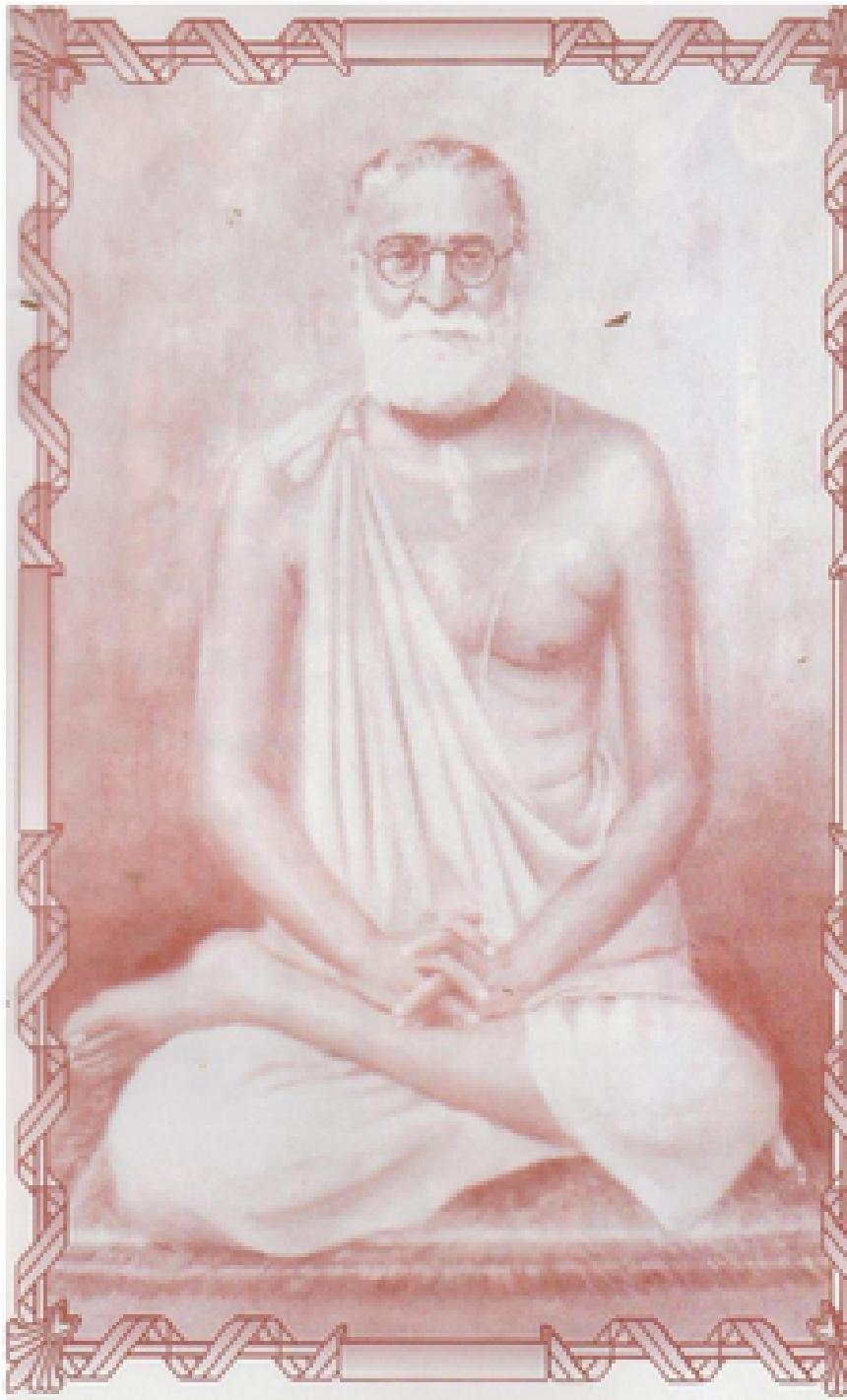
ওঁ বিষ্ণুপাদ
শ্রীশ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজ

ওঁ বিষ্ণুপাদ

শ্রীশ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজ

ভগবান্

শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বা-গোবিন্দসুন্দরজীউ

সূচীপত্র

বর্ত্তমানে আমরা এক প্রবাসে কোন মেকী পাওনার জন্যে, লাভের জন্য ঝগড়াঝাঁটি করছি। কিন্তু উপর থেকে এক মধুর তরঙ্গ আসছে আমাদের উদ্ধার করে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। শুধু শ্রীভগবানের হারানো ভৃত্যদের জন্যে তাঁর প্রেমময় অন্বেষণ রূপ করুণা দ্বারাই তা সম্ভব। আর আমাদের কাছ্ থেকে শুধু এটাই আশা করা যায় যে আমরা এই কৃষ্ণ অন্বেষণে যোগ দেব আর সেই চিন্ময় জগতের দিকে এগিয়ে যাব। আসুন, আমরা সেই চিন্ময় জগতের দিকে যে বিশ্বজনীন যাত্রা তাতে যোগদান করি, নিজেদের উদ্ধার করি আর আমাদের আপন ঘরে, শ্রীভগবানের কাছে ফিরে যাই।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মুখবন্ধ

সচ্চিদানন্দময় ভগবান অখিলরসামৃতমূর্ত্তি। দ্বিভুজ মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহই তাঁহার নিজ নিত্যস্বরূপ। খুব স্বাভাবিক কারণেই তাঁহার বিলাসেচ্ছা তাঁহারই অবিচিন্ত্যশক্তিক্রমে চিদচিৎ বিশ্বে নিত্যকাল প্রকটিত। গোলোক বৃন্দাবন তাঁহার নিত্য বিলাসভূমি— চিন্ময় ধাম। সেই সর্ব্বকারণ কারণ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছাপূরণের জন্যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই সঙ্কর্ষণরূপে শক্তিত্রয় সহযোগে রূপকার হিসাবে সমস্তই প্রকাশ করিয়া চলিয়াছেন, চলিতেছেন, এবং চলিবেন। ইহার কোন আদি অন্ত নাই। 'জন্মাদস্য যতঃ অন্বয়াদিতরতঃ' শ্লোকেই তাহা প্রমাণিত এবং গায়ত্রী মন্ত্রার্থ-বিনির্য্যাস পর্যন্ত সর্ব্বত্রই এবং ভাগবত চতুঃশ্লোকীতে পরিপূর্ণরূপে প্রকটিত ও সমর্থিত। এখানে তর্কের কোন স্থান নাই বরং সম্পূর্ণ সমর্পিতাত্ম হইয়া সাধুসঙ্গে ভগবদ্‌লীলার অনন্ত মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে করিতে জীবনধারণ করিতে পারিলে জীবনের প্রকৃত সার্থকতা সম্পাদিত হইবে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাহা এইভাবে প্রকাশ করিয়াছেন—

"চিৎ-জড়ের দ্বৈত যিনি করেন স্থাপন
জড়ীয় কুতর্কবলে হায়!
ভ্রমজাল তার বুদ্ধি করে আচ্ছাদন
বিজ্ঞান আলোক নাহি তায়।।
চিৎ-তত্ত্বে আদর্শ বলি জানে যেই জনে
জড়ে অনুকৃতি বলি মানি।
তাহার বিজ্ঞান শুদ্ধ রহস্য সাধনে
সমর্থ বলিয়া আমি জানি।"

এই গ্রন্থরাজের নামেই তাহার পরিচয়। আমি কেবল একটু মুখবন্ধ করিলাম মাত্র। অখিল কল্যাণ গুণখনি শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গুণের মধ্যে "প্রেমময় অন্বেষণ" জীবচৈতন্যে তাঁহারই একটি সকরুণ লীলার বিশেষ

প্রকাশমাত্র। ইহার দ্বারা যেমন তাঁহার লীলামাধুর্য্য, প্রেমমাধুর্য্য, রূপমাধুর্য্য এবং বেণুমাধুর্য্য পুষ্টিলাভ করে তেমনি বদ্ধজীবের প্রতিও যে তাঁহার অনাবিল ভালবাসায় দ্রবীভূত অতুলনীয় প্রেমপূর্ণ হৃদয়ের সকরুণ অভিব্যক্তি, তদ্দ্বারা সেবাময় ভূমিকায় আকর্ষণ ও তথায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরিপূর্ণতা প্রদান করে। এই গ্রন্থরাজ যেন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের 'দশমূল' ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রদত্ত 'বৃহৎভাগবতামৃতে'র অভিনব ভাষ্য-সংস্করণ।

এই গ্রন্থটি মূলতঃ শ্রীপাদ ভক্তিসুধীর গোস্বামী মহারাজ প্রদত্ত ইংরাজী ভাষায় "লাভিং সার্চ্ ফর দ্য লষ্ট্ সার্ভেন্ট্" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। যাহা শ্রীল গুরুমহারাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী প্রদত্ত বক্তৃতামালা হইতে চয়ন করা হইয়াছে। কিন্তু ইহার বঙ্গভাষায় অনুবাদ খুব সহজ কাজ নহে। যেহেতু শ্রীল গুরুমহারাজকে ভালভাবে না জানিলে তাঁহার হৃদয়ের মর্ম্মগাথা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রে তাঁহারই প্রিয় শিষ্যা শ্রীযুক্তা দেবময়ী দিদি যে অকুণ্ঠ সহযোগিতা ও 'হৃদয় দিয়ে হৃদি অনুভব' করিয়া অনুবাদ সম্পন্ন করিয়াছেন তাহা এক কথায় অপূর্ব ও তদ্দ্বারা আমরা নিজেদের ভাগ্যবান ভাবিয়া শ্রীগুরুকৃপা অনুভব করি। শুধু তাই নয় এই গ্রন্থ প্রকাশ সেবায় তাঁহার অর্থানুকূল্যদান ও ভাগ্যবতী দিব্যশক্তি দেবী দাসী প্রভৃতির নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ প্রচেষ্টা অশেষ ধন্যবাদার্হ। সবশেষে যাঁহার সর্ব্বতোমুখী সেবাপ্রচেষ্ঠায় এই গ্রন্থরাজ প্রকাশিত হইলেন সেই শ্রীচৈতন্য-সারস্বত-কৃষ্ণানুশীলন সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীপাদ ভক্তিপ্রপন্ন তীর্থ মহারাজ শ্রীগুরুকৃপায় উত্তরোত্তর ভক্তিসমৃদ্ধি লাভ করুন এই প্রার্থনা। অলমতি বিস্তরেণ।

বিনীত দীনাধম

শ্রীভক্তিসুন্দর গোবিন্দ

মঙ্গলাচরণ

আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ।
ভেদাভেদ প্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎ প্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ ।।

এখানে এই একটি শ্লোকে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনের সারাংশ দিয়েছেন। তিনি বলছেন "সাধারণ লোকের মতামত শুনতে আমরা আগ্রহী নই ; 'আম্নায়' যাকে প্রকাশ করেছেন তাছাড়া অন্য কোন মতামতের কোন মূল্য নেই।" গুরুপরম্পরা থেকে যে শাস্ত্র এসেছে তাই হল আম্নায়, একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস।

তাঁরা কি বলেন ? তাঁরা বলেন (১) আম্নায় বাক্যই প্রধান প্রমাণ। তদ্বারা নিম্নলিখিত নটি সিদ্ধান্ত উপদিষ্ট হয়েছে। (২) কৃষ্ণস্বরূপ হরি জগন্মধ্যে পরমতত্ত্ব। (৩) তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। (৪) তিনি অখিলরসামৃত সমুদ্র। (৫) জীবসকল হরির বিভিন্নাংশতত্ত্ব। (৬) তটস্থ গঠনবশতঃ জীবসকল বদ্ধদশায় প্রকৃতিকর্ত্তৃক কবলিত। (৭) মুক্তদশায় প্রকৃতির কবল হতে মুক্ত। (৮) জীব জড়াত্মক সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির ভেদ ও অভেদ প্রকাশ। (৯) শুদ্ধভক্তিই জীবের সাধন। (১০) কৃষ্ণপ্রীতিই জীবের সাধ্য।

স্বয়ং ভগবান শ্রীমদ্‌গৌরচন্দ্র এই দশটি তত্ত্ব জীবগণকে উপদেশ করেছেন।

ভূমিকা

"শ্রীভগবান তাঁর হারানো ভৃত্যদের জন্যে এক প্রেমময় অন্বেষণে ফিরছেন" — এই কটি শব্দের মধ্যে এক গভীর ব্যাকুলতা খুব সরলভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কৃষ্ণ তাঁর হারানো ভৃত্যদের উদ্ধার করতে আসেন এক তীব্র ব্যাকুলতা নিয়ে। কৃষ্ণ আসেন আমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে।

বৃহৎ ভাগবতামৃতে এইরকম একটি ঘটনার কথা বর্ণিত আছে। একদা বৃন্দাবনে বনে বনান্তরে গাভী চরিয়ে কৃষ্ণ তাঁর গাভীগুলি নিয়ে দিনের শেষে যখন ঘরে ফিরছিলেন ঠিক সেইসময়ে এক কিশোর সংসার থেকে মুক্তি পেয়ে বৃন্দাবনে প্রবেশ করল এক গোপকিশোর রূপে। তাঁর এই বহুদিনের হারানো ভৃত্যকে দেখে কৃষ্ণ তাঁকে গাঢ় প্রেমালিঙ্গন করলেন আর তারপর তাঁরা দুজনেই প্রেমবশে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন।

তাই দেখে কৃষ্ণের সব গোপকিশোর সখারা আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলেন, "এ কি কান্ড! কৃষ্ণ এই নবাগতকে আলিঙ্গন করে নিজে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন? এ কি করে সম্ভব?" যখন সব গোপকিশোররা হতবাক হয়ে এই দৃশ্য দেখছিলেন, তখন স্বয়ং বলরাম এসে কৃষ্ণের জ্ঞান ফিরিয়ে আনলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁর এই নবাগত বন্ধুকে গভীর স্নেহের সঙ্গে বললেন, "কেন তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলে? কেন এত দীর্ঘদিন তুমি ঘরছাড়া হয়ে ছিলে? এ তোমার পক্ষে কি করে সম্ভব হল? তুমি এতদিন আমার বিরহে কেমন করে দিন কাটালে? কেমন করে তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেলে আর জন্ম জন্ম আমাকে ছেড়ে কাটালে? তবে আমি এও জানি যে আমার কাছে ফিরে আসার জন্যে তুমি কতটা কষ্টস্বীকার করেছ। সর্বত্র তুমি আমাকে খুঁজে বেড়িয়েছ। আমারই জন্যে তুমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা

করেছ। কত লোকের কাছে কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা পেয়েছ, কত উপহাস-বিদ্রূপ সহ্য করেছ আর আমার জন্যে কত চোখের জল ফেলেছ। সে সবই তো আমি জানি। আমি যে তোমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিলাম। আর এত দুঃখকষ্টের পর, এতদিনে সেই তুমি আমার কাছে ফিরে এলে!" এইরকম গভীর প্রেমের সঙ্গে কৃষ্ণ তাঁর হারানো ভৃত্যকে সম্বোধন করলেন, তাঁকে স্বাগত জানালেন। তারপর কৃষ্ণ যখন বাড়ী ফিরলেন তখন এই নবাগতকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন দুজনে একসঙ্গে আহার করবেন বলে। এইভাবে বৃন্দাবনে কৃষ্ণ স্বয়ং নবাগতকে অভ্যর্থনা করেন।

তাই ভগবান তাঁর হারানো ভৃত্যদের জন্যে যে অন্বেষণ করেন, সে এক প্রেমময় অন্বেষণ। এই অন্বেষণ কোন সামান্য জিনিস নয়, এ হল তাঁর হৃদয়ের বস্তু। আর ভগবানের হৃদয়ও তো সামান্য হৃদয় নয়। তিনি আমাদের জন্যে কি ব্যাকুলতার সঙ্গে সন্ধান করছেন কে তার পরিমাপ করতে পারে? যদিও তিনি পূর্ণব্রহ্ম, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, তবুও আমাদের প্রত্যেকের জন্যে — যে যত ক্ষুদ্রই আমরা হই না কেন — তিনি বিরহবেদনা ভোগ করেন। যদিও তিনি স্বয়ং পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তবুও তাঁর অনন্ত প্রেমময় হৃদয়ে আমাদের সকলের জন্যই একটি স্থান আছে। যিনি অনন্ত তাঁর প্রকৃতিই এইরকম। কৃষ্ণ হলেন এইরকম পরম সার্ব্বভৌম, পরম মঙ্গলময়, পরম প্রেমময় ভগবান।

যিনি পরম স্বতন্ত্র, যিনি সার্ব্বভৌম, তিনি তো কোন আইনকানুন, হিসেবনিকেশের অধীন নন। এমন নয় যে তিনি যদি তাঁর হৃদয়খানি একজনকে দেন, তবে আর একজনের ভাগে কিছু কম পড়বে। যিনি অনন্ত তাঁর সম্বন্ধে একথা খাটে না; বরং তাঁর আদেশ হলেই অনন্ত সম্পদ সরবরাহ হতে পারে। তিনি হলেন সকল রসের আধার—'অখিল রসামৃতমূর্ত্তি।' আর সেই প্রেমময় ভগবান তাঁর হারানো ভৃত্যদের সন্ধানে ফিরছেন, তাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

তা নাহলে তো আমাদের কোন আশাই নেই। আমাদের জীবনের

একমাত্র আশাভরসা, একমাত্র সান্ত্বনা হল এই যে চরমে আমরা এইরকম প্রেমময় ভগবানের তত্ত্বাবধানে আছি। কৃষ্ণের সখারা মনে করেন "আর কারোর পরোয়া আমরা করি না, আমাদের তো কৃষ্ণই আছেন, তিনিই আমাদের বন্ধু।" এইরকমের একটা আন্তরিক বিশ্বাস ও উদ্দীপনা, এইরকমের একটা বেপরোয়া উৎসাহ আসতে পারে কেবল হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে। "কৃষ্ণ তো আছেন, তিনি তো আমাদের বন্ধু। আমাদের চিন্তার কি আছে, ভয়ের কি আছে? আমরা বিষ খেতে পারি, কালীয় নাগের মাথায় ঝাঁপ্ দিতে পারি, সব কিছুই করতে পারি। কৃষ্ণ যখন আমাদের পিছনে আছেন, তখন আমাদের কিসের চিন্তা? এই ভাবটিই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর 'শরণাগতিতে' ব্যক্ত করেছেন।

রক্ষা করবি তুঁহু নিশ্চয় জানি।
পান করবু হাম্ যামুন পানি।।
কালীয়-দোখ করবি বিনাশা।
শোধবি নদীজল বাড়াওবি আশা।।

শ্রীভগবানের সঙ্গে এইরকম একটা প্রেমভক্তির সম্পর্ক আমরা কি করে গড়ে তুলতে পারি? শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপার মাধ্যমে। শ্রীল বাসুদেব ঘোষ বলেছেন, "যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম দে" (দেহ)। যদি গৌরাঙ্গ না আসতেন তবে আমাদের জীবনের পরম লক্ষ্যের কথা কে আমাদের জানাতেন? কি পরম সম্ভাবনাই আমাদের আছে। তবু গৌরাঙ্গমহাপ্রভু ছাড়া আমাদের ভিতরের এই বিরাট ঐশ্বর্য্যের কথা কে আমাদের জানাতেন? শ্রীগৌরাঙ্গমহাপ্রভু আমাদের বলেছেন "তোমরা জান না তোমাদের কি বিরাট ঐশ্বর্য্য আছে।" তিনি এসেছিলেন যেন একজন জ্যোতিষীর মত, যিনি একজন হতদরিদ্রের কোষ্ঠী দেখে বলেছিলেন "তুমি কেন এমন দরিদ্র জীবন যাপন করছ? তোমার জমিতে অতুল ঐশ্বর্য্য পোঁতা আছে। সেই ঐশ্বর্য্য খুঁজে বার কর। তুমি এত ঐশ্বর্য্যশালী আর তোমার অভিভাবক যিনি তিনি এত স্নেহময়, এত মহান, আর তবুও তুমি

কিনা এমন হাঘরের মত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছ? এ কি কান্ড! এমন নয় যে তোমার কোন সহায় নেই, তোমার কেউ নেই। তোমার দয়ালু, স্নেহময় অভিভাবকের কথা যদি তোমার মনে পড়ে তাহলেই তোমার সব হবে।" এই হল মহাপ্রভুর দান। শ্রীমদভাগবতে কলিযুগের অবতারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেখানে আমরা শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাবের প্রমাণ পাই। সেখানে বলা হয়েছে —

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যযন্তি হি সুমেধসঃ।।

(ভাঃ ১১/৫/৩২)

— "যাঁর মুখে সর্ব্বদা 'কৃষ্ণ' এই দুটি বর্ণ এবং যাঁর কান্তি অকৃষ্ণ বা গৌর — সেই অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র ও পার্ষদ পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ সংকীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞদ্বারা যজন করে থাকেন।"

এরপর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধে আরও দুটি শ্লোক আছে।

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিব-বিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপালভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।

(শ্রীমদভাগবতম ১১/৫/৩৩)

— অর্থাৎ হে প্রণতপাল (শরণাগতরক্ষক), হে মহাপুরুষ (পরতম পুরুষোত্তম মহাপ্রভো), সদা ধ্যেয়, পরিভবঘ্ন (অন্যাভিলাষাদির পরাভবকারী) অভীষ্টদোহ (কৃষ্ণপ্রেমরূপ অভীষ্টপূরণকারী), তীর্থাস্পদ (সর্ব্বতীর্থের কিংবা সর্ব্বভাগবতগণের আশ্রয়স্বরূপ), শিব-বিরিঞ্চিনুত (শিবাবতার অদ্বৈতাচার্য্য ও ব্রহ্মাবতার নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর দ্বারা স্তুত) শরণ্য (আশ্রিতগণের আশ্রয়) ভৃত্যার্ত্তিহর (নিজ ভৃত্যের দুঃখহারী), ভবাব্ধিপোত (মুমুক্ষা ও বুভুক্ষারূপ ভবসাগরের পরপার লাভের পোতস্বরূপ), আপনার চরণারবিন্দকে বন্দনা করি।"

সেই মহাপুরুষ যিনি রামচন্দ্র ও কৃষ্ণ হয়ে এসেছিলেন তিনিই আবার আবির্ভূত হয়েছেন। তিনি এসেছেন আমাদের জীবনের প্রকৃত প্রয়োজনের নির্দ্দেশ দিতে। গোলোকধামের মধুরতম রসকে তিনি আকর্ষণ করে নিয়ে এসেছেন এখানে আমাদের সকলকে দেবার জন্যে। সর্ব্বদা তাঁর ধ্যান কর, তাহলে তোমাদের সমস্ত দুঃখকষ্টের অবসান হবে। তিনি তাঁর স্পর্শ দ্বারা, তাঁর সংকীর্ত্তন দ্বারা পবিত্র তীর্থসমূহকে এবং সাধুদেরও পবিত্র করেন। তিনি উচ্চতম স্থান থেকে উচ্চতম বস্তুকে আকর্ষণ করে আনেন। এমনকি ব্রহ্মা ও শিবও তাঁর এই মহান দান দেখে মোহিত হয়ে তাঁর স্তুতি করেন। তাঁরাও তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করার জন্য ব্যগ্র হন। যাঁরা তাঁর সেবা করবেন তাঁদের সব দুঃখকষ্ট চলে যাবে, তাঁদের সব প্রয়োজন সিদ্ধ হবে। আর যাঁরা তাঁর পাদপদ্মে আশ্রয় নেন, তিনি তাঁদের ভার নেন, তিনি তাঁদের রক্ষা করেন, এবং তাঁদের যা কিছু প্রয়োজন সবই দান করেন। এই জগত যা মৃত্যুর অধীন, যেখানে আমরা সর্ব্বদাই পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুজনিত অবাঞ্ছিত পরিবর্ত্তন সহ্য করি; এইরকম একটা জায়গায় — যেরকম জায়গায় কেউই থাকতে চায় না — যেখানে আমাদের জন্যে একটা অপূর্ব্ব নৌকা আসবে আর এই অপ্রিয় দুঃখজনক অবস্থা থেকে আমাদের তুলে নিয়ে চলে যাবে। যিনি আমাদের এই সর্ব্বোত্তম অমৃত দান করতে আসেন সেই মহাপুরুষের পদতলে আমরা দন্ডবৎ হই।

ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজসুরেপ্সিতরাজ্যলক্ষ্মীং
ধর্ম্মিষ্ঠ আর্য্যবচসা যদগাদরণ্যম্।
মায়ামৃগং দয়িতয়েপ্সিতমন্বধাবদ্
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।।

(ভাগবত ১১/৫/৩৪)

— "হে পরমেশ্বর, আপনি, যা ত্যাগ করা খুব কঠিন, — সেই লক্ষ্মীদেবী ও তাঁর বিপুল ঐশ্বর্য্য যা দেবতারাও আকাঙ্খা করেন, তা ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। সুষ্ঠুভাবে বৈধভক্তিধর্ম্ম প্রচারের জন্যে আপনি

ব্রাহ্মণের শাপবাক্যের মর্য্যাদা দিয়ে বনে চলে গিয়েছিলেন। যে পতিত জীবাত্মারা ক্ষণিক সুখের অন্বেষণ করে আপনি তাদের অন্বেষণ করেন তাদের উদ্ধার করার জন্যে আর তাদের আপনার শ্রীপাদপদ্মে সেবা অধিকার দিয়ে কৃতার্থ করেন। সেই একই সঙ্গে আপনি নিজেকেও অন্বেষণ করছেন, অন্বেষণ করছেন সেই শ্রীকৃষ্ণের যিনি পরমসত্য, পরমসুন্দর।"

এই শ্লোক সাধারণতঃ ভগবান রামচন্দ্র সম্বন্ধে বলা হয় যিনি তাঁর রাজ্য পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন এবং পিতার প্রতিজ্ঞা পালনের জন্যে সীতাদেবীর সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন ও সেখানে মায়ামৃগের অনুধাবন করেছিলেন। কিন্তু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর দেখিয়েছিলেন কেমন করে এই শ্লোক শ্রীমন্‌চৈতন্য মহাপ্রভু সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। তিনি বলেছেন 'মায়ামৃগে'র অর্থ হল এই যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সেইসব জীবাত্মার পিছনে ছুটেছেন যারা মায়ার দ্বারা আবৃত ছিল। এই 'মায়ামৃগ' শব্দ যখন শ্রীরামচন্দ্র সম্বন্ধে প্রয়োগ করা হয় তখন তার অর্থ হল তিনি মরীচি রাক্ষস, যে স্বর্ণমৃগের রূপ ধারণ করেছিল, তার পিছনে ধাওয়া করেছিলেন। এই শ্লোক যখন শ্রীমন্ মহাপ্রভু সম্বন্ধে প্রযোজ্য হয় তখন 'মায়ামৃগ অনুধাবত' এর অর্থ এই যে তিনি সেইসব জীবাত্মাদের যারা মায়া দ্বারা আবৃত হয়ে ছিল তাদের পিছনে ছুটেছিলেন তাদের উদ্ধার করার জন্যে। তিনি পতিত পাবন রূপে পতিত জীবাত্মাদের অন্বেষণ করেছিলেন তাদের মায়া থেকে উদ্ধার করার জন্যে।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আর একটা ব্যাখ্যাও দিয়েছেন যে 'দয়িতয়া ঈপ্সিতং" অর্থ 'দয়িতার অভিলাষ" — তা হল কৃষ্ণানুসন্ধান। এইভাবে তিনি শ্রীচৈতন্য অবতারের দুটি বিশেষত্ব দেখিয়েছেন। এক হল তিনি পতিত জীবাত্মাদের উদ্ধার করেন আর এক হল যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের দয়িতা শ্রীমতি রাধারাণীর ভাবে ভাবিত হয়ে কৃষ্ণানুসন্ধান করেন। তাঁর দয়িতা, শ্রীমতী রাধারাণীর ভাবে ভাবিত হয়ে তিনি শৃঙ্খলিত জীবাত্মাদেরও অন্বেষণ করেন তাদের উদ্ধার করার জন্যে। এখানে আমরা শাস্ত্রের উল্লেখ থেকে এই

তত্ত্বের বীজটা পাই। শ্রীভগবান পতিত জীবাত্মাদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তিনি তাঁর হারানো ভৃত্যদের জন্যে এক প্রেমময় অন্বেষণে মগ্ন আছেন। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর অভিন্ন স্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সারাজীবন বা ব্যক্তলীলায় এটা খুব পরিষ্কার ভাবেই দেখা যায় যে তাঁরা স্বয়ং ভগবান হয়ে পতিত জীবাত্মাদের অন্বেষণ করছেন, তাঁদের উদ্ধার করার জন্যে। শ্রীভগবান যে তাঁর হারানো ভৃত্যদের জন্যে এক প্রেমময় অন্বেষণে রয়েছেন সেই তত্ত্বকে আমরা এর ভিত্তিতেই বুঝতে পারব।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতায় বলা হয়েছে —

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মনং সৃজাম্যহম্।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।।

(শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতা ৪/৭/৮)

"— হে ভারত! যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি সৃষ্ট দেহবৎ আত্মপ্রকাশ করি অর্থাৎ আবির্ভূত হই। সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতিকারিগণের বিনাশ ও ধর্ম্মকে সম্যক প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভূত হই।" এখানে কৃষ্ণ বলছেন যে আমি এখানে মাঝে মাঝে আসি শাস্ত্রের নির্দ্দেশকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে এবং দুষ্কৃতিকারিগণের বিনাশ করার জন্যে। এইরকম সব উল্লেখ শাস্ত্রে রয়েছে যেখানে বলা হয়েছে কেমন করে কৃষ্ণ তাঁর ভৃত্যদের অন্বেষণে আসেন। এইসব শাস্ত্রবচনকে আমরা যদি আমাদের প্রারম্ভিক উপলব্ধি বলে গ্রহণ করতে পারি তাহলে আমরা দেখব শ্রীভগবান সর্ব্বদাই এই পৃথিবীতে আসেন পতিত জীবাত্মাদের, তাঁর নিজ ভৃত্যদের উদ্ধার করার জন্যে। পতিত জীবাত্মাদের অবস্থাটা কিরকম? শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে সনাতন গোস্বামীকে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কি উপদেশ দিয়েছিলেন শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তার বর্ণনা দিয়েছেন।

জীবের 'স্বরূপ' হয় — কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।।
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসারাদি দুখ।।

জীবের নিত্যস্বরূপ হল যে সে কৃষ্ণের নিত্যদাস। জীবাত্মা বা অনুচেতনা ঈশ্বরেরই অংশ বা প্রকাশ এবং জীবাত্মা কৃষ্ণ থেকে একইসঙ্গে ভিন্ন ও অভিন্ন। জীবাত্মা হল কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি। যদিও বাস্তবে তারা কৃষ্ণের ভৃত্য, তবুও অনাদিকাল থেকে তারা মায়াবদ্ধ হয়ে ভ্রান্ত ধারণায় কাল কাটাচ্ছে এখানে শোষণের কারণ হয়ে। তাঁর এই হারানো ভৃত্যদের উদ্ধার করার জন্যে শ্রীভগবান মাঝে মাঝে এখানে আসেন তাদের তাঁর স্বধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে।

অন্যান্য ধর্ম্মেও আমরা শ্রীভগবানের অনেক প্রতিনিধিদের দেখি যাঁরা সাংসারিক চেতনা থেকে আমাদের ভগবৎচেতনার পথে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সাহায্য করতে আসেন। যদিও আমরা অন্যান্য দেশে ও অন্যান্য ধর্ম্মীয় ঐতিহ্যেও এই তত্ত্বটি দেখি, তবুও ভারতবর্ষেই এই তত্ত্বটি প্রচুর পরিমাণে ও সুসংবদ্ধভাবে পাওয়া যায়।

শ্রীমদভাগবতমে কৃষ্ণ বলেছেন —

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।।

(ভাগবত ১১/১৪/৩)

"—কালপ্রভাবে বেদসংজ্ঞিতা বাণী প্রলয়কালে অদৃশ্যপ্রায় হয়েছিল। তারপর আবার সৃষ্টিকালে, কল্পারম্ভে আমি প্রথমে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে তাঁর হৃদয়ের অভ্যন্তরে উদ্দীপনা দিই ও তাঁকে সেই বেদ আমি বলেছিলাম। তারপর ব্রহ্মা থেকে তাঁর অনেক শিষ্য এই জ্ঞান প্রাপ্ত হলেন। তাঁরা আবার তাঁদের নিজ নিজ শিষ্যদের এই জ্ঞান প্রদান করলেন। এইভাবে শাস্ত্র যে পরম্পরায় প্রকাশিত হয় তা আমার থেকেই অবতরণ করে।"

আর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন,

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ।।
এবং পরম্পরা-প্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ।।

(শ্রীমদভগবতগীতা ৪/১-২)

—"আমি পূর্ব্বে সূর্য্যকে এই অব্যয় নিস্কাম-কর্ম্মসাধ্য জ্ঞানযোগের কথা বলেছিলাম। সূর্য্য তাই নিজ পুত্র বৈবস্বত মনুকে বলেন এবং মনুও তাই স্বীয় পুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন।

হে পরন্তপ! এইরূপে পরম্পরাপ্রাপ্ত এই জ্ঞানযোগ নিমি, জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ অবগত হয়েছিলেন। সেই যোগ অনেক কাল গত হওয়ায় আপাততঃ নষ্টপ্রায় হয়েছে। এইভাবে কল্পারম্ভ থেকে আমিই আমার সংবাদ অপরকে দিয়েছি। আমিই যে জীবনের লক্ষ্য এই সত্যকে, গুরুপরম্পরার মাধ্যমে, বহু প্রজন্ম ধরে, আমিই এই জগতে প্রেরণ করেছি।"

এইভাবে কৃষ্ণ বারবার আসেন তাঁর বহুদিনের হারানো ভৃত্যদের উপর তাঁর নিজের অধিকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যে। আর শ্রীমন্ মহাপ্রভু রূপে কৃষ্ণ তাঁর নিজ মাধুর্য্যও আস্বাদন করছেন। তিনি যে এই মাধুর্য্য তাঁর ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করতে চান, তার কারণ হলেন তাঁর হলাদিনী শক্তি — শ্রীমতী রাধারাণী। যখন কৃষ্ণ তাঁর হলাদিনী শক্তির সঙ্গে যুক্ত হয়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভুরূপে আসেন তখন তিনি আচার্য্যরূপে নিজেকে প্রকাশিত করেন। তাই কৃষ্ণ বলেছেন, "আচার্য্য মাং বিজানীয়াৎ" — "আমাকে আচার্য্য বলে জানবে।" তাঁর আচার্য্যলীলায় তিনি নিজেকে দান করেন আর সেইভাবেই তিনি তাঁর হারানো ভৃত্যদের তাঁর স্বধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

বৃন্দাবনে কৃষ্ণ তাঁর নিজ পার্ষদগণের সঙ্গে রসাস্বাদন করছেন আবার নবদ্বীপেও তিনি শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নিজ পার্ষদগণের সঙ্গে রসাস্বাদন করছেন।

তিনি নিজ মাধুর্য্য আস্বাদন করছেন আবার সেই রস অন্যকে দান করছেন। তাঁর এই দান ও তাঁর ভৃত্য সংগ্রহ দুটি আসলে একই জিনিস। তিনি নিজেকে দান করেই আমাদের হৃদয়কে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করছেন, আমাদের তাঁর স্বধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। শ্রীভগবানের এই আত্মদান শুধু আমাদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যেই, আমাদের তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই এর উদ্দেশ্য। এইভাবেই শ্রীভগবান নিত্যকাল তাঁর হারানো ভৃত্যদের জন্যে এক প্রেমময় অন্বেষণে ফিরছেন।

প্রথম অধ্যায়

শ্রদ্ধালোক

শ্রদ্ধাই হল একমাত্র উপায় যার দ্বারা আমরা সেই চিন্ময় জগতকে দেখতে, শুনতে ও অনুভব করতে পারি, তা না হলে আমাদের কাছে এসবই অর্থহীন। সেই উচ্চতর ভূমিকে বুঝতে গেলে এক আত্মিক জাগরণের প্রয়োজন। শুধু এক উচ্চতর উৎসের মাধ্যমে আমরা সেই উপরের জগতের সঙ্গে একটা যোগাযোগ করতে পারি। তাই যাকে 'দিব্যং জ্ঞানং' বলা হয়েছে তা কোন সামান্য জ্ঞান নয়, তা হল চিন্ময় জ্ঞান, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও উপলব্ধি।

কিন্তু এই উপলব্ধি পেতে গেলে 'শরণাগতি' অবশ্যই প্রয়োজন। তারপরে আমরা শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, বন্দন, শ্রীভগবানের স্তুতি বা নানাভাবে তাঁর সেবাকার্য চালিয়ে যেতে পারি। কিন্তু প্রথমেই যা দরকার— যা হল ভক্তির ভিত্তি—সেই আত্মনিবেদন অবশ্যই প্রয়োজন। তা না হলে কোন কিছুই ফলবতী হবে না। ভক্তির বাহ্য প্রদর্শন কেবল অনুকরণে পর্য্যবসিত হবে।

আমাদের এই অনুভূতি যেন খুব আন্তরিক হয়— "আমি খুব প্রাণ দিয়ে শ্রীভগবানের সেবা করবো, তাঁর সেবার প্রতি আমি খুব বিশ্বস্ত থাকবো। শুধু তাঁর জন্যেই আমার অস্তিত্ব। সেইরকম ভাবে বাঁচার জন্যে আমি মরতেও রাজী আছি। শুধু তাঁর অভিলাষ পূর্ণ করার জন্যেই আমি বেঁচে থাকতে চাই, কোন অন্যাভিলাষ পূরণের জন্যে নয়। সেই পূর্ণব্রহ্মকে ছাড়া আমি আর কিছুই চাই না। আমি সম্পূর্ণরূপে তাঁরই হয়ে যেতে চাই।" এইরকমের আন্তরিকতা ও ব্যাকুলতা ভক্তের জীবনের অপরিহার্য্য

অঙ্গ। যিনি ভক্ত তাঁকে এই চিন্তা করতে হবে, এই অনুভব করতে হবে যে তাঁর অস্তিত্ব কৃষ্ণের জন্যেই। ভক্ত স্বাধীন স্বতন্ত্র জীব নন— তিনি যিনি পরম সার্ব্বভৌম, যিনি পূর্ণব্রহ্ম, যিনি জীবনের সর্ব্বোচ্চ কেন্দ্রে আছেন কেবল তাঁর উপরেই নির্ভরশীল—আর কিছুর উপরে নয়।

পরিবার, সমাজ বা দেশের স্বার্থের সঙ্গে নিজেকে জড়ানো হল একরকমের ব্যাপক স্বার্থপরতা, কিন্তু এইসব মিথ্যা অহংবোধ, মিথ্যা অভিমানও ত্যাগ করতে হবে। শুধু যে আমরা নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থের সঙ্গে জড়িত থাকবো না তাই নয়, এইরকম ব্যাপক স্বার্থপরতার সঙ্গেও জড়িত থাকবো না। পরন্তু, আমাদের আত্মচিন্তাকে সবরকমের প্রতিকূল ও অবান্তর মলিনতা থেকে মুক্ত করতে হবে। সমস্ত রকমের বহিরঙ্গ দাবীদাওয়াকে নাকচ করতে হবে। তখনই আমরা হৃদয়ের অভ্যন্তরে অনুভব করব যে যিনি অনন্ত, যিনি পূর্ণব্রহ্ম, তাঁর পরিপূর্ণতার সঙ্গে আমরা যোগযুক্ত আছি।

জীবনে এইরকমের সাফল্য, এইরকমের পরিপূর্ণতার জন্যে কোন বহিরঙ্গ বস্তুর প্রয়োজন নেই। একমাত্র যা প্রয়োজন তা হল অহংকারের আবরণকে ভেঙ্গে ফেলা। অহংকারই প্রতিকূল ও অবান্তর উপাদান সংগ্রহ করছে—এই প্রতিকূল বস্তু সংগ্রহের প্যাঁটরাটিকে ভেঙ্গেচুরে শেষ করে ফেলতে হবে— আর তখনই হৃদয়ের প্রত্যন্ত প্রদেশে, যিনি অনন্ত চেতনময় পরিপূর্ণতা, তাঁর পাদপদ্মে প্রেমময় সেবার যে নিত্যভূমি, সেই নিত্যভূমির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগকে আমরা খুঁজে পাই।

ভোগ ও ত্যাগ দুইই অস্বাভাবিক। তারা দুজনে দুরকমের অসুর, একজন হল ভোগ বা শোষণ রূপ অসুর, আর একজন হল ত্যাগ বা চিরবিশ্রাম রূপ অসুর। এই দুইরকমের প্রবণতাই আমাদের শত্রু। এক উচ্চতর ইতিবাচক জীবন তখনই সম্ভব যখন আমরা ভোগ আর ত্যাগ এই দুই বস্তু থেকেই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে যেতে পারব।

সবকিছুই আমাদের সাহায্য করবে যখন আমরা জীবনের কেন্দ্রে যিনি আছেন তাঁর সঙ্গে সম্পর্কসূত্রেই সবকিছুকে দেখব। অন্যদিকে শঙ্করাচার্য্যের অনুগামীরা বা বৌদ্ধরা যেরকম সর্ব্বাঙ্গ ত্যাগের সাধনা করেন, সেইরকম

ত্যাগের উপদেশ আমাদের পথে পাওয়া যায় না। আমাদের মানসিকতা হল সমন্বয় সাধন করার দিকে, যাতে জগতে সবকিছুই আমাদের শ্রীভগবানের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে এবং তাঁর কাছে আত্মনিবেদন করতে উৎসাহ দেবে।

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জত:।
নির্বন্ধ: কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুন:।
মুমুক্ষুভি: পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু:
(পূর্ব্ব ২য় লহরী ২৫৩/২৫৪)

(অর্থাৎ "অনাসক্ত হয়ে নিজ সাধনভক্তির অনুকূলমাত্র বিষয় স্বীকারকারীর বিষয়-বিরক্তিকে যুক্তবৈরাগ্য বলে। তাতে কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় আগ্রহ থাকে। অর্থাৎ প্রাকৃত বিষয়ে বিরক্ত অথচ কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় বিষয়ে আগ্রহশীল যে ব্যক্তি অনাসক্তভাবে নিজ ভক্তির অনুকূলমাত্র বিষয় গ্রহণ করেন, ভক্তি প্রতিকূল বিষয় গ্রহণ করেন না, তার বৈরাগ্যকে যুক্ত বৈরাগ্য বলে।

ভগবৎ সম্বন্ধীয় বস্তুতে প্রাকৃত বুদ্ধি করে মুমুক্ষুদের তা পরিত্যাগ করাকে 'ফল্গুবৈরাগ্য' বলে।)

পরিবেশকে অবহেলা করলে—এই চিন্তা করে যে, এ কেবল অবাঞ্ছিত বস্তুতে পরিপূর্ণ— তা আমাদের সাহায্য করবে না। তাই সেটা ঠিক নয়। পারিপার্শ্বিকের সবকিছুই যেন আমাদের শ্রীভগবানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পারিপার্শ্বিকের প্রতি সেই রকম মনোভাব নিয়ে আমাদের চলা উচিত, হৃদয়ে এই ভাবনা নিয়ে যে, "আমাকে গ্রহণ করো আর আমাকে আমাদের প্রভুর সেবার সঙ্গে যোগযুক্ত করে দাও।" পারিপার্শ্বিককে যখন আমরা যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখব তখন সবকিছুই আমাদের কেন্দ্রের প্রতি সেবায় সাহায্য করবে, উৎসাহ দেবে ও প্রেরণা দেবে। যেখানে সবকিছুই সবকিছুর সঙ্গে সম্পর্কিত, আমরা এমন এক প্রাণবন্ত যৌগিক পরিপূর্ণতার মধ্যে, এমন এক সংগঠনে বাস করছি। আর সেই সংগঠন

গঠিত হয়েছে একজন মালিক ও তাঁর সম্পত্তিকে নিয়ে, একজন শক্তিমান ও তাঁর বিভিন্ন ব্যক্তিকে নিয়ে।

রসের হাট

শ্রীভগবানের শক্তি হল গতিশীল আর সেই গতিশীলতা সর্ব্বদাই রসসৃষ্টি করছে। সমস্ত লীলাই আনন্দের সৃষ্টি করছে, রসের সৃষ্টি করছে। কৃষ্ণ স্বয়ং হলেন রসের হাট ("অখিলরসামৃতমূর্ত্তি"—"আনন্দময় বিলাস")। চলমান গতিশীলতা তাঁর লীলার একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় অঙ্গ, যা তিনি কখনও ত্যাগ করেন না। আর এই গতিশীলতা সর্ব্বদাই এক নতুন আনন্দের সৃষ্টি করছে যা চিন্ময় জগতের প্রত্যেক অনুপরমাণুকে পুষ্টি জোগাচ্ছে। সেই চিন্ময় ধামের কেন্দ্রে আছেন কৃষ্ণ, যিনি সবকিছুকে আকর্ষণ করছেন আর সবকিছুকে ভিতর থেকে রস ও আনন্দ দিয়ে উজ্জিবীত করছেন। এই হল শ্রীভগবানের গতিশীলতার প্রকৃতি। তাঁর লীলা নিশ্চল নয় তা চলমান প্রাণবন্ত গতিশীলতায় পরিপূর্ণ। আর সেই গতিশীলতা হল "প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং", প্রত্যেক মুহূর্তে, প্রত্যেক পদক্ষেপে তা এক নতুন ধরণের আনন্দ সৃষ্টি করে যা অনন্ত। এখানকার জীর্ণ, নিরস নিষ্ফল আনন্দের মত তা নয়।

এই হল শ্রীভগবানের স্বরূপ সম্বন্ধে যথার্থ উপলব্ধি যে যিনি সেই প্রাণবন্ত পরিপূর্ণতা, যিনি সেই পূর্ণব্রহ্ম, যিনি সর্ব্বদাই লীলাময়, সর্ব্বদাই গতিশীল, তিনি অনন্ত ও পরিপূর্ণ এবং তাঁর সেই পরিপূর্ণতা নিত্যনবরূপে প্রবাহিত হচ্ছে। তা স্থির বা নিশ্চল নয়। তাঁর চলার গতি এমন যে প্রত্যেক মুহূর্তে সে এক নতুন অজানা ও অনন্ত আনন্দের সৃষ্টি করছে। আর সেই অনন্দকে আমরা ক্রয় করতে পারি কেবল সর্ব্বোচ্চ মূল্য দিয়ে, তা হল আত্মত্যাগ। সেই প্রবেশপত্র খুবই মূল্যবান যা আমাদের সেই জগতের প্রবেশপত্র দেবে যেখানকার স্বতঃস্ফূর্ত চলমান আনন্দ প্রতি মুহূর্তে নিত্যনবরূপ ধারণ করছে। আর সেই প্রবেশপত্রের মূল্য হল পরিপূর্ণ আত্মত্যাগ।

সেই আত্মত্যাগ বড় আনন্দময় আর সেই অপূর্ব আনন্দের স্বাদ এ

জগতেও—যেখানে প্রতি মুহূর্ত্তেই সবকিছুর মৃত্যু হচ্ছে—সেখানেও পাওয়া যেতে পারে। এ হল এক পরম মহৎ দান-প্রতিদান। কোন মহৎ বস্তু যদি আমরা লাভ করতে চাই তাহলে আমাদেরও নিশ্চয়ই কিছু দিতে হবে। আমাদের আত্মনিবেদনের মধ্যে ঔদার্য্য থাকতে হবে। তাহলেই আমরা অপরদিক থেকে প্রচুর পরিমাণে পাব। পরিপূর্ণ আত্মনিবেদনের মূল্য দিলে তার পরিবর্ত্তে আমরা আনন্দের দানে পরিপূর্ণ হবো— ''আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনম্'', আমরা অনুভব করব যে আমরা আনন্দের সমুদ্রের মাঝখানে রয়েছি। বর্ত্তমানে আমরা কেবল কোন আনন্দময় অনুভূতির সন্ধানে রয়েছি মাত্র, যেমন মরুভূমির মাঝখানে কেউ একটু জলের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু আত্মনিবেদনের দ্বারা আমরা দেখব যে আমরা এমন এক আনন্দের সমুদ্রে রয়েছি যার সুশীতল মাধুর্য্য প্রতি মুহূর্তে বর্দ্ধিত হচ্ছে।

এই আনন্দের যে গুণগত পরিমাণ তার মধ্যেও বৈচিত্র্য রয়েছে যা আমাদের সেবার মনোভাবকে সাহায্য করে যাতে প্রত্যেক মুহূর্তে আমরা নতুন উৎসাহ অনুভব করি। তাই কোন যোগ্য প্রতিনিধির কাছে আমাদের প্রশ্ন জানাতে হবে। তাঁর উপদেশ অনুসরণ করতে হবে আর এইটা বোঝার চেষ্টা করতে হবে যে কি করে আমাদের অবস্থার উন্নতি করা যায়। সেই সঙ্গে এ বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকতে হবে যে, সেবা করার যে সুযোগ আমরা পেয়েছি তা অতি বিরল। এ কোন সস্তা জিনিস নয়। তাই আমাদের প্রত্যেক মিনিটের, প্রত্যেক সেকেন্ডের, প্রত্যেকে মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহার করতে হবে। আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হবে যেন এক মুহূর্তও নষ্ট না হয়, যেন আমাদের আত্মনিবেদনের চেষ্টা অপ্রতিহতভাবে চলতে পারে। সেইরকম আত্মনিবেদনের স্তরকে বলা হয় নিষ্ঠা। সেইস্তরে যখন আমরা পৌঁছব তখন আমাদের রুচিও আরও উন্নত হবে এবং সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে, জীবনের পরম প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যে, আমরা উত্তরোত্তর উৎসাহিত হবো।

সাতদিনের আয়ু

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী পরীক্ষিত মহারাজকে বলেছিলেন জীবনের পরম প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যে তাঁর সাতদিনের আয়ুই যথেষ্ট। তিনি

বলেছিলেন, "মহারাজ পরীক্ষিত, আপনার জীবনের আর মাত্র সাত দিন বাকী আছে। আপনি কি মনে করেন এটা খুব অল্প সময় ? এইটুকু সময়ই যথেষ্ট। সবচেয়ে যেটা প্রয়োজন সেটা হল প্রত্যেক মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহার করা।" তেমনি আমাদের হাতেও কতটুকু সময় আছে তা অনিশ্চিত, কিন্তু আমাদের প্রাণপণে চেষ্টা করতে হবে প্রত্যেক মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহার করার। এ বিষয়ে গাফিলতি করলে চলবে না। আমরা যেন এরকম চিন্তা না করি যে "ভবিষ্যত তো আমার সামনেই রয়েছে। যখনই আমার ইচ্ছে হবে তখনই আমি আমার কল্যাণকর আধ্যাত্মিক জীবনের আত্মনিয়োগ করতে পারব।" কিন্তু একমুহূর্ত্তসময়ও নষ্ট করা উচিত নয়।ইংরেজ কবি লংফেলো লিখেছিলেন,

Trust no Future howe'er pleasant !
Let the dead Past Bury its dead !
Act, —act, in the living Present !
Heart within, and God o'erhead !

"—ভবিষ্যত যতই সুখকর মনে হোক না কেন, তাকে বিশ্বাস কোর না, মৃত অতীতকে তার মৃতদেহ পুঁতে ফেলতে দাও, এই জীবন্ত বর্ত্তমানেই তোমার কাজ শুরু কর, তোমার কাজ কর, হৃদয়ে আন্তরিকতা থাক আর ভগবান মাথার উপর থাকুন।"

বর্ত্তমানই আমাদের হাতে আছে। আমাদের ভবিষ্যত কি তা আমরা জানি না। অতএব যে সময়টুকু হাতে আছে তার সর্ব্বোত্তম সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা আমাদের অবশ্যই করতে হবে। আর কি করে এই সময়ের সর্ব্বোত্তম সদ্ব্যবহার করা যাবে? সাধু ও শাস্ত্রের সঙ্গ পেয়ে!

শুদ্ধতার পরিমাপ করা যায় আত্মনিবেদনের মাত্রা দিয়ে। সেই আত্মনিবেদন কোন আংশিক স্বার্থের জন্যে নয়, সেই আত্মনিবেদন পরিপূর্ণতার জন্যে, পূর্ণব্রহ্মের জন্যে।

শ্রীভগবান, যিনি পূর্ণব্রহ্ম, তাঁর সম্বন্ধে আমাদের বলা হয়েছে যে তিনি হলেন 'অখিলরসামৃতমূর্ত্তি', তিনি পরম মঙ্গলময়, পরম সার্ব্বভৌম ; যা কিছু আমরা দেখছি সবেরই তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা ও বিধাতা।তাঁর কাছে আমাদের

আত্মনিবেদনের আদর্শ যেন এত মহান হয় যে এই আত্মনিবেদনের যে ফল তাও আমরা ত্যাগ করতে পারব। আত্মসমর্পণ বা আত্মত্যাগকেই সাধারণত: 'আত্মনিবেদন' বলা হয়। কিন্তু 'আত্মনিক্ষেপ' আত্মসমর্পণকে বোঝাবার পক্ষে আরও জোরালো একটি শব্দ। এর অর্থ নিজেকে অনন্তের দিকে মরিয়া হয়ে নিক্ষেপ করা। আমাদের মরিয়া হয়ে আত্মত্যাগ করতে হবে। এই আত্মত্যাগের মধ্যে আমাদের খুব সচেতন থাকতে হবে যেন আমরা কোন বৃহত্তর স্বার্থসিদ্ধির জন্যে লালায়িত না হই। আত্মত্যাগ সবসময় হবে কেন্দ্রের জন্যে, কৃষ্ণের জন্যে, যিনি সকলকে আকর্ষণ করেন।

সেই অবস্থার উপলব্ধি করার জন্যে আমাদের দুটি বিষয় সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে—তা হল চিন্ময় জ্ঞান বা 'সম্বন্ধ' (অর্থাৎ জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের কি সম্বন্ধ) এবং সেই পরমার্থকে পাওয়ার উপায়—'অভিধেয়'। এই দুটি বিষয় সম্বন্ধে যথার্থ উপলব্ধি হলেই আমাদের পরম লক্ষ্যের প্রাপ্তি—'প্রয়োজন'—স্বভাবতই হবে। কোন কেন্দ্রের জন্যে আমরা সব কিছু উৎসর্গ করছি সে বিষয়ে আমাদের খুব সচেতন থাকতে হবে। আমাদের পরিপূর্ণতার বিষয় যিনি—অর্থাৎ 'সম্বন্ধ' এবং আমাদের উদ্দেশ্যের শুদ্ধতা বা আমাদের আত্মোৎসর্গ—অর্থাৎ 'অভিধেয়'—এই দুটি বিষয়ই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সাধু এবং শাস্ত্রের মাধ্যমে এর উপলব্ধি হয়। যদি আমরা শুদ্ধতম লক্ষ্য এবং উচ্চতম আত্মত্যাগের প্রতি মনোযোগী হই তবে তার পরিণতি আপনাআপনিই আসবে। এই আত্মত্যাগের কোন পারিশ্রমিকের দিকে যেন আমাদের মন না থাকে। আমাদের কেবল নিজেদের কর্ত্তব্য করে যেতে হবে আর তার যা পারিশ্রমিক তা আপনিই আসবে। কার কাছে আমরা আত্মনিবেদন করব আর কি আমরা পেতে চাই এইসব বস্তু বিশদভাবে আলোচনা করা দরকার, এ বিষয়ে চিন্তা করা উচিত, ধ্যান করা উচিত আর সেই ধ্যানের ফলশ্রুতিকে সাধন করা উচিৎ, তাকে সেবার মধ্যে রূপায়িত করা উচিৎ। এইভাবে আমাদের অবশ্যই চেষ্টা করতে হবে অনন্তের মধ্যে বাস করার। শ্রীমন মহাপ্রভু যেমন নির্দ্দেশ দিয়েছেন সেই নির্দ্দেশ অনুযায়ী আমরা যেন সর্ব্বদাই অনন্ত প্রেম আর অনন্ত সৌন্দর্য্যের অনুশীলনে নিয়োজিত থাকি।

শ্রদ্ধার সমুদ্র

যদিও আমাদের শ্রদ্ধার বস্তু যিনি তিনি অনন্ত, তবুও শ্রদ্ধার সমুদ্রে যাঁরা অভিজ্ঞ যাত্রী তাঁরা সেই অনন্ত পূর্ণব্রহ্মের সম্বন্ধে কিছু ধারণা আমাদের দিয়েছেন। অনন্ত শ্রদ্ধার সমুদ্রে অনেকেরই বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা আছে যা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করা আছে। তার মাধ্যমেই আমরা সেইসব সাধুদের শরণাগত হতে পারি যাঁরা আমাদের অজ্ঞানতার সেই অন্ধকার সমুদ্র পার করতে সাহায্য করবেন বলে। কিন্তু সাধুদের সঙ্গে এই যোগাযোগ যেন যথার্থ হয় তা যেন কোন মনগড়া ধারণা বা অনুকরণ মাত্র না হয়। আমাদের জাগতিক অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে তাকে সেই শ্রদ্ধার জগতে নিক্ষেপ করে সত্যের অনুকরণ করাটাও সম্ভব হতে পারে। তাই সেই উচ্চতর জগতের দিকে আমাদের খুব সাবধানে অগ্রসর হতে হবে, নির্ভরযোগ্য সাধু পরম্পরার মাধ্যমে।

একজন প্রকৃত সাধুর গুণাবলী জানার জন্যে আমাদের খুব সজাগ ও সচেতন হতে হবে। সাধুর লক্ষণ শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। আর প্রকৃত শিষ্য কে, তাঁরই বা মনোভাব কেমন হওয়া উচিত—এই সমস্ত বিষয় শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

সেই পরিপূর্ণ চৈতন্যময় জগত যা আত্মবাদী সেখানে সেবা অধিকার পাওয়ার জন্যে যা প্রয়োজন তা হল শ্রদ্ধা। এই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যে যিনি অনন্ত তিনি আত্মবাদী—(তিনি নিজের জন্যই নিজে আছেন)। সেই পরমপুরুষ আমাদের দিগ্‌দর্শন দিতে পারেন—তিনি আমাদের প্রতি স্নেহশীল, কৃপাময় হতে পারেন। এইসব তত্ত্বের উপলব্ধি হওয়া প্রয়োজন। তিনি আমাদের ঠিকপথে চালনা করতে পারেন। শাস্ত্রে উদ্‌ঘাটিত সত্য এই তত্ত্বের উপরই ভিত্তি করে আছে যে আরোহণের পথে আমরা কৃষ্ণের দিকে অগ্রসর হতে পারি না। কিন্তু তিনি নিজে আমাদের স্তরে অবতরণ করে নিজেকে জানাতে পারেন। এই অত্যন্ত প্রাথমিক ও সারবান তত্ত্বকে আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে, তিনি নিজে আমাদের কাছে স্বেচ্ছায় আসতে পারেন এবং আমরা তাঁর কাছে যেতে পারি কেবল শ্রদ্ধার মাধ্যমে।

যে সত্যকে মেপে নেওয়া যায় তার চেয়ে শ্রদ্ধা অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের নিজেদের জাগতিক হিসেব নিকেশের চেয়ে মহাত্মাদের আদর্শ বা উদাহরণ অনেক বেশী মূল্যবান। বাহ্যিক, জাগতিক ও জড় সত্যের বিশেষ কোন মূল্য নেই। বরং এ হল মনের এক জোরালো, ভ্রান্ত ধারণা। শুদ্ধ ভক্তদের প্রজ্ঞালব্ধ আচারের চেয়ে জাগতিক সত্যকে বেশী সম্মান দেওয়া উচিত নয়। বরং শুদ্ধভক্তের আন্তরিক উপলব্ধিকে জাগতিক লোকের মেপে নেওয়া সত্যের চেয়ে বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত।

এইজগতের তথাকথিত বাস্তবতার সঙ্গে শ্রদ্ধার কোন সম্পর্ক নেই। এই বাস্তবতার থেকে সে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এমন এক জগতও আছে যা কেবল শ্রদ্ধার দ্বারা চালিত হয়। শ্রদ্ধাই সেখানে সব আর সেই জগত অনন্ত এবং সবকিছুরই স্থান আছে সেখানে। শ্রদ্ধার জগতে শ্রীভগবানের মধুর ইচ্ছার দ্বারাই যে কোন জিনিস সত্য হয়ে উঠতে পারে। আর এখানে, এই মৃত্যুর দেশে, আমাদের যে জাগতিক হিসেবনিকেশ তার কোন পরিণতি, কোন উপসংহার নেই। চরমে তা কেবল ধ্বংসকারী, তার কোন সত্যিকারের মূল্য নেই। তাই তা বর্জ্জন করা উচিত। বিষয়ী লোকেরা যে জ্ঞানের আওতায় আসে, যা কেবল জীবাত্মাকে শোষণের জন্যে মিথ্যে কারিকুরি মাত্র, তারতো কোন মূল্যই থাকতে পারে না। কিন্তু অনন্তের জগতে শ্রদ্ধাই হল একমাত্র পরিমাপ যা সেখানকার সবকিছুকে গতিশীল করে। শ্রীমদভাগবতে বলা হয়েছে—

স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্,
ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদা:
ভবৎ পদাম্ভোরুহনাবমত্র তে
নিধায় যাতা: সদনুগ্রহো ভবান্॥

(শ্রীমদভাগবতম ১০/২/৩১)

অর্থাৎ "হে স্বপ্রকাশ, আপনি ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু, আপনার চরণাশ্রিত মহাজনগণ, এই ভীষণ সুদুস্তর ভবার্ণব স্বয়ং উত্তীর্ণ হয়ে ভবদীয় পাদ-পদ্ম-তরণী ইহলোকে গুরুপরম্পরায় বা, শ্রৌতপন্থায় রেখে গেছেন, কেননা তাঁরা সর্বভূতে অতিশয় প্রীতিযুক্ত।"

এখানে শ্রীমদভাগবতের এই শ্লোকে যে তত্ত্বটি দেওয়া হয়েছে তা হল এই যে মহাসমুদ্রের মাঝখানে, যেখানে চারিদিকে জল ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, সেখানে যেমন কম্পাসই আমাদের একমাত্র দিগদর্শক, সেরকম অনন্তের জগতে যেসব মহাত্মারা শ্রদ্ধার পথে গেছেন,—তাঁদের পদচিহ্নই আমাদের একমাত্র পথ প্রদর্শক সেই পথ তাঁদের পবিত্র চরণচিহ্নে চিহ্নিত হয়ে আছে—যাঁরা উচ্চতম লোকে গেছেন। এই হল আমাদের একমাত্র আশাভরসা। যুধিষ্ঠির মহারাজও বলেছেন যে গোপন গহন সত্য সাধুদের হৃদয়ে এমনভাবে লুকোনো আছে যেন কোন ধনরত্ন কোন গহন রহস্যময় গুহার মধ্যে লুকোনো আছে (ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্)। যে উদার পথ পরম সত্যের পথে গেছে তা তাঁরাই এঁকে দিয়ে যাচ্ছেন যাঁরা সেই চিন্ময় জগতে যাচ্ছেন। সেই হল আমাদের সবচেয়ে সঠিক পথপ্রদর্শক। অন্য সব দিগদর্শনের পন্থাকে আমাদের বর্জন করা চলে কারণ তাদের জাগতিক হিসেবনিকেশ ভ্রমপ্রবণ।

শ্রীভগবান যিনি অনন্ত, পূর্ণব্রহ্ম, তাঁর কাছে থেকেই আমাদের পথের নির্দ্দেশ আসে। আর তাঁর এই নির্দ্দেশ যে কোন জায়গায়, যে কোন সময়ে, যে কোন রূপে আসতে পারে। এই ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমরা বৈকুণ্ঠের মর্মার্থ উপলব্ধি করতে পারি। বৈকুণ্ঠের অর্থ হল যেখানে কোন কুণ্ঠা নেই, অর্থাৎ কোন অন্ত নেই। এ যেন এক অনন্ত সমুদ্রে আমরা এক ছোট নৌকায় ভেসে যাচ্ছি। অনেক কিছুই আসবে যা আমাদের সাহায্য করবে অথবা বাধা দেবে। কিন্তু আমাদের গুরুদেব যাঁর প্রতি আমাদের আশাবাদী শুভ বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, আছে তাঁর কাছ থেকেই আসবে আমাদের পথের নির্দ্দেশ। শ্রীগুরুদেবই আমাদের পথপ্রদর্শক।

শ্রীমদভাগবতে বলা হয়েছে—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

(শ্রীমদভাগবতম ১১/২০/১৭)

অর্থাৎ "যিনি সর্বফলমূলীভূত, সুদুর্লভ, পটুতর, গুরুরূপ কর্ণধারযুক্ত এবং মৎস্বরূপ অনুকূলবায়ু পরিচালিত এই মনুষ্যদেহরূপ নৌকা ভাগ্যক্রমে সুলভে প্রাপ্ত হয়েও সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হন না, তিনি বস্তুতঃই আত্মঘাতী।"

এক অনন্ত সমুদ্রে আমরা এক ছোট নৌকায় চড়েছি, এই মানবজীবনের নৌকা, আর আমাদের গন্তব্যও অনিশ্চিত এবং অচিন্ত্যনীয়। কিন্তু আমাদের এই গন্তব্য আমাদের গুরুদেবের কাছে অচিন্ত্যনীয় নয়, তিনি তা উপলব্ধি করেছেন। অতএব গুরুদেবই আমাদের পথপ্রদর্শক, তিনিই আমাদের নৌকার কর্ণধার। তাই আমাদের অবশ্যই আন্তরিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। আমরা এক উত্তাল তরঙ্গময়, হাঙ্গর, তিমিঙ্গিল পূর্ণ ভয়ংকর সংসার সমুদ্র পার হবার চেষ্টা করছি। সেখানে সাধুদের নির্দেশই আমাদের একমাত্র আশাভরসা। তাঁদের উপর আমাদের অবশ্যই নির্ভর করতে হবে। এক অনন্ত সমুদ্রে তাঁরা আলোকস্তম্ভের মত দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের শ্রদ্ধার জগতে যাওয়ার দিগ্‌দর্শন করবেন বলে।

শ্রদ্ধা মানেই অনন্তের প্রতি বিশ্বাস আর বৈকুণ্ঠের অর্থ 'অনন্ত'। যেমন ভূগোলে উত্তমাশা অন্তরীপ বলে একটা জায়গা আছে, সেরকম শ্রদ্ধাও হল সেই মনোবৃত্তি যা অনন্তের প্রতি উত্তম আশায় পরিপূর্ণ। বৈকুণ্ঠ তো অনন্ত আর সেই অনন্তের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমাদের পক্ষে একটাই পথ খোলা আছে ; তা হল শ্রদ্ধার পথ।

শুধু শ্রদ্ধার দ্বারাই আমরা অনন্তকে আকর্ষণ করতে পারি। শ্রদ্ধা যখন কোন নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করে তখন তা ভাবের মধ্যে দিয়ে উত্তরণ করে প্রেমে পরিণত হয়। কলম্বাস তাঁর জাহাজের পাল তুলে দিয়েছিলেন তারপর সুদীর্ঘ জলযাত্রার পর অবশেষে আমেরিকায় এসে পৌঁছেছিলেন, তিনি যেন এক উত্তম আশার দেশে পা দিয়েছিলেন। সেইরকম আমরাও হয়ত আশার সঙ্গে, শ্রদ্ধার সঙ্গে যাত্রা করে বৈকুণ্ঠ পেরিয়ে, চিন্ময় জগতের উচ্চতম স্থানে পৌঁছতে পারি। শ্রদ্ধাই হল আমাদের অন্ধকারের আলো।

যখন আমরা অনন্তের যাত্রী তখন শ্রদ্ধাই আমাদের পথ দেখাবে। "আমি শুনেছি সেখানে যাবার এই হল পথ"—এইরকম একটি চেতনা আমাদের হৃদয়ে উদ্দীপনা দেবে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রদ্ধার সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—

'শ্রদ্ধা' শব্দে—বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণে ভক্তি কৈলে সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥

যেখানে কোন ঝুঁকি নেওয়া হবে না, সেখানে কোন লাভও হবে না। যেখানে সবচেয়ে বেশী ঝুঁকি আছে, সেখানেই সবচেয়ে বড় লাভও আছে। কৃষ্ণ আমাদের আশ্বাস দিচ্ছেন, ''আমি সর্ব্বত্রই আছি, সুতরাং ভয়ের কোনই কারণ নেই। শুধু এইটা উপলব্ধি কর যে আমি তোমার বন্ধু। আমি সর্ব্বেসর্ব্বা আর তুমিও আমারই। এইটা বিশ্বাস করাই সেই শ্রদ্ধার জগতে যাত্রা করার জন্যে তোমার একমাত্র পাথেয়।''

সেই পরম সত্য, সেই চিন্ময় বস্তু, যিনি শ্রদ্ধার মাধ্যমে আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়, তিনি সমস্ত শক্তি, সমস্ত চেতনার দ্বারা অলংকৃত। তিনি কৃপাময়, মঙ্গলময় ও পরমমধুর। আমাদের চেয়ে তাঁর ক্ষমতা অনন্তগুণে বেশী এবং আমরা তাঁর থেকে অনন্তগুণে ক্ষুদ্র। সুতরাং এই মনোভাব আমাদের থাকা উচিত যে তাঁর তুলনায় আমরা নিতান্তই ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর।

তাই যদি হয় তাহলে শিষ্যের প্রকৃত লক্ষণ কি হবে? কে হল সত্যকারের সত্যসন্ধানী? যিনি সত্যের অনুসন্ধান করবেন তাঁর কি গুণ থাকা দরকার, কেমন হবে তাঁর মনোভাব, তাঁর প্রকৃতি? আর যিনি গুরু হবেন, পথপ্রদর্শক হবেন তাঁরই বা লক্ষণ কি?

শ্রীমদভগবতগীতায় কৃষ্ণ বলেছেন,

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিন: ॥

(শ্রীমদভগবতগীতা ৪/৩৪)

অর্থাৎ 'তুমি তত্ত্বদর্শী গুরুকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত, সঙ্গত প্রশ্ন ও অকৃত্রিম সেবার দ্বারা সন্তুষ্ট করে পূর্ব্বোক্ত সেই জ্ঞানের কথা জানতে পারবে। শাস্ত্রজ্ঞানে সুনিপুণ ও পরব্রহ্ম বিষয়ে সাক্ষাৎ অনুভূতিসম্পন্ন মহাপুরুষগণ তোমাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করবেন।''

সুতরাং কিসের প্রয়োজন? প্রণিপাত ও সেবা। তবেই সেই প্রশ্ন 'পরিপ্রশ্ন' হবে, যথার্থ হবে, তা না হলে তা কেবল এক মিথ্যা লেনদেনে পর্য্যবসিত

হবে, যার কোন মূল্যই নেই। এ কেবল শক্তির অপচয়। অকৃত্রিম শ্রদ্ধা কখনই আমাদের যা ইচ্ছে করার অনুমোদন করবে না, আমাদের যে সেই স্বাধীনতা আছে সেকথা সে মানবে না। তাই ভক্তের পক্ষে, সাধকের পক্ষে শ্রদ্ধাই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু।

যখন কারও শ্রদ্ধা বিকশিত হবে তখন সে শ্রীভগবানের নিজস্ব সত্ত্বাময় সেই উচ্চতর চিন্ময় জগতের দিকে যাবার জন্যে সবকিছু করতে প্রস্তুত থাকবে। যার শ্রদ্ধা আছে সে চাইবে সেই উচ্চতম সত্ত্বার সঙ্গে যোগযোগ করার জন্যে যিনি সৎ চিৎ আনন্দের দ্বারা পরিপূর্ণ। অস্তিত্ব, জ্ঞান ও প্রেমের ভাবনা দ্বারাই শ্রদ্ধা গতিশীল হয়। আর যখন এই তিনটি বস্তুর উপলব্ধি হবে তখনই আমাদের অস্তিত্ব সম্পূর্ণ কৃতার্থ হবে। শ্রদ্ধা আমাদের উপরের জগতেই যেতে বলে, নীচের জগতে নয়। আর 'কৃষ্ণ সর্ব্ব বিষয়ই আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তিনি আমাদের অভিভাবক ও সুহৃদ'—এইরকম চিন্তাই শ্রদ্ধার ভিত্তি।

যুক্তিবাদীরা তাঁদের বৈজ্ঞানিক মস্তিস্ক দিয়ে সবসময়ই নানা উপায় খুঁজছেন যাতে যেসব জিনিস তাঁরা গবেষণা করে আবিষ্কার করেছেন তাকে কাজে লাগানো যায় ও হুকুম মত খাটানো যায়। কিন্তু শ্রদ্ধা এমন এক বস্তুর সঙ্গে জড়িত যা এসবের থেকে সর্ব্বরকমেই অনেক উচ্চস্তরের বস্তু, এমনকি যিনি আবিষ্কারক তাঁর চেয়েও যিনি উচ্চতর বস্তুর অনুসন্ধান করবেন তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই অনুসন্ধান করতে হবে। শ্রদ্ধা সম্বন্ধে প্রকৃত নির্দেশও প্রয়োজন এবং সেই নির্দেশ আসে এক উচ্চতর স্তর থেকে। সেই মনোভাব নিয়েই আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে যদি আমরা সাফল্য চাই। তাই ভগবতগীতা উপদেশ দিয়েছেন, "প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া"।

উপনিষদে বলা হয়েছে—

তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপানিং শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥

(মুন্ডক ১/২/১২)

অর্থাৎ 'সেই ভগবদবস্তুর বিজ্ঞান (প্রেমিভক্তিসহিত জ্ঞান) লাভ করার

জন্যে তিনি সমিধ (যজ্ঞ কাঠ) হস্তে দেবতাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদগুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করবেন।' 'সমিধ হস্তে' অর্থাৎ শিষ্য যেন সেবা করার জন্যে, আত্মত্যাগ করার জন্যে, প্রস্তুত হয়েই গুরুর কাছে যান।

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসু: শ্রেয়: উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥

(শ্রীমদভাগবত ১১/৩/২১)

অর্থাৎ "কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তমশ্রেয় অবগত হবার জন্যে সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করবেন। যিনি 'শব্দব্রহ্মে' অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্র সিদ্ধান্ত সুনিপুণ, 'পরব্রহ্মে' নিষ্ণাত অর্থাৎ যিনি অধোক্ষজ-অনুভূতি লাভ করেছেন এবং সেজন্যে যিনি প্রাকৃত কোনও ক্ষোভের বশীভূত নন, তিনিই সদ্‌গুরু।"

এইসব বিষয়ে আমাদের খুব মনোযোগ দিতে হবে। আত্ম অনুসন্ধানের দ্বারা আমাদের বোঝার চেষ্টা করতে হবে যে আমরা শ্রদ্ধার মাধ্যমে সত্যিসত্যিই শ্রীভগবানের দিকে অগ্রসর হচ্ছি কিনা। এটাও আমাদের দেখতে হবে যে আমাদের শ্রদ্ধা সত্যি কিনা।

সত্যিকারের শ্রদ্ধা আর যে কোন জিনিসকে বিশ্বাস করার একটা প্রবণতা—এই দুটি বস্তু কখনও এক নয়। একজন, তিনি প্রকৃত শ্রদ্ধা বিশিষ্ট প্রকৃত সত্যসন্ধানী, না তিনি কোন ভেজাল দূষিত বিশ্বাস নিয়েই রয়েছেন—এ সব বিষয় আমাদের বিবেচনা করতে হবে। প্রকৃত শ্রদ্ধার নানা লক্ষণও আছে। এজন্যে উচ্চাধিকারসম্পন্ন বৈষ্ণব, যাঁরা এসব তত্ত্বে বিশেষজ্ঞ, তাঁদের কাছে আমাদের উপদেশ নিতে হবে, নির্দ্দেশ নিতে হবে, কারণ শ্রদ্ধা হল খুবই গুরুত্বপূর্ণ বস্তু।

যখন আমরা সত্যের সন্ধানে রয়েছি তার মানে বর্ত্তমানে আমাদের যা আছে, সেই স্বোপার্জ্জিত তথ্যে আমরা সন্তুষ্ট নই। একটি উচ্চতর স্তরে আরোহণ করার জন্যে আমরা একটা ঝুঁকি নিচ্ছি। সেইজন্যে খুব সাবধানতার সঙ্গে আমাদের উপদেশ-নির্দ্দেশ নিতে হবে। যতটা সম্ভব আমাদের এ বিষয়ে মনোযোগী হতে হবে। আমাদের বলা হয়েছে যে বর্ত্তমানের যুক্তিতর্ক আমাদের সাহায্য করার পক্ষে যথেষ্ট নয়, যে

যুক্তিতর্কের চেয়ে শ্রদ্ধার প্রয়োজন বেশী আর শ্রদ্ধারও নানা লক্ষণ আছে। তবুও যতদূর সম্ভব আমরা আমাদের যুক্তির প্রয়োগ করব।

যখন আমি প্রথম এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবমঠে এলাম তখন আমি চিন্তা করলাম যে 'যে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব আমি এই বৈষ্ণবদের কাছে শুনছি তা কোন জাগতিক বুদ্ধিবৃত্তির আওতায় পড়ে না, তবুও যখন আমি নিজেকে এই বৈষ্ণবসঙ্গের মধ্যে নিক্ষেপ করতে চাইছি, তখনও আমি নিজের যুক্তি ও বুদ্ধিকে যতটা সম্ভব কাজে লাগাব, এই উপলব্ধি নিয়েই যে আমি এমন একটা বস্তুর উপর লম্ফ দিয়ে উঠতে চাইছি যা আমার ক্ষমতার বাইরে, আমার হিসেবনিকেশের বাইরে।" তাই শ্রদ্ধা কি বস্তু তা আমাদের খুব যত্নের সঙ্গে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে, সাধু, শাস্ত্র ও গুরুদেবের নির্দেশে।

একথাও নিশ্চয়ই ঠিক যে যদিও আমরা ঠিক পথে যাইও, তবুও সেদিকে কোন নিশ্চয়তা নেই যে সে পথে কোন বাধাবিঘ্ন থাকবে না। যদি আমরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইও, তবুও নানা অপ্রত্যাশিত বাধাবিঘ্ন এসে আমাদের ঝঞ্ঝাটে ফেলতে পারে এবং আমাদের অগ্রগতির পথে বিলম্ব করাতে পারে। যদিও আমরা দেখব আমাদের চারিদিকে অনেকেরই পতন হচ্ছে বা অনেকেই পিছু হটছেন তবুও আমরা অবশ্যই এগিয়ে যাব। আমাদের অবশ্যই এমন দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রত্যয় থাকবে যে যদিও যাঁরা আমাদের সঙ্গে একইসঙ্গে পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন তাঁদের অনেককেই আমরা ফিরে যেতে দেখব তবুও আমরা মনে করব যে আমাদের তো এগিয়ে যেতেই হবে। যথাসম্ভব শক্তি সঞ্চয় করে আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে, যদি প্রয়োজন হয় তবে একাই। আমাদের বিশ্বাস যেন এত সুদৃঢ় হয় যে দরকার হলে আমরা প্রত্যয়ের সঙ্গে একাই এগিয়ে যাব এবং আমাদের প্রভুর আশীর্ব্বাদে পথের সব বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করে চলে যাব। এইভাবে আমাদের অবশ্যই নিজেদের শক্তিশালী করে তুলতে হবে, যোগ্য করে তুলতে হবে। অনন্যা ভক্তিকে অবশ্যই অন্তরের মধ্যে বিকশিত করতে হবে। এজন্যে সাধুসঙ্গ, ভক্তসঙ্গ অবশ্যই খুঁজে নিতে হবে। তবুও কখনও কখনও এমনও মনে হবে যেন আমাদের জন্যে কোন সৎসঙ্গই নেই, আমরা একেবারেই একলা পড়ে গেছি। তখনও আমাদের

এগিয়ে যেতে হবে এবং সত্যের দিগ্‌দর্শক আলোকে খুঁজে নিতে হবে।

প্রগতির পথে চর্চা মানেই কোন জিনিস বর্জন করা আর কোন জিনিস গ্রহণ করা। তবে আমরা দেখব যে আমাদের আত্মনিবেদনের পথে এগিয়ে যেতে অনেকেই সাহায্য করতে পারেন, তাই চোখ খোলা রেখেই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। শাস্ত্র অনেক বিভিন্ন স্তরের কথা বর্ণনা করেছেন যা অতিক্রম করে আমাদের লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে হবে। বর্জনের পন্থা দ্বারা দেখানো হয়েছে সেই প্রগতির পথ বা ব্রহ্মা থেকে শিব থেকে লক্ষ্মীদেবীর দিকে গেছে. শেষপর্যন্ত দেখানো হয়েছে উদ্ধবই সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু উদ্ধবের মতে গোপীরাই শ্রীভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত বা সেবিকা। শ্রীল রূপ গোস্বামীও তা সমর্থন করেছেন।

কর্ম্মিভ্য: পরিতো হরে: প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিন-
স্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্ত-ভক্তিপরমা: প্রেমৈকনিষ্ঠাস্তত:।
তেভ্যস্তা: পশুপালপঙ্কজ-দৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা
প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয় সরসী তাং নাশ্রয়েৎ ক: কৃতী॥

(শ্রীউপদেশামৃত ১০)

অর্থাৎ ''শাস্ত্রে উল্লেখ আছে যে, সকল প্রকার সৎকর্ম্ম নিরত পূণ্যবান কর্ম্মীর তুলনায় চিদান্বেষী জ্ঞানী ব্যক্তি শ্রীহরির প্রিয়। ঐসকল জ্ঞানী ব্যক্তির মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত উন্নত এবং যাঁরা তাঁদের উন্নত জ্ঞানের মাধ্যমে মুক্তির স্তর লাভ করেছেন, তাঁরা ভগবানের ভক্তি-সেবা লাভ করতে পারেন। তিনি অন্যান্যদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ এবং যিনি প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেম লাভ করেছেন তিনি ঐ মুক্তিপ্রাপ্ত জ্ঞানী ব্যক্তিদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ব্রজনারীগণ (গোপীগণ)ভক্তির অনন্য স্তরে অধিষ্ঠিতা, কারণ তাঁরা কৃষ্ণগতপ্রাণা। তাঁরা কৃষ্ণের শ্রীচরণে আশ্রয়লাভ করার জন্যে সবাইকে ও সবকিছুকে ত্যাগ করেছেন, এমনকি স্বজন ও বেদবিহিত আর্যপথকেও ত্যাগ করেছেন। ঐ গোপীদের মধ্যেও আবার শ্রীমতী রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়। কৃষ্ণ রাসনৃত্যের সময়ে শতকোটি গোপীকে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন একমাত্র রাধারাণীর অন্বেষণে। তিনি কৃষ্ণের এতই প্রিয় যে, যে কুণ্ডে তিনি স্নান করেন সেই রাধাকুন্ডও কৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় স্থান।

সুতরাং এমন কে আছেন যিনি বৈষ্ণব আনুগত্যে এই পরম পবিত্র স্থানে তাঁর এই সরোবরের তীরে সেবা সৌভাগ্য লাভ করার জন্যে আশ্রয় গ্রহণ করবেন না? বাস্তবিক পক্ষে যারা রাধাকুণ্ডের তীরে রাধাকৃষ্ণের ভজনসাধন করেন তাঁরা পরম ভাগ্যবান।"

"এহ বাহ্য, আগে কহ আর"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে রায় রামানন্দ সংবাদে আমরা দেখতে পাই শ্রীমন মহাপ্রভু বারবার বলেছেন, "এহ বাহ্য, আগে কহ আর।" অর্থাৎ তিনি বলছেন কৃষ্ণভাবনামৃতের আরও গভীরতর স্তরে যেতে, আরও উচ্চতর স্তরে যেতে। অনেকেই একটা বিশেষ স্তরে গিয়ে থেকে যান কারণ তাঁরা মনে করেন সেইটাই উচ্চতম স্তর। কিন্তু শ্রীল সনাতন গোস্বামীর বৃহৎভাগবতামৃতে আমরা দেখি যে এক গোপকুমার তিনি কেমন করে ভক্তির নিম্নতম স্তর থেকে শুরু করে, বিভিন্ন স্তরের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে শেষ পর্য্যন্ত কৃষ্ণভক্তির পথে সখ্যরসে এসে উপনীত হলেন। সেখানে বর্ণিত আছে কেমন করে তিনি ক্রমে ক্রমে এক এক স্তরকে বর্জ্জন করে ক্রমবিকশিত ভক্তির দ্বারা উচ্চতর স্তরে এসে উপনীত হলেন।

যখন তিনি এক স্তর থেকে পরের স্তরে যাচ্ছেন, যেখানে সকলেই তাঁকে সাহায্য করছেন, প্রেরণা দিচ্ছেন কিন্তু এখন তাঁদের সঙ্গও যেন তাঁকে তেমন প্রেরণা দিতে পাচ্ছিল না, যেন নতুন কোন উচ্চতর সঙ্গ তিনি অন্বেষণ করছিলেন। সেই সময়ে কোন ঐশ্বরিক প্রতিনিধি মাধ্যমে তাঁকে এক উচ্চতর সুযোগ দেওয়া হয় এবং যে স্তরে তিনি ছিলেন সেই স্তরকে পিছনে ফেলে এক নতুন উচ্চতর স্তরে তিনি চলে যান। এই ভাবে বৃহৎভাগবতামৃতে আত্মনিবেদনের ক্রমবিকাশকে দেখানো হয়েছে।

উচ্চতর আলোকশিখা

যেমন এই জড়জগতে সূর্য, চন্দ্র ও আরও নানা গ্রহ ও নক্ষত্র আছে সেরকম শ্রদ্ধার জায়গাতে বা শ্রদ্ধালোকে গ্রহনক্ষত্রের স্তরভেদ আছে। শাস্ত্রকে আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অধ্যয়ন করতে হবে, সমীক্ষা করতে হবে, সাধুরা যে নির্দ্দেশ দিয়েছেন তার সুযোগ নিতে হবে, এবং কেমন

করে নিম্নস্তরকে বর্জ্জন করে শ্রদ্ধার উচ্চস্তরে উন্নতি লাভ করা যায় তা উপলব্ধি করতে হবে। আর যখনই কোন সন্দেহ আসবে তখনই কোন উচ্চতর প্রতিনিধির কাছে উপদেশ নিতে হবে, যাত্রার অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখার জন্যে।

চিন্ময় তত্ত্বই সৎ, চিৎ ও আনন্দ—তা হল নিত্য অস্তিত্ব, পূর্ণতম চেতনা ও পরিপূর্ণ অনন্ত আনন্দ। আমাদের নিছক অস্তিত্ব—যা শুধু বাঁচার জন্যে বেঁচে থাকা— তা কখনও আমাদের সন্তোষ দিতে পারে না, পরিপূর্ণতা দিতে পারে না। এমনকি আমাদের আভ্যন্তরীন লালসা ও অনুভূতি, আমাদের আভ্যন্তরীন চেতনাও যথেষ্ট নয়, এই পরিপূর্ণতার জন্যে। যা আমাদের প্রয়োজন তা হল প্রেমভক্তি ও চিন্ময় আনন্দ, তাই আমাদের পরিপূর্ণতা দিতে পারে।

আধ্যাত্মিক উপলব্ধিও বিভিন্ন প্রকারের হয়। এইসব বিভিন্ন প্রকারের আধ্যাত্মিক ধারণার পার্থক্য আমাদের বুঝতে হবে এবং যতই আমরা বাস্তব সত্যের গভীরে ডুব দেবো ততই আমাদের রুচি ও সম্ভাবনা উন্নত হবে। আমাদের বাঁচার জন্য মরতে হবে। এই মৃত্যুর ধারণাও গভীর থেকে, গভীরতর এবং গভীরতম হতে পারে। এক উঁচু ও নীচুর স্তরভেদ সেখানেও আছে। পথের লক্ষ্যে পৌঁছাবার জন্যে পুরনো জিনিসকে অবশ্যই বর্জ্জন করে নতুন জিনিসকে গ্রহণ করতে হবে। যেসব কর্ত্তব্যের মাঝখানে এখন রয়েছি তাদেরও পিছনে ফেলে চলে যেতে হবে অন্য এক উচ্চতর কর্ত্তব্যের ডাকে সাড়া দিতে।

এইভাবে সাধু ও শাস্ত্রের উপদেশ নিয়ে আমাদের অগ্রগতির পথে এগিয়ে যেতে হবে। তাঁরা শ্রদ্ধার সমুদ্রে আমাদের দিগ্‌দর্শন করবেন। তা নাহলে সেই চিন্ময় জগত অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। কয়েকজন বিশিষ্ট মহাজনের কাছে সেই অনন্ত পূর্ণব্রহ্ম জ্ঞাত ও জ্ঞেয় এবং তাঁরাই আমাদের পথের নির্দ্দেশ দিচ্ছেন। যদি তার সুযোগ আমরা নিই তবে সাধু ও শাস্ত্রের নির্দ্দেশে ক্রমশঃ ক্রমশঃ আমাদের দোষক্রটিগুলো আমরা পরিত্যাগ করতে পারব।

প্রথমে আমাদের এই জড় অস্তিত্বকে বর্জ্জন করতে হবে। তারপর আমাদের যুক্তিকে, চেতনাকে সন্তুষ্ট করতে হবে। সর্ব্বশেষে আমাদের

হৃদয়কে সন্তুষ্ট করতে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে এই হৃদয়ই আমাদের ভিতরের সবচেয়ে বড় জিনিস। তাই হৃদয়ের নির্দ্দেশকে আমাদের মানা উচিত। হৃদয়ের পরিপূর্ণতাই সর্ব্বোত্তম পরিপূর্ণতা, চেতনার পরিপূর্ণতা নয়, এমনকি নিত্য অস্তিত্বের প্রাপ্তিও নয়। নিত্য অস্তিত্বের কোন অর্থ নেই যদি তা চেতনময় না হয় আর চেতনারও কোন অর্থ নেই যদি তা পরিপূর্ণতা না দিতে পারে। তাই সৎ, চিৎ আর আনন্দ এই তিন তত্ত্বের সমাহারই আমাদের পরম গন্তব্যের লক্ষ্য। আর এই লক্ষ্যকে হৃদয়ে রেখেই আমরা সেই চিন্ময় জীবনের পথে উত্তরোত্তর অগ্রসর হবো।

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে,

বিদ্বভি: সেবিত: সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভি:।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যো ধর্ম্মস্তন্নিবোধত।।

(মনুসংহিতা ২/১)

অর্থাৎ 'যে ধর্ম রাগ দ্বেষ মোহ ইত্যাদি চিত্তধর্ম থেকে প্রসূত হয়নি, মূর্খ দুঃশীল পুরুষ প্রবর্ত্তিত অজ্ঞানমূলক ইতর ধর্ম্মের মত যা কালে উৎপন্ন হয়ে কালেই লয় পায় না, পরন্তু স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ বেদপ্রবর্ত্তিত বলে যা অনাদিকাল থেকে চলে আসছে; শাস্ত্র সংস্কৃতমতি প্রমাণ-প্রমেয় স্বরূপ কুশল বেদবিদ বিদ্বান অথচ অনুষ্ঠানপর সাধুগণ চিরদিন যার অনুষ্ঠান ও আদর করে আসছেন, যার সত্যাসত্য সম্বন্ধে হৃদয়ই বিশেষ প্রমাণ—ইতর ধর্ম্মের ন্যায় যার অনুষ্ঠানে চিত্তের আক্রোশ নেই, পরন্তু চিত্তপ্রসাদ আপনা-আপনি উপস্থিত হয়, সেই বেদ-প্রমাণিত শ্রেয়ঃসাধন ধর্ম্মতত্ত্ব আপনারা অবধান করুন।"

মনুসংহিতার এই বিখ্যাত শ্লোকে হৃদয়ের অনুভূতিকে এবং যে বস্তুর সর্ব্বোত্তম প্রমাণ হৃদয়েই পাওয়া যায় সেই বস্তুকেই সর্ব্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

হৃদয়ের অভ্যন্তরেই আমরা উপলব্ধি করতে পারব যে আমরা লাভবান হয়েছি না ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছি। সেই আস্বাদনের যন্ত্র আমাদের ভিতরেই আছে। যখন আমরা কৃষ্ণভাবনামৃতের পথে এগিয়ে যাবো, তখন আমাদের কর্ম্ম, যা এই সংসারের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র তা দেখতে দেখতে ধোঁয়ার

মত মিলিয়ে যাবে ও অন্য এক ব্যাপক জ্ঞান ও উপলব্ধি এসে আমাদের পরিতৃপ্ত করবে। সেইসময়ে আমাদের জীবনের লক্ষ্যকে আমরা সর্ব্বত্র দেখতে পাবো (ময়ি দৃষ্টে হ্যখিলাত্মনি)। যখন আমরা দেখব যে জীবনের পরম পরিপূর্ণতা আমাদের স্পর্শ করেছে তখন দেখব যে সমস্ত পারিপার্শ্বিকই আমাদের সাহায্য করছে, চতুর্দ্দিকে সকলেরই ও সবকিছুর সহানুভূতি আমাদের জন্যে আছে। সেই চিন্ময় জগতে সকলেই আমাদের ভালবাসার জন্যে উদগ্রীব হবে। আমরা হয়ত নিজেদের স্বার্থের প্রতি উদাসীন থাকতে পারি কিন্তু সেখানকার পারিপার্শ্বিক কতটা আমাদের শুভাকাঙ্খী ও কতখানি আমাদের প্রতি স্নেহময় তার আমরা পরিমাপও করতে পারি না, ঠিক যেমন ছোট শিশু তার মার ভালবাসার পরিমাপ করতে পারে না। এইভাবে আমরা চিন্ময় জগতের আত্মীয় স্বজন, বন্ধুবান্ধব পরিবৃত হয়ে থাকব আর সেই শ্বাশত সুখনিকেতনের, সেই শ্বাশত সেবানিকেতনের প্রেমভক্তিসুখ ও সেবাস্বাচ্ছন্দ্য আমাদের ঘিরে থাকবে। এই বিশ্বাস ও উপলব্ধি নিয়েই আমরা শ্রীভগবানের কাছে, আমাদের আপন ঘরে ফিরে যাবো।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পারিপার্শ্বিক জগত

কৃষ্ণভক্তির অর্থ হল আত্মত্যাগ—বাঁচার জন্যে মরা। কৃষ্ণভক্তির দ্বারা আমাদের এই জড়, আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর জীবনের সমস্ত ধারণা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যাবে।

'নারদ-পঞ্চরাত্রে' বলা হয়েছে—

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেন হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।।

অর্থাৎ, '(অপ্রাকৃত) ইন্দ্রিয়ের দ্বারা (অপ্রাকৃত) ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তি। তাদৃশী ভক্তি ঔপাধিক অর্থাৎ দেহ ও মনোধর্ম্মের ব্যবধানরহিত, কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টাপর এবং নির্ম্মল অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মরূপ আবিলতা দ্বারা আচ্ছন্ন নয়।'

শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে' এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন এই প্রাচীন পুরাণ থেকে। উপাধির অর্থ হল ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার সর্ব্বরকমের আপেক্ষিক ধারণা। সুতরাং সমস্ত রকমের আপেক্ষিক ধারণা বা 'উপাধি' থেকে আমাদের সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হতে হবে।

শ্রীল রূপগোস্বামী ভক্তির অভিজ্ঞান দিয়ে আর একটি শ্লোকও দিয়েছেন—

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা।।

(শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ব বিভাগ ১/১১)

অর্থাৎ 'অনুকূলভাবে কৃষ্ণ বিষয় অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। তাদৃশী

ভক্তিতে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নেই। তা নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি ধর্ম্মদ্বারা আবৃত নয়।"

সুতরাং শুদ্ধভক্তি হল কৃষ্ণ অনুশীলন যার মধ্যে অন্য কোন অভিলাষ, যেমন জ্ঞান, কর্ম্ম ইত্যাদি কিছু নেই। ভক্তি যেন সর্ব্বরকমের ক্ষণিক অভিলাষ—যেমন কর্ম্ম বা নিজের জড় উন্নতির চেষ্টা বা জ্ঞান যা নিজের ক্ষমতা, বিদ্যা বা বুদ্ধি দ্বারা লক্ষ্যে পৌঁছবার চেষ্টা—তার থেকে মুক্ত থাকবে। নিজেই নিজের কর্ত্তা হওয়ার যে চেষ্টা অথবা নিজের ভাগ্যের বিধাতা হওয়ার যে চেষ্টা—তারই নাম হল 'জ্ঞান'। এখানে 'আদি' শব্দের অর্থ 'যোগ' বা ওইরকম কোন বাহ্যিক বস্তু। এ সবই হল উপরের আবরণ, যা আত্মাকে আবৃত করে রাখে। কিন্তু আত্মার অভ্যন্তরে এইরকম কোন উপাদান পাওয়া যায় না। প্রকৃত আত্মা হল কৃষ্ণের নিত্যদাস।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলেছেন, "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।" সুতরাং কৃষ্ণের নিত্যদাসত্বই জীবাত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যিনি অনন্ত তাঁকে উপলব্ধি করতে হলে এই নিত্যদাসত্বের স্তরে আমাদের অবশ্যই আসতে হবে, এই নিত্যদাসত্ব বিনা সেই উপলব্ধি কিছুতেই সম্ভব নয়। এর চেয়ে কম কোন কিছুতেই তা সম্ভব নয়। তাঁর মধুর ইচ্ছার লীলাতে আমরা যেন নিজেদের ক্রীতদাসের মত সম্পূর্ণ নিবেদন করতে পারি।

ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে আমরা একটি কাহিনী শুনেছি। একসময় ইংরেজ সরকার ইরাণের বাদশার চিত্তবিনোদন করতে চেয়েছিল। তারা বাদশাকে ইংল্যান্ডে নিমন্ত্রণ করে নানাভাবে তাঁকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করছিল যাতে বাদশার সহানুভূতি তাদের প্রতিই থাকে, রাশিয়ার জারের প্রতি না থাকে। অনেক কিছুই বাদশাকে তারা দেখাল। তারপর একসময় যেখানে ফাঁসির আসামীদের শিরচ্ছেদ করা হয় সেখানে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে বাদশাকে ফাঁসির জায়গাটা দেখানো হল। তারা তাঁকে বোঝালো যে সেখানে অনেক বড় বড় লোকেরও, এমনকি একজন রাজারও, প্রথম চার্লসেরও (চার্লস দ্য ফার্স্ট) সেখানে মাথা কাটা গেছে। সে জায়গাটা দেখে বাদশা তখন বললেন, "তাহলে এখন একজনকে এখানে এনে তার মাথা কাটো। আমাকে এই ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখতে দাও।"

ইংরেজরা শুনে তাজ্জব বনে গেল। বাদশা বলছেন কি! তাঁর স্ফূর্ত্তির জন্যে আমাদের একজনকে খুন করতে হবে? তারা বাদশাকে বলল "না, এ কখনই সম্ভব নয়। আমাদের ব্রিটিশ আইনে আমরা বিনাকারণে একজনকে মৃত্যুদণ্ড দিতে পারি না।" তখন বাদশা বললেন "তোমরা কি তাহলে রাজার কদর বোঝো না? আমি ইরাণের বাদশা, আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে তোমরা একজন সামান্য মানুষকে বলি দিতে পারো না? যাই হোক, তোমাদের পক্ষে তা যদি সম্ভব না হয় তাহলে আমি আমার একজন লোকই তোমাদের দেবো। আমার চাকরবাকরদের থেকে একজনকে নিয়ে আমাকে দেখাও তোমাদের দেশে কি করে তোমরা লোকের মাথা কাটো।"

তখন ইংরেজরা খুব বিনীতভাবে তাঁকে নিবেদন করল, "শাহেনশা, আমাদের দেশের আইনে এটাও সম্ভব নয়। আপনার দেশে হয়ত আপনি এরকম করতে পারেন, কিন্তু এখানে আপনার কোন লোককেও শুধুমাত্র কারো চিত্তবিনোদনের জন্যে খুন করা যেতে পারে না। তখন বাদশা তার উত্তরে বললেন, "তাহলে রাজা কি জিনিস তা তোমরা বোঝ না।"

এ জগতে ক্রীতদাসত্বের অর্থ হল এইরকম, একজন ক্রীতদাসের কোন মূল্যই নেই, তার মালিকের খেয়াল হলেই তাকে বিসর্জ্জন দেওয়া যেতে পারে, তাকে বলি দেওয়া যেতে পারে। এই ইতর জড়জগতের স্তরে এইরকম ক্রীতদাসত্বের ধারণা খুবই জঘন্য এবং এতই ভয়ঙ্কর যে চিন্তা করা যায় না। কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে যে চিন্ময় জগতের উচ্চতর স্তরে, প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের ভক্তরা এইরকম চরম মাত্রায় আত্মবিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত থাকেন। তাঁদের প্রেমের গভীরতা এমনই যে কৃষ্ণের সামান্যতম সুখ বা সন্তোষের জন্য তাঁরা সম্পূর্ণরূপে আত্মবিসর্জ্জন করতে প্রস্তুত আছেন, তাঁরা বাঁচার জন্য মরতে রাজী আছেন। কিন্তু আমাদের এটাও মনে রাখতে হবে যে কৃষ্ণের খুশী যাই হোক না কেন, তিনি হলেন পরম মঙ্গলময়। তাই তাঁর জন্যে আত্মবিসর্জ্জন দিলে আমাদের প্রকৃত মৃত্যু হয় না, বরং এক উচ্চতর আত্মনিবেদনের জগতে প্রবেশ করে আমরা প্রকৃত জীবন পাই।

শ্রীমদ ভাগবতমে বলা হয়েছে,

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।।

(শ্রীমদভাগবতম ৭/৫/২৩-২৪)

"যিনি স্বয়ং ভগবান শ্রীবিষ্ণুতে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক ব্যবধান (জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ প্রভৃতি) রহিত হয়ে তদ্বিষয়ক শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন—এই নবলক্ষণ ভক্তি অনুষ্ঠান করেন, তিনিই উত্তমরূপ শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন বলে মনে করি। অর্থাৎ তাঁরই শাস্ত্রানুশীলন সার্থক হয়েছে।" সাধনা ক প্রকারের ? কৃষ্ণভক্তি লাভ করার উপায় কি? কেমন করে আমরা আমাদের অন্তর্নিহিত কৃষ্ণপ্রেমকে জাগিয়ে তুলতে পারি? আমাদের বলা হয়েছে আমাদের কৃষ্ণকথা শ্রবণ করতে হবে, কৃষ্ণকথা আলোচনা করতে হবে, তাঁকে স্মরণ করতে হবে, তাঁকে বন্দনা করতে হবে, ইত্যাদি প্রকারে আমাদের কৃষ্ণপ্রেমকে অনুশীলন করতে হবে।

কিন্তু শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের টীকায় যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে বলেছেন এই 'শ্রবণং-কীর্ত্তনং' এই সাধনায় থেকে আমাদের কি লাভ হবে এরকম চিন্তা যেন আমরা কখনও না করি। বরং আমাদের প্রার্থনা যেন এইরকম হয়, "আমার প্রভুর আমি যে সেবাই করি না কেন, তার ভোক্তা আমি নই, তিনিই সবকিছুর একমাত্র মালিক।" ভজনের এইসব ক্রিয়াপদ্ধতি ('শ্রবণং কীর্তনং' ইত্যাদি) তখনই 'ভক্তিপদবাচ্য হবে যদি তার মধ্যে একটি বিশেষ শর্ত পূর্ণ হয়, তা না হলে এই সবই 'কর্ম্ম', 'জ্ঞান' বা 'যোগ' ইত্যাদিতে পরিণত হবে। এমন কি তারা বিকর্ম্মও হতে পারে। এইসব সাধন পদ্ধতি যে প্রকৃত ভক্তি তা নিশ্চয় করার জন্যে একটি শর্ত অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে। তা হল এই উপলব্ধি যে "আমরা হলাম শ্রীভগবানের সম্পত্তি, আমরা নিজেরা কোন ঐশ্বর্য্য বা সম্পত্তির মালিক নই।" এই উপলব্ধি আমাদের যেন অবশ্যই থাকে, "আমার প্রভুই একমাত্র মালিক এবং আমি তাঁর সম্পত্তি। সবকিছু তাঁরই সম্পত্তি।"

কৃষ্ণ বলেছেন, "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।" "আমিই যজ্ঞ সমূহের ভোক্তা এবং ফলদাতা" (শ্রীমদ্ভগবতগীতা ৯/২৪)। তিনি বলছেন "সমস্ত কর্ম্মের আমিই ভোক্তা। এ বিষয়ে তোমাদের সম্পূর্ণ সচেতন থাকতে হবে।" কঠোর সত্য হল এই যে ভক্তি কোন সস্তা জিনিস নয়। শুদ্ধ ভক্তি মুক্তির উপরে। মুক্তির নেতিবাচক স্তরের উপরে এই ইতিবাচক স্তরে, কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান। তিনিই সবকিছুর প্রভু।

আত্ম নিবেদনের ভূমিতে তিনিই একমাত্র প্রভু। সেই জগতে প্রবেশের জন্যে আমাদের একটা প্রবেশপত্র জোগাড় করতে হবে। সেখানে তাঁর মধুর ইচ্ছাই একমাত্র আইন। 'অনন্ত' 'পূর্ণব্রহ্ম' এসব শব্দ উচ্চরণ করা খুব সহজ। কিন্তু এইসব শব্দের মর্ম্মার্থের গভীরে যদি আমরা প্রবেশ করি তবে আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে তাঁর মধুর ইচ্ছাই সর্ব্বেসর্ব্বা। সত্যের জগতে প্রবেশপত্র পাওয়ার জন্যে উপলব্ধি আমাদের অবশ্যই থাকতে হবে।

আর একথা গোলোক বৃন্দাবন সম্বন্ধে আরও সত্য, যেখানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ দাবী করা হয়। বৈকুণ্ঠে কিছু আইনকানুন, বিচারব্যবস্থার ধারণা আছে, যাঁরা সেখানে প্রবেশ করেন তাঁদের সম্বন্ধে সামান্য শিথিলতা থাকতে পারে। কিন্তু গোলোকে এবিষয়ে খুবই কঠোরতা আছে। সেখানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের দাবী আছে। তা নাহলে এমনিতে সেখানকার পরিবেশ খুবই স্বাধীন ও খোলামেলা। সেখানে প্রবেশের জন্যে সবাইকে একরকমের পরীক্ষা দিতে হয়, এবং সেখানকার কর্ত্তৃপক্ষ যখন সন্তুষ্ট হন অর্থাৎ যে জীবাত্মারা সেখানে এসেছেন তারা সম্পূর্ণ আত্মসমর্পিত, তখনই আমরা তাঁদের বিশ্বাস অর্জ্জন করি। আর যখন দেখা যায় আমাদের সম্পূর্ণ শরণাগতি আছে তখন আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। তখন আমরা যা খুশী করতে পারি সেখানে।

কৃষ্ণকে লাঠিপেটা

গোলোকের এই স্বাধীনতা এতই মহান যে সেখানে কৃষ্ণের মা যশোদা বালক কৃষ্ণকে লাঠিপেটা করেন। যদি আমরা এই প্রশ্নের গভীরে যাই যে

যশোদার স্থান কোথায় তাহলে আমরা এই 'বাঁচার জন্যে মরা'র স্তরে, এই চরম আত্মনিবেদনের স্তরে পৌঁছাব। তাঁর বালকপুত্রের কপালের একবিন্দু ঘাম মুছিয়ে দেওয়ার জন্যে, মা যশোদা লক্ষকোটি বার মৃত্যু বরণ করতেও রাজী আছেন। কৃষ্ণের প্রতি তাঁর স্নেহ এতই গভীর যে তাঁর সন্তানের কপালে একবিন্দু পরিশ্রমের ঘাম দেখার আগে তিনি কোটিবার মরতেও প্রস্তুত আছেন। আর এই বাৎসল্যের চেতনাই তাঁর সব কাজের পিছনে আছে। তাঁর এই ভালবাসার জন্যেই তাঁকে এতখানি স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে যে তিনি শ্রীভগবানকে লাঠিপেটাও করতে পারেন। শ্রীভগবানের লীলা হল এমনিই।

যদি আমাদের শ্রীভগবানের অনন্ত উদারতা ও গভীরতার কোন ধারণা থাকে তাহলে এখানকার কোনকিছুকে আমরা কি করে মূল্য দিতে পারি? আমাদের পরিমাপে হিমালয় খুব বিরাট হতে পারে, কিন্তু অনন্তের পরিমাপে তা এতই ক্ষুদ্র যে তাকে দেখাও যায় না। এ জগতের সবকিছুই আপেক্ষিক। এ জগতের কোন ঘটনায় আমরা যেন কখনই প্রভাবিত না হই বা ভয়ে জড়সড় না হই। **সত্যকে লক্ষ্য করে আমাদের যে যাত্রা তাতে যেন আমরা সর্ব্বদাই এগিয়ে যাই। যে কোন সময়, যে কোন জায়গায় আমরা বিফলকাম হতে পারি, আমাদের পতন হতে পারে কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। তাই হয়ত আমাদের প্রভুর ইচ্ছা। তবুও আমাদের তাঁর কৃপা পাওয়ার জন্যে, তাঁর আশীর্ব্বাদ পাওয়ার জন্যে চেষ্টা করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই।**

এই হল আমাদের স্বাভাবিক অবস্থা। প্রকৃতিগত ভাবেও শ্রীভগবানকে ছাড়া আমাদের বেঁচে থাকার কোন সম্ভাবনা নেই। যদি অজ্ঞানতা বশতঃ কোনসময় আমরা ভাবি তাঁকে ছাড়া বেঁচে থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব তবে সেটা কেবল সাময়িক পাগলামী মাত্র। সেরকমই চেষ্টা করা মানে আমাদের জীবনে আরও ঝঞ্ঝাট ডেকে আনা, আরও অজ্ঞতার আবরণে ঢেকে যাওয়া।

যখন অজ্ঞতার মধ্যে আছি তখন আমরা অনেক কিছু নিয়েই মাথা ঘামাব যার মূল্য নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানকার সবকিছুই একটা

নাটকের মত ; কত বিভিন্ন দল সেই নাটকে অভিনয় করছে—কেউ নিশ্চয়ই জিতবে, কেউ নিশ্চয়ই হারবে—কিন্তু আমাদের বলা হয়েছে এই হারজিতকে আমরা যেন এক অভিনেতা বা অভিনেত্রীর মেজাজে নিই। **এই সবকিছুই কৃষ্ণেরই নাটক। তিনি তাঁর লীলায় অভিনয় করছেন। যখন আমরা মনে করি কোন কিছুতে আমাদের বিরাট লাভ বা ক্ষতি হল, তখন আমরা আমাদের প্রভুর এই লীলাটা দেখি না। তখন আমরা এই চিন্ময় তরঙ্গের বাইরে রয়েছি, এই লীলার ঐকতানের সঙ্গে আমরা সুর মেলাইনি। তখন এমন মনে হবে যে যা বাস্তব তা যেন তাঁর লীলা নয় এবং আমরা নিজেদের অস্তিত্বের অন্য কোন কারণ দেখব, অন্য অনেক জিনিসে আমাদের নজর যাবে, অনেক আপেক্ষিক স্বার্থের কথা চিন্তা করব, এবং লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয় এইরকম নানা ভুলভ্রান্তির সম্মুখীন হবো। কিন্তু সবকিছুই শ্রীভগবানের লীলা এবং সেই লীলা হল নির্গুণ, দোষরহিত। সেই চিন্ময় স্তরে সবকিছুই ঠিক। সবকিছুই সেখানে নিখুঁত, পরিপূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। সেই গতিশীলতার প্রতিপদক্ষেপই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, সর্ব্বোত্তম।**

ব্রাহ্মণের অভিশাপ

একদা, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পরে উতঙ্ক নামে এক ব্রাহ্মণ কৃষ্ণের কাছে এসে বললেন, "কৃষ্ণ আমি তোমাকে অভিশাপ দেবো।" কৃষ্ণ বললেন, "হে ব্রাহ্মণ, আপনি কেন আমাকে অভিশাপ দিতে চান?" উতঙ্ক বললেন, "কারণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের এই সর্ব্বনাশের জন্য তুমিই দায়ী। তোমারই জন্যে আজ এত বিধবারা ও অনাথ শিশুরা হাহাকার করে কাঁদছে।"

কৃষ্ণ তার উত্তরে বললেন, "হে ব্রাহ্মণ আপনি হয়ত সত্ত্বগুণ সম্পন্ন তপস্যার বলে কিছু শক্তি বা পূণ্য সঞ্চয় করেছেন। কিন্তু আমাকে অভিশাপ দিলে আপনার সব পূণ্য ক্ষয় হয়ে যাবে। আমাকে অভিশাপ দিলে আমার কোনই ক্ষতি হবে না এবং আমার কিছুই এসে যাবে না, কারণ আমি তো নির্গুণ স্তরে রয়েছি।" এইরকম হল নির্গুণ স্তরের প্রকৃতি। তা হল অহৈতুকী ও অপ্রতিহত। তার কোন কারণ নেই, আর তাকে থামানোও যাবে না,

কোন কিছুতেই সে বাধাপ্রাপ্ত হয় না। সবচেয়ে যে মৌলিক স্তর, তার তরঙ্গই হল ভক্তি, যেখানে সবকিছুই কেন্দ্রের মধুর ইচ্ছা, মধুর লীলার প্রতি ধাবিত হয়—যে কেন্দ্র হল নির্গুণ। এই নির্গুণ কেন্দ্রের চিন্ময় তরঙ্গ হল 'অহৈতুকী ও অপ্রতিহত'। সেই স্তরেই আমাদের নিজেদের ভূমিকা খুঁজে নিতে হবে। ভক্তি হল নির্গুণ। তা জড়প্রকৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয় না এবং তা হল অহৈতুকী। সেই চিন্ময় তরঙ্গ নিত্যকাল প্রভাবিত হচ্ছে। ভক্তি হল অপ্রতিহত, কারোরই ক্ষমতা নেই তাকে রোধ করার।

এই হল ভক্তিতরঙ্গের প্রকৃতি। যে কেউ সেই চিন্ময় তরঙ্গের ঐকতানের মধ্যে নিজেকে মিলিয়ে দেবেন তিনিই এই তত্ত্বকে আবিস্কার করবেন যে এই ভক্তিতরঙ্গকে কেউ রোধ করতে পারে না, এর বিরোধিতা করে কেউ সফল হতে পারে না। শ্রীমদভাগবতমে ভক্তির প্রকৃতিকে এইভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।।

(শ্রীমদভাগবতম ১/২/৬)

অর্থাৎ—"জীবের তাই পর ধর্ম্ম যা অনুষ্ঠান করলে অধোক্ষজ ভগবানে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি উদয় হয়। সেই ভক্তিতেই আত্মা সুপ্রসন্ন হয়।"

ভক্তিই হল জীবের সর্বোচ্চ কর্ত্তব্য (পর ধর্ম্ম)। এখানে আমদের যা কিছু কর্ত্তব্য তার উৎস যেন অবশ্যই সেই ভক্তির স্তরে থাকে। সেই ভক্তির তরঙ্গকে যেন আমরা চিনে নিতে পারি, তাকে যেন ধরে নিতে পারি, যেন তার সৎব্যবহার করতে পারি। সেই স্রোতধারার তরঙ্গের তালে যেন আমরা নৃত্য করতে পারি। প্রত্যেকের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য হল সেই অদৃশ্য অধরা কারণশক্তির কাছে সম্পূর্ণ শরণাগত হওয়া, যে শক্তির কোন হেতু নেই, যা যুক্তিতর্কের বাইরে। তা হল স্বতঃস্ফূর্ত্ত, নিত্য এবং এখানকার কোন শক্তি তাকে কখনও রোধ করতে পারবে না।

তখনই আমাদের আত্মা পরম সন্তোষ লাভ করবে। সত্যিকারের সন্তোষ আমরা কেবল তখনই পাব যখন আমরা এই আদি ও মৌলিক সুসঙ্গতির

তরঙ্গের সংস্পর্শে আসব। তখনই আমরা সর্বোচ্চ আনন্দকে অনুভব করব। তাই হল ভক্তি।

জীবনের এই মহান তত্ত্বের সংস্পর্শে আসার জন্য যত বাধাই আমাদের অতিক্রম করতে হোক না কেন সেইসব লাভক্ষতি, জয়-পরাজয় খুবই সামান্য। সত্যের দিকে যাত্রার পথে তারা যেন আমাদের বিক্ষুব্ধ না করে।

ভগবদ্-গীতা

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছেন,

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ২/৪৭)

অর্থাৎ "স্বধর্ম বিহিত কর্ম্মেই তোমার অধিকার, কিন্তু কোন কর্ম্মফলে তোমার অধিকার নেই। তুমি কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী হয়ে কর্ম্ম কোর না। তাই বলে যেন স্বধর্ম্ম অকরণেও তোমার আসক্তি না হয়।"

সুতরাং কৃষ্ণ এখানে বলছেন "তোমার কর্ত্তব্য সম্পাদনেই তুমি সম্পূর্ণ মনোযোগ দাও। তার ফলের দিকে মন দিও না। ফলের কর্ত্তা হলাম আমি, সে দায়িত্ব আমারই।" উচ্চস্তরের বিবেচনা এইরকম। যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাপতিরা বলেন, "এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। তোমাদের এগিয়ে যেতেই হবে। তোমরা আমার সৈন্য, আমি যা বলব তোমাদের তা অবশ্যই করতে হবে। এমনও হতে পারে যে তোমাদের মৃত্যু হবে আর আমাদের জয়লাভ তার পরে হবে, সে চিন্তা তোমাদের নয়। তোমরা সৈন্য, তোমাদের মধ্যে অনেকেই শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু মাতৃভূমি শেষপর্য্যন্ত লাভবান হবে।" এইভাবে বহু মূল্যবান জীবনের বলিদান হতে পারে।

আর যখন আমরা সৈন্য তখন আমাদের কোন অধিকার নেই শেষপর্য্যন্ত আমরা হারব না জিতব এই হিসেবনিকেশ করার। দুটি বিষয়ে আমাদের খুব সাবধান হতে হবে। আমরা যেন এমন চিন্তা না করি যে যদি আমাদের শ্রমের ফল আমরা না পাই, তবে আমাদের কাজ করার কোন কারণ নেই। সেই একইসঙ্গে আমাদের এটাও চিন্তা করা উচিত নয় যে এই ফলে আমাদের

কোন অধিকার আছে। এই কথা স্মরণ রেখে কৃষ্ণের প্রতি আমাদের সেবাকর্ত্তব্য চালিয়ে যাওয়া উচিত। এই হল ভক্তি এবং এই হল ভগবতগীতার অর্থ।

ভগবতগীতা বলছেন, "তুমি তোমার পারিপার্শ্বিক জগতকে পালটাতে পারো না। যদি তুমি শান্তি চাও তবে তোমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝে তোমার নিজেকেই নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।" ভগবতগীতার সারাংশ এখানেই পাওয়া যায়, "তোমার পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে তুমি নিজেকে খাপ খাইয়ে নাও, কারণ তুমি তোমার পারিপার্শ্বিক জগতের কর্ত্তা নও। তোমার সমস্ত শক্তি তুমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দাও, বাইরের জাগতকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে নয়।" আধ্যাত্মিক জীবনের সাফল্যের এই হল চাবিকাঠি।

ভক্তি পারিপার্শ্বিক জগতের উপর বা অপরের সঙ্গে লেনদেনের উপর নির্ভর করে না। তা হল অহৈতুকী অপ্রতিহত। আমাদের নিজের অহঙ্কার ছাড়া আর কিছুই এই স্রোতের ধারাকে রুদ্ধ করতে পারে না। সুতরাং আমিই আমার সবচেয়ে বড় শত্রু।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।।

(শ্রীমদভগবতগীতা ৬/৫)

অর্থাৎ "বিষয়ে অনাসক্ত মন দ্বারা জীবাত্মাকে সংসারকূপ থেকে উদ্ধার করবে, কখনও বিষয়াসক্ত মন দ্বারা জীবাত্মাকে সংসারে পতিত করবে না। যেহেতু মনই জীবের বন্ধু এবং অবস্থাভেদে আবার সেই মনই শত্রু হয়ে থাকে।" সুতরাং আমরাই আমাদের আত্মাকে উদ্ধার করতে পারি অথবা তাকে পতিত করতে পারি। আমরাই আমাদের সবচেয়ে ভাল বন্ধু অথবা সবচেয়ে ভীষণ শত্রু। যদি আমাদের ভিতরে আন্তরিকতা থাকে তবে বাইরের কোন শক্তি আমাদের বাধা দিতে পারবে না। যাঁরা আধ্যাত্মিক জীবনে সদ্য প্রবেশ করেছেন তাঁদের আত্মিক অনুশীলনের জন্যে একটা যথার্থ পরিবেশ অবশ্যই প্রয়োজন, কিন্তু তাও নির্ভর করে তাঁদের আন্তরিকতার পরিমাণের উপরে অথবা তাঁদের সুকৃতির উপরে। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং আশ্বাস দিয়েছেন, "হে বৎস! শুভ-কর্ম্মঅনুষ্ঠানকারী কোন ব্যক্তিই

দুর্গতিপ্রাপ্ত হন না” (ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি)। কৃষ্ণ বলছেন “কোন অসুবিধাকর পরিস্থিতি এলে আমি স্বয়ং তোমার দেখাশোনা করব। আমি সর্ব্বজ্ঞ এবং আমি সর্ব্বশক্তিমানও বটে। সুতরাং কেউ যদি আমার প্রতি আকৃষ্ট হয় তবে আমি নিশ্চয়ই তার দেখাশোনা করব।” ইতিহাসেও তাই দেখা গেছে—ধ্রুব, প্রহ্লাদ এবং আরও অনেকের ক্ষেত্রে। এমনকি বাধাবিঘ্নও আমাদের অবস্থার উন্নতিই করতে পারে যদি আমরা তাদের ঠিকভাবে নিই। এই উচ্চতর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যাবে যে সবকিছুই আমাদের সাহায্য করার জন্যই আসছে।

শ্রীমদভাগবতমের উপদেশ

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষ্যমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তি পদে স দায়ভাক্।।

(শ্রীমদভাগবতম ১০/১৪/৮)

অর্থাৎ, ‘অতএব যিনি অনাসক্তভাবে আত্মকৃত কর্মফল ভোগ করতে করতে আপনার করুণার প্রতীক্ষায় কায়মনোবাক্যে প্রণতি সহকারে জীবন ধারণ করেন তিনিই মুক্তিপদে দায়ভাগী অর্থাৎ অধিকারী হয়ে থাকেন।”

শ্রীমদভাগবতম এখানে আমাদের জীবনের সর্ব্বস্তরের জন্যে এক পরম আশাপ্রদ উপদেশ দিয়েছেন : “তুমি কেবল নিজেকেই দোষ দিও, আর কাউকে নয়। সবকিছুর মধ্যেই শ্রীভগবানেরই কৃপা দেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যেন তোমার বজায় থাকে।” বর্ত্তমানে আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিককে অবাঞ্ছিত মনে করছি, কারণ তা আমাদের বর্ত্তমান রুচি বা ইচ্ছার অনুকূল নয়। কিন্তু ওষুধ সবসময় রোগীর কাছে রুচিকর না হতে পারে। তবুও তা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী। শাস্ত্রে যেসব উপদেশ দিয়েছেন তার মধ্যে এই শ্লোকটির মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আত্মনিয়ন্ত্রণের উপদেশ আছে। যদি এই নিয়ম আমরা অনুসরণ করতে পারি তবে শীঘ্রই আমাদের অবস্থা খুব ভাল হবে। আমাদের খুব সাবধান হতে হবে যে পারিপার্শ্বিককে যেন আমরা দোষ না দিই, বরং সবকিছুর পিছনেই কৃষ্ণ আছেন একথা

যেন শ্রদ্ধার সঙ্গে মনে রাখি। আমরা যেন মনে রাখি ‘কৃষ্ণই আমার প্রিয়তম, ঘনিষ্ঠতম, শ্রেষ্ঠ বন্ধু, সবকিছুর পিছনে তিনিই আছেন। তাঁর সদাজাগ্রত, সতর্ক চক্ষুর সামনেই সবকিছু ঘটছে, সুতরাং কোনকিছুর মধ্যেই কোন দোষ, কোন খুঁত বা ঘাটতি থাকতে পারে না।”

এমনকি শ্রীমতী রাধারাণীও বলেন, “তাঁকে কোন দোষ দেওয়া যায় না। কৃষ্ণের সঙ্গে আমার যে এই দীর্ঘ বিরহ সেও আমারই ভাগ্যের ফেরে হয়েছে। এরজন্যে তাঁকে কোন দোষ দেওয়া যায় না।” যদিও বাইরে থেকে দেখলে সকলেই একথা স্বীকার করেন যে তিনি নিষ্ঠুরভাবে গোপীদের ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন, তবু রাধারাণী কৃষ্ণকে দোষ দিতে প্রস্তুত নন। রাধারাণী মনে করেন ‘কৃষ্ণের মধ্যে কোন দোষাভাস নেই। আমারই মধ্যে নিশ্চয়ই কোন দোষ আছে যার জন্যে এই দুর্ভাগ্যময় পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছি।’ কৃষ্ণের সেবার জন্যে গোপীদের বিভিন্নদলের মধ্যে যে প্রতিযোগিতা তার মধ্যে রাধারাণী এইভাবে সুসঙ্গতি খুঁজে পান।

এই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্বকে শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে এমন নয় যে রাধারাণী পছন্দ করেন না যে অন্য কোন গোপীর দল তাঁর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে কৃষ্ণের সেবা করুক। কিন্তু তিনি জানেন কৃষ্ণকে তিনি যেমন সন্তুষ্ট করতে পারেন তারা তা পারে না। এই তত্ত্বের প্রতি আমাদের বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। শ্রীমতী রাধারাণী জানেন যে তারা কৃষ্ণকে যথাযথ সন্তোষ দিতে পারবে না তাই তারা তাঁর জায়গাটা নিক এটা তিনি পছন্দ করেন না। এই তাঁর যুক্তি। তিনি মনে করেন ‘তারা যদি কৃষ্ণকে পরিপূর্ণভাবে সেবা করতে পারত, তাঁকে সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট করতে পারত তবে আমার কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু তা তো পারে না। তবুও তারা জোর করে সেবা করতে আসবে? এ আমি সহ্য করতে পারি না।”

কুষ্ঠরোগী ব্রাহ্মণ

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী পুরাণের ঐতিহাসিক কাহিনী থেকে এই ধরণের ভক্তির এক নিদর্শন দিয়েছেন। একদা এক সতী স্ত্রী ছিলেন যাঁর ব্রাহ্মণ স্বামী কুষ্ঠরোগী ছিলেন। সেই সতী স্ত্রী সর্ব্বদাই তাঁর স্বামীর সেবা করার

জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতেন। একদিন যখন তিনি তাঁর স্বামীকে কোন পুণ্যতোয়া নদীতে স্নান করাচ্ছিলেন সেইসময় তার স্বামী 'লক্ষহীরা' নামে এক বেশ্যার অসামান্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এই বেশ্যার সৌন্দর্য্যের দ্যুতি লক্ষহীরার মত ছিল বলেই তার নাম ছিল 'লক্ষহীরা'। কুষ্ঠরোগী ব্রাহ্মণ লক্ষহীরার দুর্নিবর্বার সৌন্দর্য্যে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেলেন।

বাড়ী ফিরে তাঁর স্ত্রী তাঁর মধ্যে এক অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করে বললেন, "তোমাকে এত অসুখী মনে হচ্ছে কেন?" তার স্বামী বললেন "আমি ঐ বেশ্যার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়েছি। তাকে আমি মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না।"

"ও, তুমি তাকে চাও?"

"হ্যাঁ, আমি তাকে চাই।"

"তাহলে আমি তার ব্যবস্থা করব।"

তখন সেই ব্রাহ্মণের স্ত্রী যেহেতু গরীব ছিলেন, তাই যদিও তিনি সদ্‌গুণসম্পন্না ব্রাহ্মণী ছিলেন তবুও তিনি প্রতিদিন সেই বেশ্যার বাড়ীতে গিয়ে ঝিএর কাজ করতে শুরু করলেন। তিনি তাঁর কাজকর্ম্ম এত পরিশ্রমের সঙ্গে নিখুঁতভাবে করতেন যে কিছুদিনের মধ্যেই বাড়ীর কর্ত্রী, বেশ্যার মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হল। তখন বেশ্যা খোঁজখবর নিতে শুরু করল, "কে এখানে রোজ সবকিছু এত সুন্দর ও পরিপাটি করে পরিষ্কার করে?" তখন সে জানতে পারল যে এক ব্রাহ্মণ মহিলা রোজ সকালে এসে এইরকম ঝি এর কাজ করে যান। অন্য দাসদাসীরা বলল "আমরা অনেক চেষ্টা করেছিলাম ওঁকে থামাবার, কিন্তু তিনি কোন কথা শোনেন না। তিনি তোমার সঙ্গে দেখা করতে চান।"

তাই শুনে তাদের কর্ত্রী বলল, "ঠিক আছে, কাল সকালে তোমরা তাকে আমার কাছে নিয়ে আসতে পার।" তখন পরের দিন সকালে যখন ব্রাহ্মণ মহিলাকে বেশ্যার কাছে আনা হল তখন তিনি বেশ্যাকে তার ভিতরের উদ্দেশ্য জানালেন। "আমার স্বামী তোমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে তাই আমার ইচ্ছে তুমি তাকে সন্তুষ্ট করো। তার সতী স্ত্রী হিসেবে আমার চিন্তা হল কি করে তাঁর ইচ্ছাপূরণ করে তাঁকে সন্তুষ্ট করা যায় আর তোমার

সঙ্গে মিলনই হল তাঁর ব্যাকুল বাসনা।" তখন সেই বেশ্যা সব বুঝতে পেরে বলল, "ঠিক আছে তবে কাল তাঁকে এখানে নিয়ে এসো। আমি তোমাদের দুজনকেই কাল এখানে নিমন্ত্রণ করছি।"

ব্রাহ্মণকে একথা জানানো হলে পরের দিন তাঁরা দুজনেই বেশ্যার বাড়ীতে এলেন। উপলক্ষ্য অনুযায়ী বহু রান্না হয়েছিল সেদিন। দুরকমের রান্না পরিবেশন করা হয়েছিল। কলাপাতায় প্রসাদ দেওয়া হয়েছিল, বিবিধ ব্যঞ্জন, অন্ন, পরমান্ন, মিষ্টি ইত্যাদি, তার সঙ্গে মাটির খুড়িতে গঙ্গাজল—সবই শুদ্ধ নিরামিষ আহার। আবার পাশাপাশি সোনারূপার পাত্রে অনেক রকমের মাংস ইত্যাদি প্রচুর মশলাদার রান্নাও ছিল। সেইসব খাদ্য খুবই সুন্দর আসবারের উপর সাজানো হয়েছিল, সেখানে বসার ব্যবস্থাও অতি উত্তম। একদিকের ব্যবস্থা ছিল খুব শুদ্ধ ও সাত্ত্বিক। অন্যদিকের ব্যবস্থা ছিল খুব জাঁকালো ও রাজসিক। তখন সেই বেশ্যা হাতজোড় করে সেখানে ব্রাহ্মণ ও তাঁর স্ত্রীকে আমন্ত্রণ করে এনে বলল, "দেখুন আজ এই দুইরকমের রান্না এখানে পরিবেশন করেছি। এদিকে হল ভগবৎ-প্রসাদ আর ওদিকে ওইসব রাজসিক রান্না মাংস ইত্যাদি দিয়ে তৈরী। এখন আপনাদের যা ভাল লাগে আপনারা তাই খান।"

সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ সেই দুরকম রান্নার মধ্যে থেকে ভগবৎপ্রসাদ বেছে নিয়ে আহার শুরু করলেন। তাঁর আহার সমাপ্ত হলে লক্ষহীরা তাকে বলল, "দেখুন আপনার স্ত্রী হলেন এই ভগবৎ প্রসাদের মত—শুদ্ধ ও সাত্ত্বিক। আর আমি হলাম এইসব রাজসিক রান্নার মত, এইসব মাংস, মশলাদার রান্না, সোনারূপো—আমি হলাম এসবের মত। কিন্তু আপনার স্বাভাবিক রুচি দেখছি সাত্ত্বিক প্রসাদের প্রতি। মাংস বাইরে থেকে দেখতে লোভনীয় মনে হতে পারে, কিন্তু ভিতরে তা অত্যন্ত জঘন্য নোংরা জিনিস। আর তাই আপনি তাকে ঘৃণা করেন। তবে আমার কাছে আপনি কেন এসেছেন?"

তখন ব্রাহ্মণ তার চেতনা ফিরে পেলেন। তিনি লক্ষহীরাকে বললেন, "হ্যাঁ আমি ভুল করেছি। ভগবান তোমার মধ্যে দিয়ে আমাকে তাঁর নির্দেশ পাঠিয়েছেন। আমার চপল বাসনা শেষ হয়ে গেছে আর আমি তৃপ্ত ও সন্তুষ্ট হয়েছি। তুমি আমার গুরু।"

শ্রীল শ্রীকবিরাজ গোস্বামী এই সুন্দর কাহিনী উদ্ধৃত করেছেন শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে। সেই সাধ্বী স্ত্রী বেশ্যার সেবা করতে গিয়েছিলেন। কেন? তার স্বামীর সন্তুষ্টির জন্যে। সেইরকম শ্রীমতী রাধারাণী বলেন, "যারা আমার বিরুদ্ধ দলে আছে আমি তাদের সেবা করতে প্রস্তুত আছি যদি তারা আমার প্রভুকে সত্যিই সন্তুষ্ট করতে পারে। কিন্তু তা তারা পারে না। তবুও তারা কিছু দাবী করে। কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে একমত নই। এমন নয় যে আমি ভাবছি আমার ভাগে কিছু কম পড়বে। সেরকম মনোভাব আমার নয়। যদি কোন প্রতিকূল অবস্থা আসে তবে আমি মনে করি তা আমারই ভিতর থেকে আসছে ('সে আমার দুর্দৈব-বিলাস')। আমার বাইরে কোন দোষত্রুটি আমি খুঁজে পাই না।"

কৃষ্ণের যিনি প্রকৃত ভক্ত তাঁর মনোভাবও এইরকমই হওয়া উচিত। এইরকম মনোভাব নিয়ে আমরা আমাদের অন্তরের মধ্যে দেখতে পাব যে চরমে সবকিছুই সেই পরম মঙ্গলময়েরই অংশ। যদিও এরকম চিন্তা সহজ নয়, তবুও আমাদের সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করে বাহ্যিক জগতের শুভেচ্ছা, শুভ মনোভাব সংগ্রহ করা উচিত। এইভাবে আমাদের এ বিষয়ে যত্ন নেওয়া উচিত যে আমরা যেন এমন দৃষ্টিতে সবকিছু দেখি যাতে আমাদের নিজেদের অবস্থাই পরিশুদ্ধ হয়।

গভীর দৃষ্টিকোণের সত্য

সুতরাং শ্রীমদভাগবতম আমাদের গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার জন্যে, আরও গভীরে দেখার জন্যে প্রেরণা দিয়েছেন। আমাদের নিশ্চয়ই আরও গভীরে দৃষ্টি দিতে হবে, তবেই আমরা আমাদের বন্ধুকে, সুহৃদকে খুঁজে পাবো। যদি পারিপার্শ্বিকের প্রতি আমাদের উদার মনোভাব থাকে, তবে আমরা নিশ্চয়ই সেই স্তরের সংস্পর্শে আসব যেখানে সত্যিকারের ঔদার্য্য আছে। তাই হল কৃষ্ণভাবনামৃতের চরম গন্তব্য। যদি আমরা এই ধরণের দর্শন বা দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তব সত্যের গভীরে দৃষ্টি হানি তবেই আমরা আমাদের আপন ঘর খুঁজে পাবো। প্রহ্লাদ সাহসের সঙ্গে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তিনি জয়ী হয়েছিলেন।

প্রহ্লাদের অসুর পিতা তাঁর পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে যে বিচার বা পরিকল্পনা করেছিলেন, তা সবই ভুল প্রমাণিত হল। কিন্তু প্রহ্লাদ তাঁর গভীর দৃষ্টিকোণ থেকে বাস্তবকে সঠিকভাবে দেখেছিলেন।

তিনি কৃষ্ণকে সর্ব্বত্র দেখেছিলেন। কৃষ্ণভাবনামৃতই সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তাই কোন অবস্থা তা আপাতদৃষ্টিতে যতই ভয়ানক মনে হোক না কেন—তাতে আমাদের নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়। কৃষ্ণ সেখানে আছেন। কোন অবস্থাকে যতটা প্রতিকূল বলে মনে হয়, বাস্তবে তা নয়। যদি আমরা যথার্থ দৃষ্টিভঙ্গীকে বিকশিত করতে পারি তাহলে আমাদের প্রভুর সুস্মিত চন্দ্রবদন পর্দ্দার পিছন থেকে উকি মারবে। এই হল কৃষ্ণভাবনামৃত। কৃষ্ণ হলেন পরমসুন্দর আর তিনি সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন আমাদের সেবা গ্রহণ করার জন্যে।

শ্রীভগবান ও তাঁর নিজজন

আমাদের ভিতরের ঐশ্বর্য কেবল সাধু, গুরু ও শাস্ত্রের সাহায্যেই আবিস্কৃত হবে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী যেন এমন হয় যে আমরা মনে করি, সর্ব্বত্রই অমৃত আছে, কিন্তু আমরা এই অমৃত আর আমাদের মাঝখানে এক পর্দ্দা টেনে দিয়েছি। অমৃত ফেলে আমরা বিষপান করছি এই ভেবে যে এ আমাদের বড় দরকারী। কিন্তু **শেষপর্য্যন্ত আমাদের এই চিন্তা করা উচিত যে অন্যকে দোষ দেওয়ার কিছু নেই এবং এটাই প্রকৃত সত্য। আমাদের দুর্দ্দশার জন্যে, পতনের জন্যে আমরাই দায়ী। আবার আত্ম-উন্নতির পথও সেই একইরকমের, আমাদের আত্ম-সমালোচনা শিখতে হবে আর পারিপার্শ্বিককে শ্রদ্ধা করতে হবে, তার মূল্য বুঝতে হবে। বিশেষ করে কৃষ্ণ এবং তাঁর ভক্তদের জন্য আমাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকতে হবে। আমাদের ক্ষতি করার কর্ত্তৃত্ব তিনি কাউকে দেননি। যদি আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয় তবে তা এক অগভীর ও ভ্রান্ত ধারণা। কেউ কারোর ক্ষতি করতে পারে এই ধারণাটাই ভুল। এক অগভীর ও বাহ্যিক স্তরেই একথা সত্যি হতে পারে। তার মানে অবশ্যই এই নয় যে অপরের ক্ষতি করাকে সমর্থন করা যেতে পারে বা অত্যাচারকে অগ্রাহ্য**

করা যেতে পারে, কিন্তু অনন্তের দৃষ্টিকোণ থেকে, নিত্য শ্বাশ্বত জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যায় যে কোন কিছুতেই কোন ক্ষতি হয় না। যখন আমরা ভক্তির সর্ব্বোচ্চ স্তরে পৌঁছব তখন আমরা দেখতে পাব যে সবকিছুই বন্ধুভাবাপন্ন ও শুভাকাঙ্ক্ষী, আর আমাদের আশঙ্কা ভুল ছিল। সে কেবল একটা ভুল ধারণা ছাড়া কিছুই না।

ভ্রান্ত ধারণার অর্থ 'মায়া' আর মায়ার অর্থ হল 'যাকে মেপে নেওয়া যায়' (মৃয়তে অনয়া)। **যখন সবকিছু এক ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার দৃষ্টিকোণ থেকে মাপা হয়, নিখিলবিশ্বের মঙ্গলচিন্তার দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, তখনই আমাদের সব সমস্যা সব দুঃখদুর্দ্দশার কারণ ঘটে।** ক্রমশঃ আমাদের এই উপলব্ধি যেন অবশ্যই হয় যে 'আমার দৃষ্টিকোণ স্বার্থপরতার দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল, তার মধ্যে পরিপূর্ণতার ধারণা ছিল না। তাই আমি কষ্ট পাচ্ছি। কিন্তু ক্রমশ আমি বুঝতে পারছি যে নিখিল বিশ্বের মঙ্গলচিন্তার মধ্যে আমার স্বার্থও অন্তর্ভুক্ত আছে।"

এক পুরনো প্রবাদে বলা হয়েছে "নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা।" আমাদের কর্ম্ম অনুযায়ী আমরা আমাদের পারিপার্শ্বিক জগতকে তৈরী করি। যখন আমরা খাবার খাই তখন তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিষ্ঠা তৈরী হয়। বিষ্ঠা আসে বলে তাকে দোষ দেওয়া মূর্খতা। আমার খাওয়ার ফলেই সে আসে। ঠিক সেই একইভাবে আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্ম্ম করেছিলাম আর তারই ফলে আমার বর্ত্তমান বাতাবরণ তৈরী হয়েছে। তাই নিজেদের ভুলের প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে কলহ করা শুধু অনর্থক পন্ডশ্রম।

শ্রীমদভাগবতমের উপদেশই যেন সর্ব্বক্ষেত্রে আমাদের পথপ্রদর্শনকারী নীতি বা আদর্শ হয়। যা কিছু আমাদের জীবনে আসছে সবকিছু তাঁর অনুমোদনেই হচ্ছে। তাঁর চোখের সামনেই হচ্ছে সুতরাং তা ভাল ছাড়া কখনও খারাপ হতে পারে না। সবকিছুই উত্তম। যা কিছু খুঁত, যা কিছু ঘাটতি তা আমাদেরই ভিতরে। তাই আমাদের সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে সর্ব্বশক্তি দিয়ে শুধু নিজেদের কর্ত্তব্য করার। দেখতে দেখতে আমরা দেখব যে আমাদের সব কষ্টের অবসান হয়েছে। শ্রীমদভাগবতমের এই হল মূল উপদেশ।

আমাদের অভিভাবকের সদাজাগ্রত চক্ষু

পারিপার্শ্বিক জগত মৃত নয়, সেখানে একজন তত্ত্বাবধায়ক আছেন। সূর্য যখন আমাদের মাথার উপরে আছে, সেইরকম আমাদের প্রত্যেকটি কর্ম্মের উপর আমাদের অভিভাবকের দৃষ্টি রয়েছে। সবকিছুই তাঁর সদাজাগ্রত চক্ষুর সামনেই ঘটছে। এ বিষয়ে ঋগ্বেদে একটি উপমা দেওয়া হয়েছে—ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়োঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্। অর্থাৎ "আকাশে সর্বতো বিচারী যে চক্ষু যেরূপ দৃষ্টি করেন, বিদ্বানেরা বিষ্ণুর পরমপদে সেইরূপ সর্ব্বদাই দৃষ্টি করেন।" যে কোন কর্ত্তব্য যেন আমরা এই চিন্তা করে শুরু করি "আমার অভিভাবকের (শ্রীভগবানের চক্ষু সর্ব্বদাই প্রহরীর মত আমাকে লক্ষ্য করছেন, আমি যা কিছু করছি আর আমার জীবনে যা কিছু ঘটছে সবই তিনি দেখছেন। আমার পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে আমাকে কোন চিন্তা করতে হবে না।"

তাই শ্রীমদভাগবতম বলেছেন "পারিপার্শ্বিক জগত সম্বন্ধে তুমি কোন দুশ্চিন্তা কোর না। তুমি তোমার কর্ত্তব্য কর। যে কাজ তুমি করছ তাতেই তোমার সম্পূর্ণ মনোযোগ দাও। তারপর দেখবে যে দেখতে দেখতে অহংকারের অন্ধকারময় কালো পেঁটরা থেকে মুক্তি পাবে এবং নৃত্যগীতসংকীর্ত্তনের আনন্দোৎসবের বিশ্ব তরঙ্গে তুমি যোগদান করতে পারবে। শ্রীভগবানের লীলার মধ্যে তুমি প্রবেশ করতে পারবে।"

সকলেই আমরা পৃথক স্বার্থ, সংঘাত ও প্রতিক্রিয়া, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, সম্পদ ও বিপদ এইসব ঘাতপ্রতিঘাত থেকে কষ্ট পাচ্ছি। কিন্তু চিন্ময় জগতে সবকিছুই চেতন সম্পন্ন এবং আনন্দে পরিপূর্ণ। সুতরাং আমাদের যে শুধু আত্মবিস্মৃতি প্রয়োজন শুধু তাই নয়, পরন্তু শ্রীভগবানের সম্পূর্ণ শুভেচ্ছাকে আমন্ত্রণ করে আনতে হবে। সেই হল বৃন্দাবন।

আমাদের অভিভাবকরা বলবেন, 'এই কর' আর আমাদের ক্ষমতা অনুযায়ী আমাদের তাঁদের আজ্ঞা পালন করতে হবে। আর তাঁরা যা বলছেন তা কৃষ্ণের কাছ থেকেই আসছে এই ধারণা গ্রহণ করে যতই আমরা তাঁদের উপদেশ অনুসরণ করব ততই আমরা নিজেদের মঙ্গল আহরণ করব। শ্রীমদভাগবতম্, ভগবদ্গীতা, উপনিষদ এবং শ্রীভগবানের বহু প্রতিনিধিরা

সকলেই আমাদের সাহায্য করছেন যেখানে আমাদের প্রকৃত নিজের ঘর সেখানে যাতে ফিরে যেতে পারি। বর্ত্তমানে আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থচেতনার, অন্যাভিলাষের বিভিন্ন স্তরে জীবন কাটাচ্ছি। কিন্তু আমাদের অভিভাবকরা সকলেই চেষ্টা করছেন আমাদের শ্রীভগবানের গতিশীল লীলার উচ্চতর ভূমিতে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, যাতে আমরা কৃষ্ণলীলায় প্রবেশ করতে পারি।

শত্রু অহং ও প্রকৃত অহং

এখানে সবকিছুই সেই পরিপূর্ণ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জগতের ছায়ামাত্র। সেই অনাদি জগতে সবকিছুই আছে এবং সেখানে সবরকমের সেবা আছে কিন্তু এখানে আমরা সে জগতের এক বিকৃত ছায়া মাত্র দেখি। তবু এক বৈচিত্র্যের জগত ত্যাগ করে আমাদের উচিত নয় এক নির্ব্বাণের মধ্যে মিশে যাওয়ার চেষ্টা করা—যেখানে আমরা সুখদুঃখ কিছুই অনুভব করব না। বর্ত্তমানে আমরা আমাদের শত্রু অহং এর কর্ত্তৃত্বে বা প্রভাবে রয়েছি। আমাদের প্রকৃত অহং এর অস্তিত্ব রয়েছে আত্মার জগতে। সবরকমের অভিজ্ঞতাই সেখানে অনুভব করা যায় এবং সে সবই সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ।

কৃষ্ণভাবনামৃতের অর্থ হল পূর্ণবিকশিত ভাগবতধর্ম্ম। এর অর্থ হল এই যে যিনি অনন্ত তাঁর সঙ্গে আমরা এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করতে পারি যে সম্বন্ধ মধুর রসের সম্পর্কে উত্তীর্ণ হতে পারে। এর জন্যে যা আমাদের প্রয়োজন, যা আমাদের হাত ধরে সেইদিকে নিয়ে যাবে সে সবকিছুই আধ্যাত্মিক জগতে তাদের শুদ্ধতম ও সর্ব্বাপেক্ষা বাঞ্ছিত অবস্থায় রয়েছে। আর এখানে আমরা যা দেখছি তা কেবল ছায়ামাত্র, এক অন্ধকারময় অনুকরণ মাত্র। কিন্তু সত্য হল পূর্ণবিকশিত ভাগবতধর্ম্ম, তা হল কৃষ্ণভাবনামৃত, সেখানে যিনি অনন্ত তিনি অন্তকে, সমগ্রখণ্ডিত চেতনাকে আলিঙ্গন করেন। অনন্ত যেখানে আসেন অন্তকে পূর্ণ আলিঙ্গন করতে, তাকে স্বাগত জানাতে সেই হল বৃন্দাবনধাম। আর এই হল পূর্ণবিকশিত ভাগবতধর্ম্ম যে কৃষ্ণভাবনামৃতের মাধ্যমে সীমিত জগতের

এক তুচ্ছ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশও অনন্ত পূর্ণব্রহ্মের মধুর আনন্দময় আলিঙ্গনকে অনুভব করতে পারে। বৃন্দাবনধামে কোথাও একটি ক্ষুদ্র কোণও নেই যা এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত আছে। প্রতিটি বালুকণা, প্রতিটি ঘাসপাতাও সেখানে আপন ব্যক্তিত্বের দ্বারা নিজেকে তার সেবাময় ভূমিকায় প্রকাশ করছে। আর এখানে ক্ষুদ্র বালুকণার কথা ছেড়েই দেওয়া যাক, কোন কিছুরই কোন তাৎপর্য্য নেই। কিন্তু বৃন্দাবনে সবকিছুরই ব্যক্তিত্ব আছে, তাৎপর্য্য আছে এবং সবকিছুই সেখানে ভালবাসা পায়, আদরযত্ন পায়। কোন কিছুই সেখানে অবহেলিত নয়। এই হল পূর্ণ বিকশিত ভাগবতধর্ম্ম।

শ্রীমদভাগবতমে বলা হয়েছে,

বর্হাপীড়ং নটবরবপু: কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈঃ
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদগীতকীর্ত্তিঃ॥

(শ্রীমদ্‌ভাগবতম্ ১০/২১/৫)

অর্থাৎ "তৎকালে শ্রীকৃষ্ণ চূড়ায় শিখি পুচ্ছভূষণ, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার পুষ্প, পরিধানে কণকবর্ণ পীত বসন এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করে অধরামৃতদ্বারা বংশীছিদ্র পূরণ করতে করতে নটবরবেশে শঙ্খচক্রাদি লক্ষণযুক্ত নিজপদচিহ্নিত বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন। তখন গোপগণ তাঁর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করছিল।"

এখানে শুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে এক অপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য তথ্যের উদ্‌ঘাটন করলেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনের বনভূমিতে প্রবেশ করেন তখন তাঁর শ্রীপাদপদ্মের স্পর্শ পেয়ে সেই বনভূমি তাঁর আলিঙ্গনের আনন্দ অনুভব করে (বৃন্দারন্যং স্বপদরমণং)। "স্বপদরমণং" এর আর একটি অর্থ হল এই যে তিনি তাঁর পাদস্পর্শদ্বারা সেই বনভূমিকে মিলনের আনন্দ দেন। এ আমাদের কাছে অচিন্ত্যনীয়। শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র পাদস্পর্শ পেয়ে সেখানকার বালুকণা, সেখানকার ভূমি মাধুর্য্যরসের আনন্দ অনুভব করে। রাখালবন্ধুদের কাছে তাঁর স্তুতি শুনে শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনের

বনকাননে প্রবেশ করেন আর সেখানকার ভূমি, বৃক্ষলতা সবই তাঁর সঙ্গ পেয়ে গভীর ঘনিষ্ঠ স্পর্শানুভূতির তীব্র সুখ অনুভব করে, যা হল সর্ব্বোচ্চ ও সীমাহীন।

মাধুর্য্যরস

চিন্ময়ধাম বৃন্দাবনের মাটি, ধূলিকণাও মাধুর্য্যরসে কৃষ্ণের সঙ্গে মিলনের আনন্দ অনুভব করে। তাই শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা এমনই অপূর্ব্ব যে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও করযোড়ে তাঁকে বলেন, "হে প্রভু, হে আমার হৃদয়নাথ, আমরা আপনাকে কেমন করে বুঝব? আমার প্রভু শ্রীনারায়ণের সম্বন্ধে আমার কিছু উপলব্ধি আছে, কারণ তিনি আমার নিকটেই আছেন। তাঁর সঙ্গে আমার একটা প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে যার দ্বারা আমি আমার সেবাকর্ত্তব্য সম্পাদন করতে পারি। কিন্তু আপনি আমার জগতে এসেছেন অথচ আমি আপনাকে বুঝতে পারি না, আপনার মহিমা ধারণা করতে পারি না। এ আপনার কেমন লীলা?" কৃষ্ণের রাখালবন্ধুদের ও গরুবাছুরদের লুকিয়ে রেখে ব্রহ্মা প্রাণপণ চেষ্টা করছিলেন কৃষ্ণকে পরীক্ষা করার জন্যে। কিন্তু ব্রহ্মা আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন দেখে যে "যদিও আমি সব লুকিয়ে রেখেছি তবুও সবকিছুই আগে যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে। কৃষ্ণ এখনও তাঁর রাখালবন্ধু ও গরু-বাছুর দ্বারা পরিবৃত হয়ে আছেন ও তাঁর সুখময় লীলায় মগ্ন আছেন। সুতরাং তিনি অনন্ত। এই জড় জগতের অধিকর্ত্তা হওয়া সত্ত্বেও আমার কলাকৌশল তাঁর অধীনে যে লীলা চলছে তাতে কোন ব্যাঘাত ঘটাতে পারল না। তাঁর মধুর ইচ্ছা অনুযায়ীই তিনি তাঁর লীলা করেন। আমি তাঁকে পরীক্ষা করতে গিয়েছিলাম কিন্তু এখন আমি নিজেই তাঁর অচিন্ত্যনীয় শক্তির দ্বারা মোহিত হয়ে গেলাম। আমি বুঝতে পারিনি যে আপাতদৃষ্টিতে যদিও তাঁকে দেখে মনে হতে পারে তিনি একজন রাখালবালক কিন্তু আসলে তিনি স্বয়ং ভগবান, যিনি প্রভু শ্রীনারায়ণেরও উপরে।" তখন তিনি কৃষ্ণের কাছে তাঁর প্রার্থনা জানালেন, "এখন আমার চেতনা হয়েছে, হে ভগবান আপনি আমাকে ক্ষমা করুণ।"

আমাদের বুদ্ধির কোন অংশের কি মূল্য আছে? অনন্তকে আমরা কতটা

পরিমাপ করতে পারি? শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, "অনন্তের বিষয়ে তোমার মস্তিষ্ক প্রয়োগ কোর না। সেই জগতকে মেপে নেওয়ার ক্ষমতা এই মস্তিষ্কের নেই। যিনি অনন্ত তাঁর কাছে তোমার বুদ্ধি নাকচ হয়ে যাবে। সেই জগতকে পরিমাপ কর তোমার অনুভূতি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, আস্বাদন দিয়ে—সেখানে তোমার মস্তিষ্ক তোমার শত্রু হবে। মস্তিষ্ক দিয়ে অনন্তকে পরিমাপ করতে গেলে তুমি সর্ব্বদাই ঠকবে এবং তাতে তুমি বিভ্রান্ত ও বিক্ষুব্ধ হবে এবং তোমার অগ্রগতি থেমে যাবে।"

কেবল শ্রদ্ধাই আমাদের সাহায্য করতে পারে। তা না হলে কোন কিছুই সেই জগতে পৌঁছতে পারে না। কেবলমাত্র উন্নত বৈজ্ঞানিক কারিগরী দ্বারা আমরা সূর্যে বা চন্দ্রে পৌঁছতে পারি। তা নাহলে আমরা হাত বাড়িয়ে বা লম্বা লাঠি দিয়ে তাদের ছুঁতে পারি না। সেই একইরকমভাবে, যা সর্ব্বোচ্চ সত্য,তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতে গেলে কেবল শ্রদ্ধাই আমাদের সাহায্য করতে পারে। শ্রদ্ধা হল সবচেয়ে ব্যাপক মাধ্যম। কিন্তু তবুও যিনি সর্ব্বোচ্চ বস্তু, যিনি সর্ব্ব কারণের কারণ, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে তাও সামান্য।

আমরা অতি ক্ষুদ্র জীবাত্মা। আমাদের বিশ্বাস দিয়ে আমরা কতটুকু পরিমাপ করতে পারি? আমাদের বিশ্বাস কতটা লম্বা চওড়া? বিশ্বাস দিয়ে আমরা কি সংগ্রহ করতে পারি? আমরা যাঁকে খুঁজছি তিনি অনন্ত আর আমরা খুব ভয়ে ভয়ে আছি হয়ত এই ভেবে যে "যদি আমি বিশ্বাসের উপর নির্ভর করি, শ্রদ্ধার উপর নির্ভর করি, তাহলে হয়ত কোথাও কোন ভুল হয়ে যেতে পারে, হয়ত আমি ঠকে যাব।" কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ে কতটুকু শ্রদ্ধা-বিশ্বাসই বা আমরা ধরাতে পারি? কেবলমাত্র আকাশ বা সমুদ্রের সঙ্গে তুলনা করলে আমরা অনন্তের সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করতে পারি, কিন্তু অনন্তের তুলনায় তাই বা কি? কিছুই না।

আর অনন্তই বা কি? সেই বস্তু যাঁর মধ্যে থেকে সবকিছু আসছে, যাঁর দ্বারা সবকিছু পালিত হচ্ছে, যাঁর মধ্যে শেষপর্য্যন্ত সবকিছু প্রবেশ করছে—সেই সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বনিয়ন্ত্রক, সর্ব্বাকর্ষক, সর্ব্ব অনুভূতি সম্পন্ন পরব্রহ্ম।

সুতরাং অনন্তের সবকিছুই উত্তম আর পারিপার্শ্বিকের সম্বন্ধেও তাই সত্য। আমাদের কেবল নিজেদের সংশোধন করতে হবে, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এই হল সিদ্ধান্ত যে "নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা কর, পারিপার্শ্বিক জগতে সবকিছু ছেড়ে দিতে হবে এবং নিজেদেরও সেইভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।" তাই আমাদের জীবনে সত্যিকারের শান্তি আনবে আর আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নততর উপলব্ধি আনবে।

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীভগবানের প্রেমময় নয়নের সামনে

ঋগ্বেদের মন্ত্র হল: ওঁ তদ্বিষ্ণো: পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়: দিবীব চক্ষুরাততম্।। (ঋগ্বেদ, ১ম খন্ড, ১ মন্ডল ২০ সুক্ত)। অর্থাৎ, "আকাশে সর্বতো বিচারী যে চক্ষু যেরূপ দৃষ্টি করেন, বিদ্বানেরা বিষ্ণুর পরমপদ সেইরূপ সর্ব্বদাই দৃষ্টি করেন।" আমাদের পরমপ্রভুর চিন্ময় পাদপদ্ম সর্ব্বদা সূর্যদেবের মত আমাদের মাথার উপর রয়েছে। তাঁর পবিত্র পাদপদ্ম পরম অভিভাবকের সদাজাগ্রত চক্ষুর মত আমাদের মাথার উপর সূর্যের মত দীপ্তিমান হয়ে রয়েছে আর আমরা সেই সদাজাগ্রত দিব্যদৃষ্টির সামনেই আমাদের জীবন যাপন করছি।

যা নৈর্ব্যক্তিক তাতে আমাদের কোন আকর্ষণ নেই, পরন্তু যে সত্য আত্মবাদী তাই আমাদের লক্ষ্য। আমরা সবসময়েই চেষ্টা করব নৈর্ব্যক্তিক আপেক্ষিকতার মধ্যে না গিয়ে আত্মবাদী আপেক্ষিকতার মধ্যে, আত্মবাদী জগতের মধ্যে বাঁচার জন্যে। আমরা যেন কখনও না ভাবি "আমার পায়ের নীচে শক্ত মাটি আছে দাঁড়াবার জন্যে, আমি একজন বিরাট লোক, আমি মাথা উঁচু করে সোজা হয়ে দাঁড়াব।" বরং আমাদের চিন্তা করা উচিত "আমার চেতনার উপরে রয়েছে চিন্ময় চেতনা, আমার অভিভাবকের সদাজাগ্রত চক্ষু আমাকে সবসময় পাহারা দিচ্ছে। আমি সেই সদাজাগ্রত দৃষ্টির সামনেই জীবন কাটাচ্ছি।" আমাদের অবলম্বন নীচের থেকে আসছে না, আসছে উপর থেকে। তিনি আমাদের আশ্রয়। সেই শক্তিমান উপরের জগতকে আশ্রয় করেই আমরা আছি যেখানে তিনি বাস করেন, আমাদের

অবলম্বন সেখানেই পাওয়া যাবে। এ বিষয়ে আমাদের সর্ব্বদা সচেতন থাকতে হবে।

এটি হল ঋগ্বেদের একটি মূল মন্ত্র। কেউ যখন কোন নতুন কাজ বা কর্ত্তব্যের দিকে এগিয়ে যান তখন তাঁর নিজের অবস্থাটা আগে চিন্তা করা উচিত। বেদের এই শ্লোক আমাদের এই উপদেশ দিয়েছেন যে এর দ্বারা বোঝা উচিত যে "তুমি তোমার অভিভাবকের সদাজাগ্রত প্রহরী চক্ষুর সামনেই রয়েছ। আর সেই বিশাল চক্ষু সূর্যের মত জীবন্ত। তোমার মাথার উপর যে সূর্য রয়েছে তারই মত তাঁর দৃষ্টি। তাঁর মর্মভেদী দৃষ্টি এক তীক্ষ্ণ আলোকশিখার মত যা তোমার মর্মভেদ করে তোমার ভিতরে সবকিছু দেখতে পায়।" নিজের স্বরূপ সম্বন্ধে এই উপলব্ধি নিয়ে আমাদের নিজের কর্ত্তব্যের দিকে এগোতে হবে। এইরকম চিন্তা করতে আমাদের কখনও আশা দেওয়া হয়নি যে আমরা শক্ত মাটির উপর দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছি এবং কোন শক্তিশালী অবস্থার ভিত্তিতে শ্রীভগবানের কৃপা ছাড়াই আমরা স্বতন্ত্রভাবে আমাদের ধর্ম্ম পালন করতে পারি।

বাস্তবিকপক্ষে শ্রীভগবানের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে, আমরা ঠিক সূর্যরশ্মির মত। সূর্যরশ্মি কোথায় দাঁড়িয়ে থাকে? তারা সূর্যের উপরেই দাঁড়িয়ে থাকে, সেখানেই তাদের উৎস। সেই একইভাবে আমাদের চিন্তা করা উচিত যে আমাদের আসল দাঁড়াবার জায়গাটা শ্রীভগবানের চিন্ময় জগতে। আমরা কত শত ক্ষুদ্র চেতনা, আর আমাদের মাতৃভূমি হল সেই চেতনময় ভূমিতে। ভগবৎ চেতনার অর্থ হল কৃষ্ণচেতনা। কৃষ্ণভাবনামৃত। আমরা হলাম অনুচেতনা এবং কৃষ্ণ চেতনার জন্যেই আমাদের সৃষ্টি হয়েছে, এই হল আমাদের সম্বন্ধ। এই তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের সবসময়েই সচেতন থাকতে হবে। আমরা কৃষ্ণ চেতনার সঙ্গে যোগযুক্ত আছি। কৃষ্ণ চেতনাময় জগতেরই আমরা অংশ। কিন্তু আপাতত আমরা এই জড়চেতনার প্রবাসে পথভ্রষ্ট হয়ে এসেছি, এক মায়িক চেতনার দ্বারা ভ্রান্ত হয়ে মনে করছি আমরা এই জড় জগতেরই অংশ। কিন্তু আসলে তা নয়।

আমরা এক উচ্চতর চেতনময় জগতের, কৃষ্ণচেতনময় জগতের অংশ — কিন্তু কোনভাবে এই জড়জগতের জড় অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত এক

জড় চেতনার সঙ্গে জড়িত হয়েছি। জড় বস্তুকে আমরা ভোগ করতে পারি, তাই হল সত্যের নৈর্ব্যক্তিক দিক। কিন্তু সত্যের যে আত্মবাদী দিক আমাদের শ্রদ্ধা যেন সেদিকেই থাকে। আত্মবাদী সত্যের সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক তা হল শ্রদ্ধার সম্পর্ক, সেই পরমপুরুষের প্রতি প্রেমভক্তির সম্পর্ক, তা ভোগের বা শোষণের সম্পর্ক নয়। প্রকৃত আনন্দ, চিন্ময় আনন্দ আসে সেবা থেকে — শোষণ থেকে নয়।

এইসব প্রাথমিক তত্ত্ব আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে। শ্রীভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ একবার আমার কাছে মন্তব্য করেছিলেন যে যদিও নিউইয়র্ক শহরের ইঞ্জিনীয়াররা সেখানে অনেক উঁচু উঁচু স্কাইস্ক্রেপার বাড়ী তৈরী করেছে যা নাকি বহুদিন টিকবে, তারা কখনও চিন্তা করেনি তাদের নিজেদের শরীরটা কতদিন টিকবে। বাড়ীগুলো বহুদিন ধরে থাকবে। কিন্তু বাড়ীর ভিতরে যারা বাস করবে তারা ভুলে গেছে তাদের নিজেদের শরীর কতদিন টিকবে। এইভাবে মানুষ জীবনের নৈর্ব্যক্তিক দিকটা নিয়ে খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছে, কিন্তু তাদের আত্মবাদী মূল্যবোধকে তারা অবহেলা করছে। তারা জড়বস্তু নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কিন্তু সেই জড়বস্তু যারা ব্যবহার করবে তাদের কথা ভাবছে না। তারা ভাবে এই জড়জগতকে যারা ব্যবহার করে তাদের জন্যে আত্ম-অনুশীলনের কোন প্রয়োজন নেই। এইভাবে আত্মিক দিককে অবহেলা করে তারা জড়ের দিককে সব গুরুত্ব দিচ্ছে।

চেতনার রশ্মি

আমাদের প্রকৃত স্বরূপ হল সূর্যরশ্মির মত। সূর্যের একটা কিরণ এসে পৃথিবীকে স্পর্শ করে। কিন্তু কোথায় তার প্রকৃত আবাস? সূর্যের এক রশ্মি আমাদের জগতেআসে এবং সে পাহাড়-পর্বত, নদী, সমুদ্র সবকিছুকে স্পর্শ করে, কিন্তু কোথায় তার নিজের ঘর বলে আমরা মনে করব? তার নিজের ঘর অবশ্যই সূর্যেরই মধ্যে, যে পৃথিবীকে সে স্পর্শ করেছে সেখানে তার নিজের ঘর নয়। আমাদের অবস্থাটাও ওই একইরকমের। চেতনার রশ্মি বলে আমরা চেতন জগতের সঙ্গেই সম্পর্কিত, জড় জগতের সঙ্গে নয়। আমাদের পারিবারিক সম্পর্ক সূর্যের সঙ্গে — যে সূর্য চিন্ময় সূর্য।

বৈদিক শাস্ত্র আমাদের এই চিন্তা করতে উপদেশ দিয়েছেন যে, "যদিও তুমি এই পৃথিবীর এক গর্তে এসে পতিত হয়েছ তবুও তোমার মাতৃভূমি সেই চেতনময় সূর্যে। সেখান থেকেই তোমার উদ্ভব হয়েছে, সেখান থেকেই তুমি পালিত হচ্ছ, আর তোমার ভবিষ্যতের সম্ভাবনা, তোমার নিত্য জীবনের লক্ষ্যও সেখানেই। বাস্তব সত্যকে তোমায় এইভাবে উপলব্ধি করতে হবে। যেহেতু তুমি চেতন, তাই তোমার আবাসও হল চেতনার উৎসস্থলে। তুমি পাখী বা পশু যাই হও না কেন, তুমি পাহাড়ে, প্রস্তরে বা সমুদ্রে যেখানেই থাক না কেন, যে অবস্থাতেই থাক না কেন, তোমার উৎস হল চেতনার মধ্যে, অস্তিত্বের মধ্যে। যেমন সূর্যরশ্মির উৎস সূর্যের মধ্যে, তেমনি তোমার উৎস চেতনার মধ্যে।"

বৈদিক শাস্ত্র আমাদের বলছেন, "তুমি এই মাটির সন্তান নও। তুমি হয়ত এখানে বন্দী হয়ে আছ, কিন্তু এখানে তোমার ঘর নয়, এ তোমার কাছে প্রবাস মাত্র। তোমার সমস্ত আশা, সমস্ত সম্ভাবনা এক উচ্চতর ভূমি থেকেই তার সরবরাহ পেতে পারে, কারণ তোমার প্রকৃতিও তো সেই রকমেরই। তোমার খাদ্য, তোমার পুষ্টি, তোমার লালন পালন, তোমার সবকিছুই সেই উচ্চতর বস্তু দিয়ে তৈরী হওয়া উচিত। কিন্তু জড়জগতে যা তুমি পাবে সে সবই তোমার পক্ষে বিষের মত।"

আবার এও সত্য যে যদিও যা চেতনার সঙ্গে সম্পর্কিত তাই আমাদের প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও নিকটতম উপলব্ধি আনে তবুও চেতনার জগতে ডুব দিলে আমরা আরও সারবান বস্তু কিছু পাবো। যদি আমরা আলোক চেতনার দর্শনের বাইরে পা বাড়াই তবে সেই বস্তুকে খুঁজে পাব যা আমাদের অস্তিত্বের প্রকৃত ও পরম প্রয়োজন, সুখ, আনন্দ আর ভগবৎপ্রেম।

চেতনার জগতে আমাদের স্থান খুঁজে পাওয়ার পরে আমাদের সেই জগতে নিজেদের স্থান খুঁজে নিতে হবে, — যে জগত প্রেমভক্তি আনন্দ আর সৌন্দর্য্যের জগত। আমাদের ভাগ্যকে আমাদের সেখানেই অন্বেষণ করতে হবে, এই জড় জগতে কখনই নয়। আনন্দ হল জ্যোতির উপরে, চিন্ময় রস হল চেতনার উপরে। সৌন্দর্য্য আর মাধুর্য্য নিছক চেতনা আর উপলব্ধির উপরে। অনুভূতি নিজের মধ্যে নিজে সম্পূর্ণ নয়। অনুভূতির

লক্ষ্য হিসেবে কেউ বা কিছু নিশ্চয়ই আছে। সুতরাং কোন সর্ব্বোত্তম বস্তুর পরিপূর্ণ তত্ত্ব এমন কোন বস্তু যা সৌন্দর্য্য ও আনন্দে পরিপূর্ণ। শুধুমাত্র নিছক অস্তিত্ব বা চেতনা কখনও সর্ব্বোচ্চ পরিপূর্ণতা হতে পারে না। আনন্দই সর্ব্বোত্তম পরিপূর্ণতা। আনন্দ, প্রেমভক্তি আর সুন্দরের মধ্যেই চেতনা ও অস্তিত্ব গূঢ়রূপে অন্তর্নিহিত আছে।

চিন্ময় সত্য তিন বস্তুর সংমিশ্রণ: সৎ, চিৎ ও আনন্দ। আর এই তিনের মধ্যে আনন্দই হচ্ছে চিন্ময় বস্তুর পরম তত্ত্ব। আনন্দ নিজেকে নিয়েই থাকতে পারে, সে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ। কিন্তু অস্তিত্ব বা চেতনা নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ নয়। একাকী চেতনা ছাড়া যে অস্তিত্ব সে অস্তিত্বের কোন উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু অস্তিত্ব যখন চেতনার দ্বারা অলংকৃত তখন সে নিজের শ্রেয়কে অন্বেষণ করতে পারে, আর তা হল আনন্দ। আনন্দ হল স্বতন্ত্র ও সারবান পরম বস্তু। অস্তিত্ব ও চেতনা দুইই আনন্দের দাস, আনন্দের ভিখারী।

আর কৃষ্ণভাবনামৃতের আনন্দকে যে উপলব্ধি করতে পারে সে এই মৃত্যুময় জগত থেকে মুক্তি পেতে পারে। এই উপলব্ধি যাঁর হয়েছে তাঁর কোন কিছুতেই ভয় পাওয়ার কিছু নেই। যা কিছুর উৎপত্তি এই জড়জগতে হয়েছে — যেখানে সর্ব্বদাই বিনাশের ভয় আছে — সেখানকার কোন কিছুতে তাঁর কোন আশঙ্কার কিছু নেই। এই জড়জগতে শুধু যে আমরা পরিপূর্ণতা পাই না তা নয়, আমাদের অস্তিত্বই এখানে বিপদজনক। যে কোন মুহূর্তে ধ্বংস ও বিনাশ আমাদের গ্রাস করতে পারে।

সত্যের গভীরে ডুব দাও

কিন্তু সেই চিন্ময় আনন্দের স্তরে আসতে গেলে আমাদের সত্যের গভীরে ডুব দিতে হবে। যা বাহ্যিক, যা অগভীর তাতে যেন আমরা কিছুতেই সন্তুষ্ট না হই। ভিতরের বস্তুকে অবহেলা করে যদি আমরা কেবল বাহ্যিক রূপ বা আকারের দিকে মনোযোগ দিই তাহলে আমরা দেখব আমরা ভুল জায়গায় অনুসন্ধান করছি। যখন শ্রীমন মহাপ্রভু শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীবিগ্রহকে দর্শন করছিলেন তখন আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে আমরা

শ্রীবিগ্রহের মধ্যে যা দেখি তাঁর দৃষ্টিও সেইখানে নিবদ্ধ ছিল। আমাদের দৃষ্টিতে অবশ্য জগন্নাথদেবের বিগ্রহ কাঠের পুতুল মাত্র। তবুও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন সেখানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতেন তখন তিনি আনন্দাশ্রু বর্ষণ করতেন, আর তাঁর অশ্রুধারা অবিরাম স্রোতের মত বয়ে যেত। বাস্তবের প্রতি তাঁর দৃষ্টি কিসের সঙ্গে যোগযুক্ত ছিল? আমরা যাকে কাঠের পুতুল বলে দেখি তিনি তাঁকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে দেখেন। আর সেই দৃষ্টিতে দেখে তাঁর নয়নযুগল থেকে অবিরাম অশ্রুধারা বর্ষিত হয়। বাস্তবের সঙ্গে তাঁর যে যোগাযোগ তার স্থানটা কোথায়? তিনি দেখছেন বিপরীত দিক থেকে, আত্মিক জগত থেকে।

তাহলে শ্রীবিগ্রহের সামনে আমাদের কেমন ভাবে যাওয়া উচিত? যখন আমরা শ্রীবিগ্রহকে দর্শন করব তখন আমাদের মনোভাব কেমন হওয়া উচিত? শ্রীভগবানের বিগ্রহ রূপ কোন জড় বস্তু নয়, তাই সেই বিগ্রহ দর্শন করার যথাযথ পদ্ধতি আমাদের শেখা উচিত। তার চেয়েও বড় কথা আমরা যেন অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে এই বিষয়টা দেখি। আমরা যখন শ্রীবিগ্রহকে দেখার চেষ্টা করছি তখন শ্রীভগবান আমাদের দেখছেন। শ্রীভগবান এখানে নেমে এসেছেন এই জড় জগতের পতিত জীবাত্মাদের সাহায্য করার জন্যে এবং তিনি এমনভাবে এসেছেন যাতে আমাদের তাঁর নিজের রাজ্যে তুলে নিয়ে যেতে পারেন।

শ্রীরামানুযাচার্য্য পরমতত্ত্ব শ্রীভগবানের অভিব্যক্তিকে পাঁচ শ্রেণীতে ভাগ করেছেন : পর, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্য্যামী ও অর্চ্চন। 'পর' হল পরমতত্ত্বের মূল তথ্য, 'ব্যূহ' হল তাঁর বিভিন্ন কলা ও অংশ। বৈভব হল এই জড়জগতে তাঁর অবতার রূপ যেমন মৎস, কূর্ম্ম, বরাহ ইত্যাদি। 'অন্তর্য্যামী' হল প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়ে শ্রীভগবান যেরূপে অবস্থান করেন। 'অর্চন' হল এই জড়দৃষ্টির জগতে শ্রীভগবানের বিগ্রহ রূপ। তাঁর এই বিগ্রহ রূপকে আমরা দেখতে পারি, স্পর্শ করতে পারি এবং তাঁর সেবা করতে পারি। এক প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিতে তিনি এসেছেন আমাদের উপলব্ধিকে সাহায্য করার জন্যে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীবিগ্রহকে দর্শন করেছিলেন আর তাঁর নয়নযুগল

অশ্রুর বন্যা বয়েছিল। এমন নয় যে তিনি যখন প্রভু জগন্নাথের বিগ্রহ দর্শন করছিলেন তখন তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সেই দারুমূর্ত্তির বাহ্যিক বিশেষত্বের উপর। বরং তিনি কৃষ্ণভাবনামৃতের এক পরম উচ্চস্তরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর চিন্তা কৃষ্ণভাবনামৃতের গভীরে নিমগ্ন ছিল। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু চিন্তা করেছিলেন যে 'প্রভু জগন্নাথ এখানে এসেছেন আর তিনি লক্ষকোটি পতিত জীবাত্মাকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করেছেন, বিশেষ করে তাঁর নিজের মহাপ্রসাদ সর্বসাধারণের মধ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পরিবেশন করে। এই জগতের উদ্ধারের জন্যে তাঁর পরম উদার রূপ এখানে প্রকট হয়েছে।'

আর কৃষ্ণচেতনা হল জীবোদ্ধারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়। আমাদের গুরু মহারাজ বলতেন "এ জগতে কৃষ্ণ কথার দুর্ভিক্ষ। বর্ত্তমানে একটা দুর্ভিক্ষ আছে, কিন্তু তার মানে কি জগতে অন্নের অভাব হয়েছে? তা নয়, এই জগত কৃষ্ণচেতনা, কৃষ্ণকথার দুর্ভিক্ষে কষ্ট পাচ্ছে। তাই আমাদের খাদ্য সরবরাহের দফ্‌তর খুলতে হবে যাতে সমস্ত জীবাত্মাকে আমরা কৃষ্ণভাবনামৃতের খাদ্য সরবরাহ করতে পারি। মহাপ্রভু বলেছেন, "যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ।" সারা পৃথিবী ভরে গেছে দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকে। তাই আমাদের অবশ্যই খাদ্য সরবরাহ করতে হবে, যার সঙ্গে দেখা হবে তাকেই কৃষ্ণকথা বলতে হবে, কৃষ্ণভাবনার প্রাণবায়ু সঞ্চারণ করতে হবে।

শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুরের মনোভাব ছিল সেইরকম আর শ্রীভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ সেই জিনিস পাশ্চাত্ত্যে নিয়ে গেছেন। শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন "দুর্ভিক্ষের অন্য কোন ধারণা আমি স্বীকার করি না। একমাত্র দুর্ভিক্ষ হচ্ছে কৃষ্ণকথার, কৃষ্ণস্মৃতির, কৃষ্ণচেতনার।" আমাদের জীবনে কৃষ্ণচেতনার প্রয়োজন সম্বন্ধে তাঁর এইরকম ঐকান্তিক চিন্তা ছিল।

আমাদের অস্তিত্বের পক্ষে কৃষ্ণের প্রয়োজন অত্যাবশ্যক। একমাত্র কৃষ্ণই পারেন আমাদের জীবনকে সঞ্জীবনী দিতে, প্রাণপ্রাচুর্য্য দিতে, জীবনীশক্তি দিতে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু রূপে কৃষ্ণ স্বয়ং কৃষ্ণভাবনামৃত পরিবেশন করেন। বাসুদেব ঘোষ তাই বলেছেন 'যদি গৌর না হইত, তবে কি হইত, কেমনে

ধরিতাম দে (দেহ)।' অর্থাৎ "তাঁর কৃপায় আমি এমন অপূর্ব বস্তু আস্বাদন করেছি যা ছাড়া আমার জীবনধারণ অসম্ভব।"

কৃষ্ণচেতনা হল আমাদের জীবনের জীবন। শ্রীল প্রভুপাদ সরস্বতী ঠাকুর ভারতবর্ষের মানুষকে কৃষ্ণচেতনা দেবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন আর শ্রীভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ এই সঞ্জীবনী সারা পৃথিবীতে পরিবেশন করেছেন। তাঁদের কৃপায় এবং স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কৃপায় সারা পৃথিবীতে এত লোক কৃষ্ণচেতনার পথে এসেছেন। শ্রীহরিদাস ঠাকুর একবার মহাপ্রভুকে বলেছিলেন "তোমার হরিধ্বনিতে স্থাবর জঙ্গম সকলেই কৃষ্ণপ্রেম পেল। যে অবস্থাতেই তারা থাকুক না কেন তাদের জীবন ধন্য হল। আমি শুনেছি তুমি যখন হরিনাম করতে করতে, নৃত্য করতে করতে ঝারিখণ্ডের জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলে তখন সেখানে বাঘ হাতীরাও তোমার হরিনাম শুনে নৃত্য করেছিল আর হরিধ্বনি দিয়েছিল। তাহলে এতে আর আশ্চর্য্য কি আছে যদি আমি বলি তোমার হরিধ্বনি শুনে গাছ পাথরেরও পরম প্রয়োজন সিদ্ধ হয়েছে — তারা কৃষ্ণপ্রেম পেয়েছে। তোমার হরিনাম শুনে এ জগতে কি প্রগাঢ় কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চারিত হয়েছে।"

কিন্তু কৃষ্ণনাম জপ করতে গেলে আমাদের দিক থেকেও কিছুর প্রয়োজন আছে। "অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয় সদা হরিঃ।" কীর্ত্তনের আশ্রয় আমাদের অবশ্যই নিতে হবে, কিন্তু মহাপ্রভুর উপদেশ মত আমাদের মনোভাব যেন হয়, 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা'। আমাদের মধ্যে যেন দৈন্যের ভাব থাকে আর যদি আমাদের মনে হয় আমাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হয়েছে তবুও আমাদের সহিষ্ণু হতে হবে আর কোন অবস্থাতেই যেন আমরা নিজেদের প্রতিষ্ঠা বা সম্মানের জন্যে চেষ্টা না করি, এই হবে আমাদের লক্ষ্য।

যে নীচে আছে সে যখন যে উপরে আছে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, কনিষ্ঠ অধিকারী যখন মধ্যম বা উত্তম অধিকারীর বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তখন অপরাধ আসে। এই প্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ করা উচিত। প্রাথমিক শিক্ষাও শিক্ষা, নিশ্চয়ই, তবুও তা উচ্চতর শিক্ষার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে না, এ বিষয়ে আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে। সেই একই সঙ্গে আমাদের

মনে রাখতে হবে যে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে উচ্চতর শিক্ষার পার্থক্যটা যেন সত্য হয়। তবুও প্রাথমিক শিক্ষাকে কখনও উচ্চতর শিক্ষা বলে মনে করা উচিত না। তা খুব বিপদজনক। "অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী।" এ বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকতে হবে, তা না হলে আমাদের মনোভাব হবে আত্মহননকারী। অপরাধের প্রশ্ন তখনই ওঠে যখন প্রাথমিক শিক্ষা উচ্চতর শিক্ষার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। সেইরকমভাবে আত্মজাহির করা অপরাধজনক।

ধীরস্থির ভাবে যে চলে সেই সফলতা লাভ করে। অনন্তের প্রতি আমাদের যে যাত্রা সে অতি দীর্ঘ যাত্রা, সে যাত্রা কখনও কয়েক ঘন্টায়, কয়েক দিনে বা কয়েক বছরে শেষ হতে পারে না। তাই আমাদের নিজেদের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে। এমন নয় যে আমরা খানিকটা দৌড়ঝাঁপ করে খানিকটা উন্নতি করব আর তারপর থেমে যাব আর বিশ্রাম করব। আমাদের এক দীর্ঘ পথে যাত্রা করতে হবে। আমরা যদি দৈন্য অবলম্বন করতে পারি — 'তৃণাদপি সুনীচেন' — কেবল তবেই আমরা সফল হতে পারি। এমন কোন অবস্থা আমাদের সৃষ্টি করা উচিত নয়, যা বিরোধিতাকে আমন্ত্রণ করে আনবে। তবুও অপ্রত্যাশিতভাবে কোন বিরোধিতা যদি আমাদের প্রতি আসে তবে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে সহ্য করার, ক্ষমা করার। আর আমরা যেন অবশ্যই সচেতন থাকি যে আমাদের অভিভাবকের জাগ্রতচক্ষু সর্ব্বদাই আমাদের উপরে আছে, তিনি আমাদের সংগ্রামে সাহায্য করার জন্যে সর্ব্বদাই আগ্রহশীল। আমরা একলা নই। এই বিশ্বাস নিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারি যে একজন মাথার উপরে আছেন যিনি আমাদের প্রতি যে অন্যায় হয়েছে তার প্রতিকার করবেন, সুতরাং আমাদের এ বিষয়ে কোন উদ্যম করতে হবে না।

কোন অন্য অভিলাষ বা প্রলোভন দ্বারা প্ররোচিত হয়ে আমাদের কৃষ্ণানুসন্ধানের পথকে যেন আমরা ছেড়ে না দিই। গুরু-গৌরাঙ্গ-কৃষ্ণ-বৈষ্ণবের সন্তোষই যেন আমাদের একমাত্র লক্ষ্য হয়। অন্য কোন জিনিস যেন আমাদের পথে না আসে। আমাদের উদ্দেশ্যের শুদ্ধতাকে সর্ব্বদা খুব সতর্কভাবে রক্ষা করতে হবে। আমাদের চিন্তা এইরকম হওয়া উচিত, "আমি একলাই আমার কর্ত্তব্য করে যাব। আমি সবসময় কাউকে খুঁজব

না যে এসে আমাকে সাহায্য করবে। তারা তাদের কর্ত্তব্য করুক। আমি আমার কর্ত্তব্য করব।”

এইরকম মনোভাব নিয়ে আমরা আমাদের সেবা চালিয়ে যাব। চিন্তাধারার মধ্যে এইরকম সমন্বয় থাকলে আমাদের মনোযোগ আরও একাগ্র হবে, কৃষ্ণের প্রতি আমাদের বিশ্বাস বেড়ে যাবে আর আমাদের সেবা শুদ্ধ ও পবিত্র হবে। আমাদের সচেতন থাকতে হবে যে বাধাবিপত্তি এসে অবশ্যই আমাদের আক্রমণ করবে, কিন্তু আমরা দৈন্য ও সহিষ্ণুতার সঙ্গেই তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করব। সুতরাং এই জীবন কোন আরামের জীবন নয়।

বিষ্ণুর পরমপদ

কিন্তু এইধরণের দৈন্য ও সহিষ্ণুতাকে বিকশিত করার জন্যে আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গীও শিখতে হবে যে সবকিছুতেই শ্রীভগবানের হাত আছে। তাই বৈদিক শাস্ত্র আমাদের বলেন যে শ্রীভগবানের দৃষ্টি সর্ব্বদা আমাদের উপর আছে সেকথা স্মরণ রাখতে। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। আকাশে সূর্যকে যেমন দেখি বিষ্ণুর পরমপদকেও যেন সেইভাবেই দেখি। সূর্যের কথা কেন বলা হচ্ছে? সূর্যকে ‘প্রদর্শক’ বলা হয়েছে তিনি দেখেন তিনি সাক্ষী থাকেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে আমরা সূর্যকে দেখি, কিন্তু আসলে সূর্যই আমাদের সবকিছু দেখতে সাহায্য করেন। বিষ্ণুর পরমপদ তাঁর শ্রীঅঙ্গের সর্ব্বনিম্নস্থান — “যোগে বিধায় স যস্য বিদ্যতে কচ্চিৎ”। তাঁর শ্রীপাদপদ্ম আমাদের প্রাথমিক উপলব্ধির স্থান। এই প্রাথমিক উপলব্ধি হল এই ধারণা যে শ্রীভগবান আমাদের সর্ব্বদাই দেখছেন। সূর্য যেমন আমাদের দেখতে সাহায্য করেন, সেরকম বিষ্ণুর পরমপদও সূর্যের মত। সুতরাং বিষ্ণুর পরমপদের জ্যোতিতেই যেন আমরা সর্বদা সবকিছু দেখার চেষ্টা করি।

অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যাবে যে তাঁর পরমপদ এক বৃহৎ চক্ষুর মত সারা আকাশে বিস্তৃত হয়ে আছে। যাই আমরা করি না কেন, আমাদের অভিভাবকের জাগ্রত প্রহরী চক্ষু আমাদের মাথার উপর

সূর্য্যের মত রয়েছে। যে কোন কাজ শুরু করার আগে বেদের এই মন্ত্র যেন আমরা মনে রাখি। ঋগ্বেদ হল প্রথম বেদ আর এই হল ঋগ্বেদের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ মন্ত্র। বৈদিক ধারার ব্রাহ্মণদের বলা হয়েছে যে, যে ধর্ম্ম সংক্রান্ত বা বর্ণাশ্রম সংক্রান্ত যে কোন ক্রিয়াকর্ম্ম বা কর্ত্তব্য বা সেবা করার আগে যেন তাঁরা ঋগ্বেদের এই মন্ত্র মনে রাখেন যে "বিষ্ণুর পরমপদ তোমার মাথার উপর রয়েছে ও তা তোমাকে অভিভাবকের সদাজাগ্রত চক্ষু দিয়ে দেখছেন। সর্ব্বদা একথা মনে রেখে তোমার কর্ত্তব্য কর।"

তুমি যদি সর্ব্বদা মনে রাখ যে তুমি যা করছ সবই তিনি দেখছেন তবে তুমি কোন অন্যায় করতে পারবে না। তুমি সাহসই করবে না এমন কিছু করতে যাতে শ্রীভগবানের কাছে অপরাধ করা হয় যতক্ষণ তুমি মনে রাখবে যে সর্ব্ব অবস্থার মধ্যেই তাঁর অনুসন্ধানী চক্ষু, তাঁর সর্ব্বজ্ঞ চক্ষু তোমাকে সর্ব্বদা পাহারা দিচ্ছেন। এই চিন্তা অবশ্যই তোমার হৃদয়কে, তোমার উপলব্ধিকে, তোমার সমস্ত মানসিকতাকে শুদ্ধ করবে এবং তোমাকে সাহায্য করবে শ্রীভগবানের কাছে যথাযথভাবে শরণাগত হবার জন্যে। **এমন নয় যে তোমার যা ইচ্ছে তাই করবে আর তিনি কিছু জানতে পারবেন না; এমন নয় যে তোমার নিজের জীবনের বা পৃথিবীর সবকিছুর কলকাঠি নাড়ার মালিক তুমি; এমন নয় যে তুমি তোমার পারিপার্শ্বিক জগতের উপর তোমার প্রভুত্ব ফলাবে বা স্বার্থপর ভাবে চেষ্টা করবে তোমার প্রভাব ছড়াবার। সর্ব্বদা মনে রেখ যে রঞ্জন রশ্মির আলোর মত এক বৃহৎ চক্ষু তোমার মাথার উপর থেকে সবকিছু দেখছেন। তুমি নিজেও নিজের সম্বন্ধে যা জান না তিনি তা জানেন। তোমার হৃদয়ের গহনে, তোমার অবচেতন মনে যা আছে তিনি তাও দেখতে পান। তোমার প্রতিদিনের জীবনে তোমার প্রতি পদক্ষেপে তুমি যদি একথা মনে রাখ তবে তুমি অবশ্যই শুদ্ধ হবে।** যেমন লেসার রশ্মি দিয়ে তোমার শরীর থেকে কখনও ক্যান্সারকে সরিয়ে দেওয়া যায়, সেরকম বিষ্ণুর পরমপদের চিন্ময় জ্যোতির রশ্মি দ্বারা, তাঁর পাবনী শক্তি তোমার হৃদয় থেকে এই ভবরোগকে মুছে ফেলবে।

চতুর্থ অধ্যায়

গোপালকৃষ্ণ

দেবে বর্ষতি যজ্ঞবিপ্লবরুষা বজ্রাশ্মবর্ষানিলৈঃ
সীদৎ পালপশুস্ত্রিয়াত্মশরণং দৃষ্ট্বানুকম্প্যুাৎস্ময়ন্।
উৎপাট্যৈককরেণ শৈলমবলো লীলোচ্ছিলীন্ধ্রং যথা
বিভ্রদেগাষ্ঠম পান্মহেন্দ্রমদভিৎ প্রীয়ান্ন ইন্দ্রোগবাম্।।

(শ্রীমদভাগবতম ১০/২৬/২৫)

অর্থাৎ "তখন তাঁরা প্রার্থনা করতে লাগলেন — "যজ্ঞভঙ্গ জন্য ক্রোধে দেবরাজ ইন্দ্র, বজ্র, করকা এবং প্রবল বায়ু বর্ষণ করতে লাগলে যিনি নিজ আশ্রিত গোষ্ঠস্থ পশু, পশুপালক ও অবলাগণকে অবসন্ন দেখে সদয়ভাবে ইষদ্ হাস্যসহকারে বালকের উচ্ছিলীন্ধ্র (ছত্রাকার উদ্ভিদ বিশেষ) ধারণের ন্যায় অনায়াসে একহস্তে গোবর্দ্ধন গিরি উৎপাটন পূর্ব্বক উর্দ্ধে ধারণ করে ব্রজ রক্ষা করেছিলেন, সেই ইন্দ্রগর্ব্ববিনাশক, গোসমূহের প্রভু আমাদের প্রতি প্রীত হোন।"

কৃষ্ণের গোবর্ধনলীলার সারমর্ম্ম বা সারবস্তু এই শ্লোকের মধ্যে নিহিত আছে। বৃন্দাবনের গোপালকরা স্বর্গের রাজা ইন্দ্র — যাঁর আদেশে মেঘ, বৃষ্টি ও অন্য সব সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক শক্তিরা কাজ করেন — তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্যে একটি যজ্ঞ করতেন। গোপালকদের প্রধান সম্পত্তি হল গাভী আর গাভীর প্রধান খাদ্য হল ঘাস। একমাত্র বৃষ্টিই ঘাস উৎপন্ন করতে পারে তাই গোপালকরা সেই সূক্ষ্ম শক্তিকে সন্তুষ্ট করার জন্যে এই যজ্ঞ করতেন যে সূক্ষ্ম শক্তি বৃষ্টির মত প্রাকৃতিক বস্তুর আধিপত্য করেন।

ইন্দ্রকে সন্তুষ্ট করলে অনুকূল বৃষ্টি আসবে এবং প্রচুর ঘাস উৎপন্ন হবে। গাভীরা তখন খুব সহজেই ঘাসের উপরে চড়ে বেড়াবে এবং সেই ঘাস খেয়ে প্রচুর পরিমাণে দুধ দেবে। গোপালকরা আর তাদের পরিবারের সকলে সেই দুধ থেকে নানারকম দুগ্ধজাত দ্রব্য — দই, ক্ষীর, ছানা, মাখন ইত্যাদি প্রস্তুত করত ও সেসব বাজারে বিক্রি করে তার দ্বারা তাদের জীবিকানির্বাহ করত।

কোন স্থানে ক্রমাগত গাভী চরাবার পর যখন সেখানকার মাঠ ঘাসশূন্য হয়ে যেত তখন তাঁরা অন্য বনে গিয়ে গাভী চরাতেন। শুধু গাভীদের ঘাস খাওয়াবার জন্যই কৃষ্ণের পিতা নন্দ মহারাজ ও অন্য গোপালকরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতেন। এইভাবে কখনও তাঁরা বৃন্দাবনে বাস করতেন, কখনও বা নন্দগ্রামে বা গোকুলে।

একবার কৃষ্ণ তাঁর নিজের স্বরূপ প্রকাশ করতে চাইলেন ও ইন্দ্রের পূজার খানিকটা পরিবর্ত্তন করতে চাইলেন। তিনি বৃন্দাবনে তাঁর নিজের রাজ্যকে তাঁর স্বমহিমায় প্রকাশ করতে চাইলেন।

যদিও তিনি তখন একটি বালক মাত্র ছিলেন, তবুও তিনি অসামান্য ক্ষমতাসম্পন্ন বালক ছিলেন। তাঁর তখন মাত্র সাত বছর বয়স ছিল। কিন্তু পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে যাঁরা মহান ব্যক্তি বা বিশিষ্ট পুরুষ তাঁদের বাড় সাধারণ মানুষের দেড়গুণ হয়। যদিও সাধারণ হিসেবে কৃষ্ণের বয়স ছিল সাত, তবু এই হিসেবে তাঁর বয়স ছিল এগার।

কৃষ্ণ বললেন, "তোমরা ইন্দ্রের জন্যে কেন যজ্ঞ করবে? আমাদের প্রত্যক্ষ সংশ্রব হচ্ছে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের সঙ্গে, ইন্দ্রের সঙ্গে নয়।" তিনি তাঁর এই মনোভাব গোপদের জানালেন আর তাঁরা ইচ্ছার সঙ্গে বা অনিচ্ছার সঙ্গে, যেভাবেই হোক কৃষ্ণের উপদেশ মেনে নিলেন। নন্দ মহারাজ তাঁর পুত্রবাৎসল্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন আর যেহেতু তিনি রাজা ছিলেন তিনি তাদের বললেন "এবারে আমরা গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের পূজা করব, ইন্দ্রের পূজা করব না।"

অপমানিত ইন্দ্র

সুতরাং বৃন্দাবনের গোপালকরা কৃষ্ণের উপদেশ অনুসরণ করলেন

এবং খানিকটা ইচ্ছার সঙ্গে, খানিকটা অনিচ্ছার সঙ্গে তাঁরা গোবর্দ্ধন পর্ব্বতের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ শুরু করলেন। এই সংবাদ ইন্দ্রের কাছে পৌঁছল। তিনি চিন্তা করলেন, "এখানে এক বিশেষ শক্তিমান বালক বাস করছে। সে বৃন্দাবনের আধিপত্য নিয়েছে আর আমার উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞ যা প্রাচীনকাল থেকে চলে আসছে তা থামিয়ে দিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে গোপালকদের প্রথা ছিল আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে যজ্ঞ করার আর এখন এক বালক আমার যজ্ঞ থামাবার কারণ হল।" তিনি খুবই ক্রুদ্ধ হলেন। তখন ইন্দ্র মেঘ, বায়ু ও বিদ্যুৎকে আদেশ দিলেন বৃন্দাবনের অধিবাসীদের আক্রমণ করার জন্যে।

বৈদিক ধারণা অনুযায়ী সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদানেরই ব্যক্তিত্ব আছে। প্রাচীনকালে আর্যরা ও রাজর্ষিরা — উন্নত মানুষ ও মহান ঋষিরা — সবকিছুকেই ব্যক্তি হিসেবে দেখতেন। তাঁরা সবকিছুর ব্যক্তিরূপে অস্তিত্ব দেখতেন। গাছপালা, লতাপাতা এবং পারিপার্শ্বিকের সবকিছুকেই তাঁরা ব্যক্তি হিসেবে দেখতেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন এরা সকলেই ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট এবং নিজ কর্ম্ম অনুযায়ী তারা নানা দেহে বিচরণ করছে।

একবার একজন জীববিদ্যার অধ্যাপক আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে ডারউইনের বিবর্ত্তনবাদের কোন বিকল্প আছে কিনা। তাঁর প্রতি আমার উপদেশ ছিল এই যে চেতনা থেকে বস্তুর বিবর্ত্তনকে বোঝা যাবে বার্কলের দর্শনের ভিত্তিতে। যাই আমরা চিন্তা করি তাই প্রকৃতপক্ষে চেতনার অংশ। আর চেতনার অর্থ ব্যক্তিত্ব। যা সম্বন্ধেই আমরা সচেতন তাই কোন ব্যক্তি। আমরা বায়ুকে কোন চেতনহীন বস্তু মনে করতে পারি, কিন্তু বৈদিক ধারণায় তাকে ব্যক্তি বলে মনে করা হয়েছে। বায়ু, বিদ্যুৎ, মেঘ, বৃষ্টি সকলেই ব্যক্তি। যা কিছুকে আমরা প্রাথমিক জড়বস্তু বলে মনে করি সেই সবকিছুকেই প্রাচীন সত্যদর্শীরা ব্যক্তি বলে মনে করেছেন।

ইন্দ্র, বায়ু, মেঘ ও বৃষ্টিকে আদেশ দিলেন সমস্ত গোকুল বৃন্দাবনকে বিধ্বস্ত করে ফেলতে। তিনি বললেন, "বৃন্দাবনের অধিবাসীরা আমাকে অপমান করেছে। তারা আমাকে অস্বীকার করেছে, আমার পূজা করা বন্ধ

করেছে আর তার বদলে এক পর্ব্বতকে, গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে পূজা করছে। এই অপমান আমি সহ্য করতে পারি না। যাও তাদের বিধ্বস্ত করে এসো।"

যে ইন্দ্র সব সূক্ষ্ম প্রাকৃতিক শক্তির প্রভু তাঁর ক্রোধ ও আদেশের দ্বারা প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। সুতরাং বজ্র বিদ্যুৎ ও বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি একসঙ্গে সমস্ত ব্রজমণ্ডলকে আক্রমণ করল।

তার ফল হিসেবে বৃন্দাবনের সমস্ত অধিবাসীরা বিরাট বিপদে পড়লেন। গোপালক ও জীবজন্তুরা সকলেই দুঃখকষ্ট ও যন্ত্রণা পেতে লাগলেন। বৃন্দাবনের অসহায় নারী, শিশু ও জীবজন্তুদের তখন কৃষ্ণের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকল না। তাঁরা সকলেই কৃষ্ণের কাছে এল নিস্তার পাওয়ার জন্যে। তাঁরা কান্নাকাটি করে কৃষ্ণকে বলল, 'ও কৃষ্ণ! এখন আমরা কি করব? তুমি আমাদের বুঝিয়েছিলে ইন্দ্রের যজ্ঞ বন্ধ করার জন্যে। আর এখন ইন্দ্র প্রতিশোধপরায়ণ হয়ে আমাদের কি ভীষণভাবে কষ্ট দিতে শুরু করেছেন। আমরা কি করে বাঁচব? তুমি আমাদের দয়া করে বাঁচাও!' এইভাবে তাঁরা সকলেই কৃষ্ণের কাছে রক্ষা পেতে এল। তাই দেখে কৃষ্ণের খুব দয়া হল। তাঁদের প্রতি সদয় হয়ে তিনি একটু হাসলেন ও ভাবলেন "এরা সব আমার কাছে এসেছে রক্ষা পাওয়ার জন্যে।"

তখন কৃষ্ণ মাত্র একহাত দিয়ে গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকে তুলে ধরলেন। তাঁর পক্ষে সেটা খুবই সহজ কাজ ছিল, মাত্র একহাত দিয়ে তিনি সেই পাহাড়কে তুলে ধরলেন, যেমন ছোট শিশু একটা খেলার বলকে তুলে ধরে।

'আর সেই বিরাট পাহাড় তুলে ধরে কৃষ্ণ সমস্ত গোকুলবাসীকে আশ্রয় দিলেন। বৃন্দাবনের সমস্ত নরনারী শিশু তাদের গাভী ও সমস্ত জিনিসপত্র নিয়ে এসে সেই পর্ব্বতের নীচে আশ্রয় নিল।

সমস্ত গোপালক সমাজ সেই পাহাড়ের নীচে আশ্রয় নিল। এইভাবে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত তুলে কৃষ্ণ বৃন্দাবনবাসীদের আশ্রয় দিলেন আর স্বর্গের রাজা স্বয়ং ইন্দ্রের গর্ব্বচূর্ণ করলেন।

তাই নন্দ মহারাজ এই শ্লোকে এইভাবে প্রার্থনা করেছেন — "সেই

গোসমূহের প্রভু আমাদের প্রতি প্রীত হোন। কৃষ্ণের তুলনায় ইন্দ্র কি? কৃষ্ণই ইন্দ্রের প্রভু। তবু তিনি আমাদের কাছে গোপালক রূপে এসেছেন। পরমতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান সামান্য রাখাল বালকের ভূমিকা নিয়েছেন। আপাতদৃষ্টিতে তিনি সামান্য রাখাল বালক মাত্র। কিন্তু সেই রাখাল বালক যিনি সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখেন তিনি আমাদের প্রতি প্রীত হোন। শ্রীভগবান যিনি এক রাখাল রাজার দীন ভূমিকা নিয়েছেন, আমরা তাঁরই পূজা করতে চাই।"

শ্রীমদভাগবতমের এই শ্লোকের দ্বারা আমরা বুঝতে পারি শ্রীভগবানের গোবর্দ্ধন লীলার স্থান কোথায়। এখানে এও বর্ণনা করা হয়েছে যখন ব্রজবাসীরা তাঁকে পূজা করল, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য যজ্ঞ করল তখন তারা গোবর্দ্ধন পাহাড়কে পরমপুরুষ রূপে দেখল, যিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে তাদের নিবেদন গ্রহণ করেছিলেন ও তাদের নিবেদিত অন্নব্যঞ্জন খেয়েছিলেন।

সেইসময়ে কৃষ্ণ তাদের দেখালেন, "তোমরা সবাই দেখ! তোমরা ভেবেছিলে গোবর্দ্ধন পাহাড় এক পাথরের ঢিবি মাত্র, কিন্তু তা নয়, তিনি জীবন্ত, তিনি স্বয়ং ভগবান।" **সেই সময়ে কৃষ্ণ নিজেকে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত রূপে দেখালেন আর দেখালেন তা তাঁর অংশও বটে। আমাদের সম্প্রদায়ের বিশেষজ্ঞ পন্ডিতদের উপলব্ধি অনুযায়ী রাধাকুন্ডও শ্রীমতী রাধারাণীর অংশ, যেমন গোবর্ধন পর্ব্বত কৃষ্ণের অংশ। তাই আমরা গোবর্ধন শিলার পূজা করি যা স্বয়ং কৃষ্ণ বা গিরিধারীর অংশ। এর থেকে আমরা যেন বুঝি যে অনন্তের এক অংশও অনন্ত। কিন্তু তবু আমাদের জড়দৃষ্টি এতই দুর্ব্বল যে যদিও গোবর্ধন শিলা অনন্তের অংশ এবং সেজন্যে অনন্ত তবু আমাদের চর্মচক্ষুতে তা কেবল এক খন্ড পাথর মাত্র।**

এই লীলা আমাদের এই দেখিয়েছে যে যদিও কোন জিনিসকে সাধারণ পাথর বলে মনে হতে পারে তবুও তার সম্ভাবনা অনন্ত। সাধারণভাবে বলতে গেলে আইনস্টাইনের 'রিলেটিভিটি থিয়োরী' ঘোষণা করেছে যে যা কিছু আমরা দেখি তা তাই বটে এবং তার চেয়েও বেশী কিছু। তাঁর নিজের বৈজ্ঞানিক পন্থায় তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে কোন বস্তুর বাস্তবতার মধ্যে তার সম্ভাবনাও অন্তর্নিহিত আছে — বাস্তবতা কোন স্থাবর বস্তু নয়।

যা চোখে দেখা যায় বা ইন্দ্রিয় দ্বারা গ্রহণ করা যায় তার মধ্যেই বাস্তবতা সীমিত নয়। কোন বস্তু সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি বা হিসেবনিকেশ সীমিত হতে পারে, কিন্তু আমাদের কাছে অজ্ঞাত থাকলেও তার সম্ভাবনা অনন্ত। সবকিছুরই অনন্ত সম্ভাবনা আছে। আমাদের ধারণা নেই একটি বালুকণার মধ্যে কি অনন্ত সম্ভাবনা আছে। আমরা জানিনা একটা গাছের পাতার মধ্যে কি ধরণের সম্ভাবনা আছে। তা দেখে সামান্য মনে হতে পারে, কিন্তু তার মধ্যে হয়ত অমূল্য আরোগ্য শক্তি আছে।

পরমসুন্দর শ্রীভগবান

অনন্তের এক অংশও অনন্ত। গোপ্রভু ও গোপালক কৃষ্ণের প্রতিভূ হলেন গোবর্ধন শিলা। গোবর্ধনের মধ্যে পরমসুন্দর ভগবানের সেই মৃদু ও কোমল তত্ত্ব রয়েছে। তাঁর কৃপা, তাঁর প্রীতি ও আমাদের প্রতি তাঁর কৃপাদৃষ্টি আমরা প্রার্থনা করি।

তাই হয়ত আমাদের এই জগতের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করবে। যখন আমরা এই জড়অস্তিত্বকে থামিয়ে দিতে চাইব আর শ্রীভগবানের দিকে, কৃষ্ণভাবনামৃতের দিকে যাত্রা করব, আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্যগুলোকে অবহেলা করে, তখন বাধাবিঘ্ন আসতে পারে আমাদের কষ্ট দিতে, পরম সত্যের প্রতি আমাদের যাত্রাকে রোধ করতে। কিন্তু আমরা যদি কৃষ্ণের আদেশ মেনে চলি তিনি আমাদের রক্ষা করবেন। কৃষ্ণ ভগবত গীতায় একথা নিশ্চয় করে বলেছেন,

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।

তিনি বলেছেন, "সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে আমার শরণাগত হও। ভয় কোর না। আমি তোমাকে রক্ষা করব আর কর্ত্তব্য ত্যাগ করার জন্যে যদি কোন পাপের ফল আসে তার থেকেও আমি তোমাকে মুক্তি দেব।"

বিভিন্ন রকমের জড় প্রবৃত্তি এবং মানসিক উত্তেজনা আমাদের আক্রমণ করতে পারে, এমনকি স্বর্গের দেবতা এবং সব সাধারণ কাজের নিয়ন্ত্রক স্বয়ং ইন্দ্রও আমাদের আক্রমণ করতে পারেন। কিন্তু আমরা যদি আমাদের

লক্ষ্যের প্রতি মনোযোগ দিই, যদি কৃষ্ণের আদেশ মনে রাখতে সতর্ক থাকি, তবে তিনি আমাদের তাঁর শ্রীচরণের ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। তিনি গোবর্ধন পর্ব্বতের ছায়ায় আমাদের আশ্রয় দেবেন যেখানে কোন ইন্দ্র আমাদের মাথার চুল স্পর্শ করতে পারবেন না। আর কৃষ্ণ আমাদের রক্ষা করবেন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে আমরা জাগতিক কর্ত্তব্য ফেলে রাখার জন্যে যত বাধাবিঘ্ন আমাদের আক্রমণ করবে তার থেকে তুমি আমাদের রক্ষা কর।"

যদিও অনেক বিশৃঙ্খলা আমাদের ধরতে আসবে তবুও কৃষ্ণ আমাদের রক্ষা করবেন। আর তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে গোবর্ধন পর্ব্বত, যিনি গাভীদের অত্যুত্তম প্রভু, তিনিও আমাদের সর্বরকমের বাধাবিঘ্ন থেকে, বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করবেন। তা কেমন করে সম্ভব? শ্রীভগবান তাঁর আশ্চর্য্য লীলা করেন। তাঁর পন্থা অজ্ঞেয় ও অচিন্ত্য।

পঞ্চম অধ্যায়

ব্রহ্ম-বিমোহন লীলা

শ্রীব্রহ্মা বললেন — হে জগদ্বন্দ্য, নবীন-ঘন-শ্যাম-বিগ্রহ তড়িতের ন্যায় পীতবস্ত্রধারী আপনি গোপরাজ নন্দের নিত্য পুত্র। আপনার শ্রীবদনমন্ডল গুঞ্জাবিরচিত কর্ণভূষণ ও চূড়াগ্রবর্ত্তী শিখিপুচ্ছে দীপ্যমান। গলদেশে বনমালা, বাম হস্তে দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাস, বেত্র, বিষাণ, বেণু প্রভৃতি দ্বারা আপনার পরম শোভা হয়েছে। আপনার শ্রীচরণযুগল অতিশয় কোমল, আমি আপনার স্তব করছি।

(শ্রীমদভাগবতম, ১০/১৪/১)

স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যিনি সর্ব্ব সুসঙ্গতির পরম কারণ তিনি এতই চমকপ্রদ ও অপূর্ব্ব যে তাঁর নিকটস্থ হলেই আমরা তাঁর ভাবভঙ্গী, চলন-বলন দেখে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে যাব। তাঁকে বলা হয় 'উরুক্রম' কারণ তাঁর গতি-ভঙ্গী অতি অপূর্ব্ব, তা অচিন্ত্য, অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। তাঁর বিস্ময়কর অলৌকিক অভিনবত্বেরও কোন সীমা নেই। "আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন মাশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্য।" কেউ কেউ তাঁকে আশ্চর্য্যবৎ দর্শন করেন, কেউ কেউ আশ্চর্য্যভাবে বর্ণনা করেন এবং কেউ কেউ আশ্চর্য্যজ্ঞানে শ্রবণ করেন। তাঁর দিকে প্রতি পদক্ষেপেই অভূতপূর্ব্ব বিস্ময় অনুভূব করা যায়। সেই অনুভূতির কোন সীমা আমরা পাই না। সর্ব্ব চমকপ্রদ বিস্ময়ের মধ্যে তিনি সর্ব্বোত্তম বিস্ময়, অপূর্ব্ব অভিনব সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বিস্ময়। যতই আমরা তাঁকে অনুসন্ধান করব, ততই দেখব যে তাঁর বিস্ময়ের কোন অন্ত নেই।

এমনকি স্বয়ং ব্রহ্মাজী, যিনি এই জড়জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং আমাদের সম্প্রদায়ের আদিগুরু তিনিও কৃষ্ণের অলৌকিক অভিনবত্ব দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। একদা কৃষ্ণ যখন দ্বারকায় বাস করছিলেন তখন তিনি শুনলেন যে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাজী তাঁর দর্শনে এসেছেন। কৃষ্ণ তখন তাঁর দূতকে জিজ্ঞাসা করলেন 'কোন ব্রহ্মা?' দূত যখন ব্রহ্মাজীকে এই প্রশ্ন করল তখন ব্রহ্মা ভাবলেন "অন্য কোন ব্রহ্মাও কি আছেন? তা কি করে সম্ভব?" তিনি দূতকে বললেন, "তুমি কেবল কৃষ্ণকে গিয়ে বল যে আমি চারকুমারের পিতা, চতুর্মুখ ব্রহ্মা।" দূত কৃষ্ণকে সেই সংবাদ দিল।

ব্রহ্মাজীর মনোভাব বুঝে কৃষ্ণ দূতকে বললেন, "তুমি তাঁকে এখানে নিয়ে এসো।" ব্রহ্মা তখন ভিতরে গেলেন, কিন্তু তিনি আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন দেখে যে সেখানে আরও কত বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড থেকে আরও কত ব্রহ্মা সমাগত হয়েছেন। কেউ শতমুখ, কেউ সহস্রমুখ, কেউ লক্ষমুখ ব্রহ্মা — সকলেই সেখানে উপস্থিত আছেন। যেহেতু সমস্ত সৃষ্টি কৃষ্ণের সম্মোহনী শক্তির দ্বারাই গঠিত তাই চতুর্মুখী ব্রহ্মা কৃষ্ণকে এবং অন্য সব ব্রহ্মাদেরও দেখতে পেলেন, কৃষ্ণেরই সম্মোহিনী শক্তির দ্বারা, কিন্তু অন্য ব্রহ্মারা কেউ পরস্পরকে দেখতে পেলেন না। তাঁরা প্রত্যেকেই কেবল কৃষ্ণকে দেখতে পেলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই মনে করলেন "কৃষ্ণ আমার ব্রহ্মাণ্ডে এসেছেন এবং কোন কারণবশতঃ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন।" কিন্তু এই বিশ্বের ব্রহ্মা সবই দেখতে পেলেন কারণ তিনি যে প্রশ্ন করেছিলেন, 'কোন ব্রহ্মা? কোন ব্রহ্মা' একথার কি অর্থ? আমি ছাড়া কি আর কোন ব্রহ্মা আছেন নাকি?' এইভাবে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাজী কৃষ্ণের অভিনব পন্থার দ্বারা বিমূঢ় হয়েছিলেন।

পূর্ব্বে বৃন্দাবনে কৃষ্ণের স্বরূপ সম্বন্ধে ব্রহ্মার কিছু সংশয় হয়েছিল। তিনি চিন্তা করেছিলেন 'কে এই রাখালবালক? এর আচার-আচরণ তো বিশেষ সুবিধাজনক নয়। এ এমনভাবে ঘোরাফেরা করে যাতে মনে হয় এ কারোরই পরোয়া করে না। আমার ব্রহ্মান্ডে এ আছে অথচ আমাকে জানার জন্যে এর কোন আগ্রহ নেই। এ কিরকম ধরণের মনোভাব এর? কে এ? এ তো নারায়ণ নয়। কেবল নারায়ণই আমার উপরে। তাঁর আচার-

আচরণের সঙ্গে আমি খানিকটা পরিচিত আছি। কিন্তু এই বালক তো নারায়ণ নয়। নারায়ণের উপরে কেউ থাকবে তাও তো অসম্ভব। তাহলে এ কে?

কৃষ্ণকে পরীক্ষা করার জন্যে কৃষ্ণের সঙ্গে যে রাখালবালক ও বাছুররা ছিল ব্রহ্মা তাদের সরিয়ে নিয়ে গিয়ে একটা গুহায় লুকিয়ে রাখলেন। একবছর পরে ব্রহ্মা ফিরে এলেন বৃন্দাবনের জীবনযাত্রা কেমন ভাবে চলছে দেখার জন্যে, কৃষ্ণই বা তাঁর রাখাল বন্ধুদের ও বাছুরদের ছাড়া কিভাবে দিন কাটাচ্ছেন দেখার জন্যে। তিনি দেখলেন সব কিছুই আগে যেমন ছিল তেমনই আছে। শ্রীভগবান তাঁর রাখালবন্ধুদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে আছেন, তাঁর বগলে তাঁর বাঁশিটি রয়েছে, হাতে কিছু দধিমাখা অন্ন। ব্রহ্মা দেখলেন সবকিছু যেমন চলছিল তেমনই আছে।

তখন ব্রহ্মা চিন্তা করতে লাগলেন, 'এটা কি রকম হল? তবে কি রাখালবালকরা আর বাছুররা আমার অজান্তে এখানে ফিরে এসেছে?" তিনি তখন যে গুহায় তাদের লুকিয়ে রেখেছিলেন সেখানে দেখতে গিয়ে দেখলেন তারা সবাই সেখানেই আছে। তখন তিনি চিন্তা করতে লাগলেন "এটা কি করে সম্ভব? আমি রাখালবালকদের ও বাছুরদের এখানে লুকিয়ে রেখে গিয়েছিলাম আর এখন আবার এখানে ফিরে এসে দেখছি যে তারা তো এখানে আগের মতই আছে।"

শেষপর্য্যন্ত এইভাবে ভীষণ বিভ্রান্ত হয়ে তিনি কৃষ্ণের পাদপদ্মে পতিত হয়ে প্রার্থনা করতে লাগলেন, 'হে প্রভু আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। আপনি এমন এক সরল, সাধারণ ভূমিকায়, এক রাখালবালকের ভূমিকায় লীলা করতে এসেছেন! কি করে কেউ বিশ্বাস করতে পারে যে আপনার স্থান নারায়ণেরও উপরে? আপনি কৃপা করে আমার কৃতকর্ম্মের অপরাধ ক্ষমা করুণ।"

শ্রীমদভাগবতমের বহু জায়গায় আমরা দেখি যে কৃষ্ণ সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাজীকে নানাভাবে পরীক্ষা করছেন। তবুও ব্রহ্মাজী আমাদের গুরুদেব। তিনি আমাদের সম্প্রদায়ের আদি গুরু। তিনি যে এইভাবে হতভম্ব হতে পারেন এটা বোঝা এতই কঠিন এবং এটা এতই বিভ্রান্তিকর যে মধ্বাচার্য্য

শ্রীমদভাগবতম থেকে এই অংশটা বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। শ্রীমদভাগবতমের এই দুটো অধ্যায় যেখানে ব্রহ্মা বিভ্রান্ত হয়েছেন, সেখানে কৃষ্ণের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর কিছু ভুল ধারণা ছিল, সেই অংশটাকে মধ্বাচার্য্য স্বীকৃতি দিতে পারেননি। কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এ সবকিছুকেই সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

এটা একটা আশ্চর্য্য জিনিষ। আমাদের সম্প্রদায়ের আদিগুরু যিনি তিনি কি করে কৃষ্ণের সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হতে পারেন? এ অচিন্ত্য। ধারণার বাইরে। তবুও অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ তত্ত্বের দর্শন দ্বারা এ সবকিছুই বোধগম্য হয়। এটা আমরা কি করে মেনে নিতে পারি যে আমাদের আদিগুরু বিভ্রান্ত হয়েছিলেন, কেবল একবার নয়, দুদুবার? এ হল শ্রীভগবানের চিন্ময় লীলা। কৃষ্ণ তাঁর ভক্তদের সঙ্গে যে ভাবে লীলা করেন তার মধ্যেই অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের একটি উদাহরণ পাওয়া যায়। কৃষ্ণ নিজে কোন কিছুর অধীন নন, তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। তবুও তিনি তাঁর ভক্তদের কাছে নিজেকে পরাধীন হিসেবে দেখান, এবং তারা যা চায় তাঁকে তা করতেই হয়। আবার কখনও কখনও তিনি তাদের সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন। এই হল মধুর ভগবানের স্বতঃস্ফূর্ত্ত লীলা। কখনও তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেন আবার কখনও তিনি তাঁকে অগ্রাহ্য করেন। কৃষ্ণলীলার প্রকৃতিই এরকম।

কুটিল লীলা

শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর উজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থে একটি শ্লোক দিয়েছেন যার ভিত্তিতে কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে যথাযথ উপলব্ধি হয়। যখন আমরা যারা সীমিত জীব, তারা শ্রীভগবান যিনি অনন্ত, তাঁর লীলা সম্বন্ধে চিন্তা করব তখন তাঁর লীলা সম্বন্ধে এই উপলব্ধি আমাদের থাকা দরকার, "অহেরিব গতিঃ প্রেম্ণঃ স্বভাবকুটিলা ভবেৎ," অর্থাৎ সর্পের ন্যায় প্রেমের স্বভাব-কুটিলা গতি। সেইরকম আমাদের বুঝতে হবে কৃষ্ণের লীলাও স্বভাবতই কুটিল, সর্পের গতির ন্যায়। সাপ কখনও সোজাপথে চলে না, সে সবসময় এঁকেবেঁকে চলে। শ্রীভগবানের লীলার যে তরঙ্গ

তাও সেই একইভাবে বয়ে চলে। অন্য সব কিছুর উপরে কৃষ্ণলীলায় এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। কৃষ্ণ কখনও কোন নিয়মকানুন বা আইনের দ্বারা চালিত হতে পারেন না। শ্রীভগবানকে যে কোন ভাবে অনুসন্ধান করতে গেলে এই প্রাথমিক উপলব্ধি নিয়েই আমাদের সেদিকে এগোতে হবে। আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে যে তিনি অনন্ত আর আমরা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। তিনি হলেন অধোক্ষজ, ইন্দ্রিয়ের অতীত, চিন্ময়, আমাদের জাগতিক অভিজ্ঞতার জগতের অতীত।

আমি একবার শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে শ্রীরূপ গোস্বামী আর শ্রীসনাতন গোস্বামী যে কৃষ্ণলীলার তত্ত্ব দিয়েছেন তার অন্তিম অংশের মধ্যে এত পার্থক্য আছে কেন? সনাতন গোস্বামী তাঁর কৃষ্ণলীলা-স্তবে কৃষ্ণলীলার সারাংশের উপসংহার করেছেন মথুরাতে। কিন্তু রূপ গোস্বামী তাঁর ললিত-মাধবে আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে তাকে দ্বারকায় নিয়ে গেছেন। তিনি কৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে দুটি নাটক লিখেছিলেন, একটি দ্বারকাকে কেন্দ্র করে আর একটি বৃন্দাবনকে কেন্দ্র করে। বিদগ্ধ-মাধবের স্থল হল বৃন্দাবনে আর ললিত-মাধবের দ্বারকায়। কিন্তু শ্রীল সনাতন গোস্বামী তার কৃষ্ণলীলার উপসংহার টেনেছেন মথুরায়।

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর লেখনী অনুসারে কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ব্রজলীলার পরিবার ও সখাসখীর দীর্ঘ বিরহের পরে চক্রের গতির মত তাঁর লীলা মথুরা থেকে আবার বৃন্দাবনে ফিরে যায়। কৃষ্ণ মথুরায় চলে যাবার পরে ব্রজবাসীরা তাঁর বিরহে কাতর হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন : "কত দীর্ঘদিন হয়ে গেল কৃষ্ণ এখান থেকে চলে গেছেন। নন্দ আর যশোদা তাঁদের সন্তানকে হারিয়েছে।" সেই বিরহবেদনা ক্রমশ: আরও তীব্র হতে থাকে এবং উত্তরোত্তর তা ঘনীভূত হতে থাকলে তাঁরা তখন চিন্তা করতে থাকেন : "ওঃ, নন্দ আর যশোদার কোন সন্তান নেই।" তখন তাঁরা চিন্তা করতে থাকেন, "নন্দ আর যশোদার অবশ্যই সন্তান থাকা প্রয়োজন।" এবং সেই চিন্তা করে তাঁরা কৃষ্ণের আবির্ভাবের জন্যে প্রার্থনা করেন।" তখন কৃষ্ণ নন্দ ও যশোদার সন্তান হিসেবে আবির্ভূত হন। তখন এই লীলাচক্র সম্পূর্ণ হয় এবং সকলেই এই চিন্তা করে সুখী হন যে, 'হ্যাঁ, যশোদার একটি সন্তান

আছে।" এইভাবে কৃষ্ণের লীলা আবার বৃন্দাবনে বিকশিত হয়ে মথুরায় গিয়ে পৌঁছয়, যেখানে তিনি কংসবধ করেন।

তাঁর "কৃষ্ণলীলা স্তবে", যা নাকি কৃষ্ণলীলার সারাংশ, সেখানে শ্রীল সনাতন গোস্বামী কৃষ্ণকে মথুরা মন্ডল থেকে দ্বারকায় নিয়ে যাননি। কিন্তু শ্রীল রূপ গোস্বামী তাঁর ললিত-মাধব নাটকে বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলার সঙ্গে দ্বারকায় কৃষ্ণলীলার সমান্তরতা দেখিয়েছেন। সুতরাং তাঁর ললিত-মাধব নাটকে শ্রীল রূপ গোস্বামী ললিতার সঙ্গে জাম্ববতীর, রাধারাণীর সঙ্গে সত্যভামার এবং চন্দ্রাবলীর সঙ্গে রুক্মিনীর সমান্তরতা দেখিয়েছেন। এইভাবে তিনি দেখিয়েছেন কেমন করে বৃন্দাবনলীলা দ্বারকালীলায় রূপান্তরিত হল।

জাগতিক অভিজ্ঞতার অগম্য

আমি শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদকে শ্রীল রূপ গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীর মধ্যে এই পার্থক্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি শুধু বললেন 'এ হল অধোক্ষজ, আমাদের উপলব্ধির বাইরে। সুতরাং কৃষ্ণলীলা হল অচিন্ত্য।" সবকিছুই আমাদের মুঠোর মধ্যে আসতে বাধ্য নয়। শ্রীভগবান তাঁর "সর্ব্বসত্ত্ব সংরক্ষণ" করে রেখেছেন। আমরা যদি সেই পরম সত্যের স্তরের সঙ্গে একটুকুও যোগাযোগ চাই তবে এই উপলব্ধি আমাদের অবশ্যই থাকতে হবে।

তাই শ্রীমদভাগবতমে বলা হয়েছে— "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব" চিন্ময় তত্ত্ব সম্বন্ধে সবকিছু বোঝার চেষ্টা করাটা একটা দোষ। এ জগতে জ্ঞান জিনিষটা একটা যোগ্যতা হতে পারে, কিন্তু সর্ব্বোত্তম চিন্ময় তত্ত্বের সম্পর্কে সবকিছু জানতে চাওয়ার প্রবণতা সাধকের পক্ষে একটা অযোগ্যতা।

আমরা সবকিছুর মূল্য জানতে চাই। আমার যা কিছু সম্পত্তি আছে তার চাবি আমরা হাতে রাখতে চাই। কিন্তু ভজনজীবনে উন্নতির পক্ষে এ একটি বাধাস্বরূপ। এইভাবে যদি আমরা নিজেকে জাহির করতে চাই, তাহলে মাঝখান থেকে আমরা, চিন্ময় তত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের যেটুকু বিশ্বাস

আছে তাও হারাব হয়ত এবং সেইজগতের চাবিকাঠী আমাদের হাতে আসতে আরও দেরী হবে। কোন ভৃত্য যদি মনিবের বাড়ীতে চাকরী পেয়েই বাড়ীর চাবিটা হাতে পাওয়ার জন্যে খুব আগ্রহ দেখায় তবে তার মনিব তাকে সন্দেহ করবেন। তাই সবকিছু জানতে চাওয়াটা একটা রোগ এবং সাধনার পথে এটা আমাদের প্রগতির শত্রু।

একথা মেনে নেওয়া অবশ্যই কঠিন, তবুও একথা সত্যি। আত্মসমর্পণই সর্ব্বস্ব। গোপীরা, যাঁরা কিনা কৃষ্ণের সর্ব্বোচ্চ সেবিকা, তাঁদের মধ্যে আমরা কি কোন জ্ঞানচর্চা দেখি? শাস্ত্রের সঙ্গে তাঁদের কতটুকু পরিচয় ছিল? কিছুই না।

যাকে আমরা 'মানদন্ডানুযায়ী শুদ্ধতা'' বলে মনে করি, যাকে আমরা জ্ঞান বলে মনে করি, শ্রীভগবানকে আনন্দ দেওয়ার জন্যে সে সবকিছুই অক্ষম, যোগ্যতাহীন। 'শুদ্ধতা' ও 'সতীত্ব' সম্বন্ধেও আমাদের ভ্রান্ত মানদন্ড যে কিরকম অযোগ্যতার পরিচয় তার একটা উদাহরণ পরবর্ত্তী কাহিনীতে পাওয়া যাবে।

এক অলৌকিক বৈদ্য

শ্রীমতী রাধারাণীর সর্ব্বোত্তম স্থানটি প্রমাণ করার জন্যে একদিন কৃষ্ণ যেন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। যে সময়ে তিনি অসুস্থ হয়ে শুয়েছিলেন, সেইসময় তিনিই অন্যরূপ ধরে, এক বৈদ্যের ছদ্মবেশে এসে বললেন, "ও যশোদা, আমি শুনলাম তোমার ছেলের নাকি কি অসুখ হয়েছে? এ কি সত্যি?"

"হ্যাঁ সত্যি, আপনি কে?"

"আমি একজন বৈদ্য — এক অলৌকিক বৈদ্য।

তোমার ছেলেকে আমি দেখতে চাই, তাঁর কি অসুখ হয়েছে?"

"সে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। হয়ত তাঁর মাথায় খুব যন্ত্রণা আছে।"

তখন বৈদ্যের ছদ্মবেশে কৃষ্ণ মা যশোদাকে বললেন, "এ খুব কঠিন অসুখ। আমি ওকে সারিয়ে তুলতে চাই। কিন্তু আমি তবেই তা পারব যদি কেউ আমাকে একটা ছিদ্রযুক্ত পাত্রে খানিকটা জল এনে দিতে পারে।

যমুনা থেকে খানিকটা জল এমন একটা পাত্রে আনতে হবে যাতে বহু ছিদ্র আছে। কেবলমাত্র একজন সতী রমণীর পক্ষেই এমন কাজ সম্ভব। তাই একজন সতী রমণীকেই এই ছিদ্রযুক্ত পাত্রে জল আনতে হবে। তারই দ্বারা তোমার ছেলেকে কিছু ওষুধ দিতে পারি। আর সঙ্গে সঙ্গে তোমার ছেলের জ্ঞান ফিরে আসবে।"

তখন যশোদা বৃন্দাবনে ব্যাকুলভাবে সতী রমণীর সন্ধান করতে লাগলেন। জটিলা আর কুটিলা ছিল রাধারাণীর শাশুড়ী ও ননদ। যেহেতু তারা স্বভাবতই প্রচার করে বেড়াত যে বৃন্দাবনের অন্য গোপীদের অর্থাৎ কিশোরী ও তরুণী গোপীদের সতীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে, সেহেতু তাদের দুজনকে সতী বলেই মনে করা হত। সুতরাং যশোদা প্রথমেই জটিলার কাছে আবেদন জানালেন : "এই ফুটোওয়ালা পাত্রে যমুনা থেকে একটু জল নিয়ে আসুন।"

"তা কি করে সম্ভব? ফুটোওয়ালা পাত্রে জল আনা অসম্ভব।"

"না, বৈদ্য বলেছেন কেউ যদি সত্যিই সতী হয় তবে সে ফুটোওয়ালা পাত্রেও জল আনতে পারবে।"

যশোদার পাগলের মত অনুরোধ জটিলা এড়াতে পারল না। তাঁর অনুরোধের মধ্যে এমন আর্ত্তি ছিল যে তাকে যেতেই হল। কিন্তু সে যমুনা থেকে জল আনতে পারল না। কারণ পাত্রটাতে এত ফুটো ছিল। তখন কুটিলাকে অনুরোধ করা হল জল আনার জন্যে, কিন্তু তার মার অবস্থা দেখার পরে তার আর সাহস হল না সেই চেষ্টা করার। তবু যশোদার অনুরোধের মধ্যে এমন ব্যাকুলতা ছিল যে কুটিলাও এই কাজটা এড়াতে পারল না। তাঁর ছেলের এই অবস্থা যশোদা একমুহূর্তের জন্যেও সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই যশোদার ব্যাকুল আবেদনে কুটিলাকেও শেষপর্য্যন্ত যেতে হল। কিন্তু সেও পারল না জল আনতে কারণ জলের পাত্রে এত ফুটো ছিল যে সমস্ত জল ফুটো দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ব্রজরমণীরা আশ্চর্য্য হয়ে চিন্তা করতে লাগল, 'এখন আমরা কি করতে পারি?' ব্রজে এত তরুণী আছে তার মধ্যে একজনও কি সতী নয়? কি অদ্ভুত ব্যাপার। তখন বৈদ্যের ছদ্মবেশে কৃষ্ণ রাধারাণীকে দেখিয়ে দিয়ে

বললেন "আমার মনে হয়ে ইনি একজন সতী রমণী। এঁকে অনুরোধ কর জল আনতে।

যশোদার অনুরোধে রাধারাণী এই কাজ এড়াতে পারলেন না। তাঁকে জল আনতে যেতে হল কিন্তু তিনি মনে মনে কৃষ্ণের কথাই চিন্তা করছিলেন — "তুমি যদি আমাকে সাহায্য করতে আস, আমাকে উদ্ধার কর তবেই এ সম্ভব, তা না হলে অসম্ভব" — এইভাবে তিনি কৃষ্ণের কাছে তাঁর প্রার্থনা জানালেন। রাধারাণী সেই ছিদ্রযুক্ত পাত্র জলে ডোবালেন আর কৃষ্ণ জলের ভেতর থেকে তা স্পর্শ করলেন। রাধারাণী গভীর সন্দেহের সঙ্গে সেই পাত্র জল থেকে তুললেন আর ভীষণ আশ্চর্য্য হয়ে বললেন, "জল রয়েছে পাত্রে"। তিনি তাঁর কয়েকজন সখীকে, তাঁর কয়েকজন অন্তরঙ্গ বিশিষ্ট বান্ধবীদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরাও সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গেল যখন তিনি যমুনা থেকে ঐ পাত্রে জল তুললেন। পাত্রে ছিদ্র ঠিকই ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও জল থেকে গেল। তখন রাধারাণীর যশোদার কাছে সেই জল নিয়ে এলেন আর তা দেখে সকলেই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। বৈদ্য তখন সেই জল কিছু নকল ওষুধের সঙ্গে কৃষ্ণকে খাওয়াল আর কৃষ্ণও তা খেয়ে 'অজ্ঞান' অবস্থা থেকে উঠে বসলেন।

কৃষ্ণ এইরকম একটা কৌশল করলেন রাধারাণীর আসন কোথায় দেখাবার জন্যে সতীত্ব কি বস্তু দেখাবার জন্যে। 'সতীত্ব' তবে কি? সাধারণ তথাকথিত 'সতীত্ব' সত্যিকারের সতীত্ব নয়। সত্যিকারের শুদ্ধতা, সত্যিকারের সতীত্ব, এ জগতের সতীত্বের সমস্ত আপেক্ষিক ধারণার অনেক উপরে। আর তা হল অচিন্ত্য, আমাদের জ্ঞান ও যুক্তির বাইরে, ঠিক যেন ছিদ্রযুক্ত পাত্রে জল রাখার মত। এ হল অলৌকিক।

কিন্তু শ্রীভগবান অঘটন ঘটাতে পারেন। তাঁর সমস্ত আচার ব্যবহারই অলৌকিকতায় পরিপূর্ণ। তার জন্যে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এ জগতের সমস্ত জ্ঞান, আমাদের সমস্ত অভিজ্ঞতা ভুল বলে প্রমাণিত হতে পারে, তার জন্যে আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। তার জন্যে শাস্ত্রে বলা হয়েছে "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্যনমন্ত এব জীবন্তী" — তোমার পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে, এই ইন্দ্রিয়ের জগত থেকে তুমি যা আহরণ করেছ,

সেই প্রত্যক্ষ জ্ঞান থেকে মুক্ত হয়ে যাও। তোমার জাগতিক জ্ঞানের ক্ষমতার দ্বারা চিন্ময় জগতে জোর করে প্রবেশ করার একটা প্রবণতা তোমার হবে। কিন্তু এই শ্লোকে বলা হয়েছে, 'তোমরা যারা পতিত জনগণ, তোমাদের মূলধন হচ্ছে এই জগতের অভিজ্ঞতা, ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা, কিন্তু তা দিয়ে কোন কাজ হবে না, সেই উচ্চতর স্তরে এর কোন মূল্য নেই। সেখানে যা পাওয়া যাবে তা এক নতুন জিনিস, সুতরাং সেই জগতের দিকে খোলা মন নিয়ে এগিয়ে যাও, এইটা বুঝে নাও যে যিনি অনন্ত তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব। তোমার যা কিছু প্রত্যাশা আছে, যা কিছু পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে তার কোনই মূল্য নেই। সুতরাং এই সত্যকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টাটাই তুমি ছেড়ে দাও না কেন?

চিন্ময় জগত আমাদের কাছে খুবই নতুন বস্তু। এ জগতের তথাকথিত 'সত্যে'র কুসংস্কার থেকে মুক্ত হওয়াও আমাদের পক্ষে খুব কঠিন। তবুও আমাদের পক্ষে এটা মেনে নেওয়াটা বিশেষ প্রয়োজন যে শ্রীভগবানের পক্ষে সবকিছুই সম্ভব। তিনি হচ্ছেন অসম্ভবের কর্ত্তা। 'সম্ভব' আর 'অসম্ভব' এ দুটো কথা কেবল আমাদের অভিধানেই পাওয়া যাবে। এমন কি নেপোলিওন 'অসম্ভব' কথাটা মুছে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন 'কেবল বোকাদের অভিধানেই 'অসম্ভব' কথাটা আছে।'

আমাদের সম্প্রদায়ের আদিগুরু বিভ্রান্ত হতে পারেন এটা আমরা কি করে বুঝতে পারি? এ 'অসম্ভব'। তাই আমাদের 'জ্ঞানকে' মুলতুবী রাখতে হবে, তাকে সরিয়ে দিতে হবে (জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব)। আমরা হয়ত বুঝব যে কৃষ্ণ হয়ত আমাদের গুরুদেব ব্রহ্মাজীর সঙ্গে লুকোচুরি খেলছেন। এতো লুকোচুরি খেলারই মত। কখনও কৃষ্ণ অন্যকে পরাজিত করছেন, কখনও স্বেচ্ছায় নিজেই পরাজিত হচ্ছেন।

কৃষ্ণ ও বলরাম

যখন কৃষ্ণ আর বলরাম বনে গিয়ে তাঁদের বন্ধুদের সঙ্গে খেলেন তখন তাঁরা সাধারণত: দুটো দলে খেলেন। একদলে কৃষ্ণ খেলেন আর এক দলে বলরাম খেলেন। কৃষ্ণকে বলরামের চেয়ে কম শক্তিশালী বলে মনে করে

তাঁদের রাখালবন্ধুরা। বলরামই সবচেয়ে শক্তিশালী সেখানে আর বলরামের পরেই হল শ্রীদাম, তাই শ্রীদাম কৃষ্ণের দলে খেলেন।

যখনই বলরাম হেরে যান তখনই তিনি রেগে যান। নিজের দলকে জেতাবার জন্যে কৃষ্ণ নানা কৌশল করেন। বলরাম দেখেন তাঁর নিজের দলই তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে কৃষ্ণের এইসব চাল চালার জন্যে। তখন তিনি রেগেমেগে ছোটভাইয়ের কাছে গিয়ে বলেন, "এবার আমি তোমাকে এর জন্য শাস্তি দেব।" তখন কৃষ্ণ বলেন "না, আমাকে শাস্তি দিতে তুমি পারো না। মা যশোদা আমার দেখভাল করার জন্যে আমাকে তোমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। তুমি তো আমার সঙ্গে কড়া হতে পারো না।"

তবুও একদিন বলরাম কৃষ্ণকে চড় মারলেন আর কৃষ্ণ মা যশোদার কাছে গিয়ে নালিশ করলেন। এতে বলরাম খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন "আমি তোমাকে একবার চড় মারলাম আর তুমি মার কাছে গিয়ে নালিশ করলে যে আমি তোমাকে ভালবাসি না? এটা তুমি কি করে করলে কৃষ্ণ?" তখন কৃষ্ণ খুব অপ্রস্তুত হয়ে নিজের দোষ স্বীকার করলেন।

তাই দেখা যাচ্ছে যে কৃষ্ণলীলা খুব বক্রকুটিল গতিতে চলে (অহেরিব গতিঃ প্রেমণঃ)। এই প্রাথমিক তত্ত্ব, যা কৃষ্ণলীলা উপলব্ধির ভিত্তি, তাই শ্রীল রূপ গোস্বামী এই শ্লোকে দিয়েছেন। তিনি বলছেন, "কৃষ্ণলীলার সর্ব্বত্র যুক্তি খোঁজার জন্যে ব্যস্ত হয়ো না। কৃষ্ণলীলা স্বভাবতই কুটিল।" কৃষ্ণলীলায় আমরা দেখবো যে যদিও কারো কোন দোষ নেই, তবুও একজন আর একজনের একটা দোষ খুঁজে বার করবে ও তারপর ঝগড়া শুরু করবে। কোন দোষই সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবুও লীলা পরিপুষ্টির জন্যে একটা মেকী দোষ খুঁজে বার করা হবে আর তারপরে কোন ঝগড়াঝাটি শুরু হবে। এই হচ্ছে লীলার তাৎপর্য্য, এখানে জাগতিক প্রয়োজনে যা ঘটে, ওখানে তা স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে ঘটে।

অনন্তের গতিবিধির উপরে আমরা আমাদের যুক্তি বা আমাদের মানদন্ডের মাপকাঠি প্রয়োগ করতে পারি না। আর সেই লীলার তরঙ্গে যোগযুক্ত হয়ে যা আমরা লাভ করেছি তাও হারাবো যদি তাকে পরিমাপ

করতে যাই, আমাদের বিশ্লেষণের এই একটাই পরিণাম হবে। তাই শ্রদ্ধা, দৈন্য ও আত্মসমর্পণের মনোভাব নিয়ে আমাদের এই লীলা আস্বাদন করার চেষ্টা করা উচিত। কখনও কখনও যুক্তি, তর্ক ও বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়, কিন্তু তা কেবলমাত্র সাধারণ জনগণের মধ্যে প্রচারের জন্যে, যাঁদের উপলব্ধি নিম্নস্তরের। শুধু যাঁরা যুক্তির নেশায় নেশাগ্রস্ত হয়ে আছেন তাদের কাছে প্রচারের উদ্দেশ্যই আমাদের যুক্তির সাহায্য নিতে হয়। কিন্তু ভক্তি যখন স্বতঃস্ফূর্ত হয়, তা যখন অনুরাগে পরিণত হয়, তখন যুক্তি আর শাস্ত্র দুইই অতলে তলিয়ে যায়। সেখানে শাস্ত্রের তত্ত্ব বা বিচারের কোন স্থান নেই। খানিকদূর পর্য্যন্ত, ভক্তির প্রাথমিক স্তরে বৈধী-ভক্তিকে বিকশিত করার জন্যে যুক্তির প্রয়োজন আছে। কিন্তু তার উপরের স্তরে আর তার কোন প্রয়োজন নেই।

অনুরাগ-ভজন হল স্বতঃস্ফূর্ত্ত, লীলার প্রকৃতি হল সেইরকম — "অহেরিব গতিঃ প্রেমণঃ"। সেইজগতে সবকিছুই শ্রীভগবানের মধুর ইচ্ছায় চলে। মধুর ইচ্ছার অর্থ হল এই যে সেখানে কোন নিশ্চিত ঘটনার স্থান নেই। এই লীলা এমন গতিতে চলে যে আমরা বলতে পারব না 'এবার তা এই পথে যাবে।'

যখন মহীশূরের মহারাজা গাড়ী করে শহরে যেতেন তখন তিনি গাড়ীর চালককে আগে থেকে কিছু বলতেন না বা কোনপথে যাবেন সে বিষয়ে কিছু নির্দ্দেশ দিতেন না। কারণ কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা আগে থেকে করে রাখলে তাঁর জীবন বিপন্ন হতে পারত। কোন রাস্তার মোড়ে যখন তিনি আসতেন তখন হাতের লাঠিটা গাড়ীর চালকের কাঁধের একটা বিশেষ দিকে ছোঁয়াতেন। যদি মোড়ের মাথায় মহারাজ ডানদিকে যেতে চাইতেন তবে লাঠিটা চালকের ডান কাঁধে ছোঁয়াতেন। এইভাবে তিনি আগে থেকে কখনও প্রকাশ করতেন না কোনদিকে যাবেন, কিন্তু একদম শেষ মূহুর্ত্তে চালককে একটা বিশেষ দিকে যাবার সঙ্কেত দিতেন।

সুতরাং কৃষ্ণের চিন্ময় গতিও সুগোপন ও সংরক্ষিত থাকে তাঁরই মধুর ইচ্ছার দ্বারা, 'সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত'। আমরা তাঁর মধুর ইচ্ছার উপরেও অন্য কোন নিয়ম বা আইন খুঁজি, কিন্তু এই চিন্তার মধ্যে

অসঙ্গতি আছে। এই চিন্তা স্ববিরোধী। একদিকে আমরা বলি কৃষ্ণ তাঁর নিজের খুশীমত, তাঁর মধুর ইচ্ছায় চলাফেরা করেন। অন্য দিকে আমরা কোন নিয়মকানুন খোঁজার চেষ্টা করি যা তাঁর গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। এই দুটি চিন্তা পরস্পরবিরোধী। শ্রীভগবানের লীলা তাঁর মধুর ইচ্ছাতেই চলে। যাকে আমরা 'লীলা' বলি তাকে আমরা কোন বিশেষ ছাঁচে ফেলতে পারি না। আমরা বলতে পারি এই লীলা এই বিশেষ স্থানে এইভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারি না যে আজও তা সেই একই পথে যাবে।

এইজন্যেই আমরা বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন লীলার ব্যাখ্যার মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পাই। পুরাণে শ্রীভগবানের লীলার যে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা আছে শ্রীল জীব গোস্বামী তার ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে একসময়ে সেই লীলা শ্রীভগবান একভাবে করেছেন, অন্যসময়ে অন্যভাবে করেছেন। তাই একই লীলার আমরা বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেখি।

পণ্ডিতরা তর্ক তুলতে পারেন যে পদ্মপুরাণে কোন লীলা একভাবে উল্লেখিত হয়েছে আবার ভাগবতপুরাণ তার অন্য বর্ণনা দিয়েছেন? 'হরিবংশ' কেন মহাভারতের থেকে ভিন্ন? আমরা তার উত্তরে বলব ভিন্ন ভিন্ন কল্পে একই লীলার ভিন্ন ভিন্ন রূপ ছিল। **শ্রীভগবান তাঁর কোন বিশেষ লীলা এ জগতে অনন্ত অসংখ্য রূপে দেখাতে পারেন কারণ তিনি অনন্ত, স্বতন্ত্র ও সার্বভৌম। তাই সমস্ত সন্দেহ ও সংশয়কে দূরে সরিয়ে রেখে, অন্তরের সমস্ত বাধানিষেধ থেকে মুক্ত হয়ে, পরম উদারতার সঙ্গে আমরা যেন সেই সার্বভৌমের দিকে এগোতে পারি। এই মনোভাব নিয়ে আমরা তাঁর দিকে এগিয়ে যাব আর উত্তরোত্তর চেষ্টা করব আমাদের পূর্ব্ব কুসংস্কার, পূর্ব অভিজ্ঞতার নজির, পূর্ব অভিজ্ঞতার বিবরণকে পরিত্যাগ করার।**

শ্রীভগবান কি মৃত?

তিনি এখনও জীবিত আছেন এই কথা স্মরণ করেহ আমরা তার কাছে যাব। তাঁর অস্তিত্ব কোন গতানুগতিক ব্যাপার নয়। যা একবার ঘটে গেছে

শুধু সেটাই আশা করা আমাদের উচিত নয়। যদি আমরা একই জিনিস আবার আশা করি তবে সেইরকম পুনরাবৃত্তিতে আমাদের এই বিশ্বাসই হবে যে তিনি কোন জীবিত বস্তু নন, শ্রীভগবানও ইতিহাসের আইনের অধীনে আছেন। আমাদের কি একথা ভাবা উচিত যে অতীতে তিনি নিজেকে কোন এক বিশেষভাবে প্রকাশ করেছেন বলে তিনি বাধ্য সবসময়েই নিজেকে সেই একইভাবে প্রকাশ করতে। আজ কি তিনি বেঁচে নেই? তিনি কি নতুন কিছু দেখাতে পারেন না?

যে কোন মূহুর্ত্তেই তিনি সবকিছুই সম্পূর্ণ নতুনভাবে দেখাতে পারেন। তাই আমাদের হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে খুলে দিতে হবে যখন সেই সর্ব্বোচ্চ লীলার স্তরের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তৃপক্ষের কাছে যাব। তার মানে আমাদের আত্ম-সমর্পণ যেন সীমাহীন ভাবে বৃদ্ধি পায়। আত্মসমর্পণ সীমাহীন আর তাঁর লীলাও সীমাহীন। এইরকমের গভীর দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমরা তাঁর লীলা অধ্যয়ন করার চেষ্টা করব। তাই যদিও ব্রহ্মা, অন্য দেবতারা, গুরুরা এবং শাস্ত্র রচয়িতারা তাঁর লীলার কোন বর্ণনা দিয়ে থাকতে পারেন, তবুও আমাদের বুঝতে হবে কৃষ্ণলীলা তাঁদের বর্ণনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কৃষ্ণ কোন খাঁচার মধ্যে বন্দী থাকেন না।

সেই কারণে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ব্রহ্মা-বিমোহন লীলার বিবরণ দিতে দ্বিধা করেননি। ব্রহ্মা বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন আবার যখন তিনি দ্বারকায় গেলেন কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে তখন আবার সেই অবস্থায় পড়লেন আমরা দেখলাম। অনন্তের মধুর ইচ্ছার সীমারেখা এমনই যে, যে কোন জিনিসেরই স্থান সেখানে হতে পারে, এমন কি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাজীও কৃষ্ণের দ্বারা বিভ্রান্ত হতে পারেন।

সমুদ্রের তীরে আলোকস্তম্ভের মত এইসব লীলা আমাদের পথপ্রদর্শন করছে। ব্রহ্মা আমাদের গুরু, কিন্তু তিনি কৃষ্ণের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। আর বেদব্যাস, যিনি সর্ব্বজগতের গুরু তিনি নারদের দ্বারা তিরস্কৃত হয়েছিলেন। নারদও বহুবার পরীক্ষিত হয়েছেন। এইসব উদাহরণই আমাদের পথ দেখাচ্ছে, আমাদের দিগদর্শন করছে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'শ্রুতিভির বিমৃগ্যাং' (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম শ্রুতিসমূহেরও অন্বেষণীয়

— শ্রীমদভাগবতম ১০/৪৭/৬১) — শ্রুতি অর্থাৎ যা শ্রুত হয়েছে বা শাস্ত্র তাও কৃষ্ণ পাদপদ্মকে অন্বেষণ করছে, উদঘাটিত সত্য সম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ বা শাস্ত্রও কেবলমাত্র দিগদর্শনই করছেন। তাঁরা বলছেন, "এইদিকে যাও।" "এইদিক দিয়ে গিয়ে কোথায় যাব?" তা আমরা ঠিক জানি না, কিন্তু এই দিক ধরে তুমি যেতে পার। তাঁরা কেবল দিগদর্শন করছেন। সমস্ত শ্রুতি ও শাস্ত্রবিজ্ঞরা যে উপদেশ দিচ্ছেন তার মধ্যে কেবল দিগদর্শনই আছে, "এই পথে যাও, এই দিক ধরে, হয়ত তুমি কিছু পাবে।"

কৃষ্ণ বলেছেন "বৈদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো" (অর্থাৎ আমিই সমস্ত বেদের একমাত্র জ্ঞাতব্য তত্ত্ব" — শ্রীমদ্ভগবদগীতা ১৫/১৫)। "আমি যে অনন্ত সেই আমাকে প্রকাশ করাই বেদের উদ্দেশ্য।" সমস্ত বেদ দেখাতে চান অনন্তের গতি কিরকম। যদি আমার হাতের মুঠোয় একটি পরমাণু থাকে তবে আমি তাকে বারবার বিশ্লেষণ করতে পারি আবার পুনপুন: বিশ্লেষণ করতে পারি, যা কোনদিনই শেষ হবে না। এই বস্তু ইতিমধ্যেই আমার হাতের মুঠোয় আছে তবুও তা অনন্ত। তাই বলা হয়েছে যে আত্মসমর্পণ দ্বারাই আমাদের সর্বোচ্চ মঙ্গল হবে। কৃষ্ণ বলেন 'সমস্ত কুসংস্কার ত্যাগ কর আর সীমিত জগতের সীমাকে অতিক্রম করে মনকে মুক্ত কর, মনের দরজা খুলে দাও। তখন শ্রীভগবান যিনি অনন্ত, তিনি সহজেই তোমার আত্মার উপর, তোমার জ্ঞান ও উপলব্ধির উপর সহজেই বিভিন্ন বর্ণের আলোকপাত করবেন। তখন তোমার পক্ষেও সহজ হবে তোমার হৃদয়ের দর্পণকে পরিস্কার করার, তোমার উপলব্ধির স্তরকে পরিশুদ্ধ করার।"

অনন্তের সঙ্গে যোগযুক্ত হলে তুমি দেখবে যে সব জায়গাতেই একটা কেন্দ্র আছে কিন্তু কোন জায়গায় কোন পরিধি নেই। কিন্তু এইটা উপলব্ধি করার জন্যে তোমাকে চেষ্টা করতে হবে যা শাশ্বত যা নিত্য তার মধ্যে বাস করার জন্যে, 'বৈকুন্ঠে' বাস করার জন্যে। 'কুন্ঠা' মানে মাপজোক, হিসেবনিকেশ। বৈকুন্ঠ মানে যেখানে কোন কুটিলতা নেই, সীমা নেই, মাপজোক, হিসেবনিকেশ নেই।

যখন শিশু কৃষ্ণ মুখ হাঁ করেছিলেন তখন তাঁর মুখের মধ্যে সমস্ত সৃষ্টি, সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মান্ড দেখে মা যশোদা আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। তিনি হতভম্ব হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, 'এ আমি কি দেখছি? সমগ্র বিশ্বব্রহ্মান্ড? আমি অন্তের মধ্যে অনন্তকে দেখছি?'' সেইমুহূর্তে তিনি প্রায় মূর্চ্ছা যাচ্ছিলেন কিন্তু সেই সময়ে তাঁর বেড়াল জোরে ডেকে উঠল। আর কৃষ্ণও, যেন তিনি বেড়ালের ডাকে খুব ভয় পেয়েছেন, এইভাবে মা যশোদাকে ভয়ে জড়িয়ে ধরলেন। তখন মুহুর্তের মধ্যে যশোদার আশঙ্কা দূর হয়ে গেল। তিনি ভাবলেন 'ও না, এ তো আমারই ছেলে। অনন্তের প্রতিনিধিতো এ নয়, এ আমারই ছেলে।'' তিনি ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন।

যখন ব্রহ্মা কৃষ্ণের রাখাল বন্ধুদের আর বাছুরদের লুকিয়ে রেখেছিলেন তখন তিনি ভেবেছিলেন তিনি হয়ত কৃষ্ণের লীলায় কোন ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন, কোন অভাব ঘটিয়েছেন। কিন্তু তিনি ফিরে এসে দেখলেন সেই লীলা আগের মতই একইভাবে বয়ে যাচ্ছে। তার কোন অংশে কোন ব্যাঘাত ঘটেনি। কৃষ্ণ স্বয়ং নিজেকে বিস্তার করে সমস্ত হারানো গোপবালক ও সমস্ত হারানো বাছুরের রূপ ধরেছিলেন। যখন কৃষ্ণ স্বয়ং বাছুর ও গোপালকের রূপ ধরলেন তখন গোপবালকদের মাতারা তাঁদের সন্তানদের জন্যে অসীম স্নেহ অনুভব করলেন। সেই স্নেহ এমনই অপূর্ব্ব যে তাঁরা নিজেরাও তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না, বরং মোহিত হয়ে ভাবছিলেন 'আমাদের ছেলেরা, এই গোপাবালকরা কি অপূর্ব্ব সুন্দর!' আর গাভীরাও পাগলের মত তাদের বাছুরদের আদর করছিল। তখন ব্রহ্মা ভাবলেন ''তবে কি সেইসব গোপবালক ও বাছুররা, — যা আমি লুকিয়ে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম তারা কৃষ্ণের সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে?'' ''আবার, যেখানে তাদের লুকিয়ে রেখেছিলেন, সেখানেও খুঁজতে গেলেন। তিনি দেখলেন ''না, পাহাড়ের গুহায় আমি গোপবালকদের ও বাছুরদের লুকিয়ে রেখেছিলাম তারা সেখানেই আছে।'' আবার তিনি কৃষ্ণের কাছে ফিরে এসে দেখলেন সবকিছু আগের মতই আছে। তখন ব্রহ্মা আত্মসমর্পণ করলেন ও নিশ্চিত হলেন। তিনি এই স্তব করলেন,

নৌমীড্য তে ভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংস – পরিপিচ্ছলসম্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু -
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়।।

(শ্রীমদ্‌ভাগবতম্‌ ১০/১৪/১)

অর্থাৎ নিত্যরূপ বর্ণনদ্বারা ব্রহ্মা বললেন, "অভ্র অর্থাৎ মেঘের ন্যায় যাঁর কান্তি, তড়িতের ন্যায় যাঁর অম্বর বা বসন, যাঁর কর্ণভূষণ গুঞ্জা, যাঁর মুখচন্দ্র ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা সুশোভিত, যাঁর গলদেশে বনমালা, যাঁর শ্রীহস্ত দধিমিশ্রিত অন্নগ্রাস ও বেত্র, বিষাণ বেণুদ্বারা চিহ্নিত, যিনি মৃদুপদে গমন করেন, যিনি পশু অর্থাৎ গোপরাজ নন্দের পুত্ররূপে নিত্য বর্ত্তমান, তুমি সেই কৃষ্ণ তোমাকে আমি নমস্কার করি।"

এই শ্লোকের এই হল সাধারণ অর্থ। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য হল, "হে জগদ্বন্দ্য, আমরা আপনার শ্রীচরণে আমাদের স্তব নিবেদন করছি। কে আপনি? আপনি অদৃশ্য, অস্পৃশ্য, অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। কালো মেঘের মত আপনার অঙ্গকান্তি তাই আপনাকে দেখতে পাওয়া কঠিন তবুও আপনার পীত বসনের জন্য আপনাকে দেখা যায়। পীতবর্ণ হল রাধারাণীর বর্ণ (তপ্ত কাঞ্চনের মত যাঁর কান্তি)। তাই শুধু কৃষ্ণের শক্তি (রাধারাণী) দ্বারাই কৃষ্ণকে জানতে পারা যায়। তড়িৎ হল বিদ্যুৎ। বিদ্যুতের আলোতেই রাত্রিবেলা কালো মেঘকে দেখা যায়। তাই যদিও কৃষ্ণ অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় তাঁর শক্তিই তাঁকে আমাদের কাছে প্রকাশ করতে পারেন। ব্রহ্মা বলছেন 'আপনি সেই ভজনীয় তত্ত্ব যাঁকে আমি জানতে পেরেছি। এখন আমি আপনাকে দন্ডবৎ প্রণাম করছি। আপনার অঙ্গকান্তি কৃষ্ণবর্ণ মেঘের মত, তা হল এক রহস্যময় তত্ত্ব। সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ সহজে চোখে পড়ে না। কিন্তু আপনার পীতবসনই আমাদের জানিয়ে দেয় আপনি কে। নারায়ণের পীতবসনের সঙ্গে আপনার বসনের সাদৃশ্য আছে। আপনার কৃষ্ণবর্ণ ও পীতবসন মূর্ত্তিমান নারায়ণের ইঙ্গিত দিচ্ছে। আপনি স্বয়ং অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। কিন্তু আপনার পীত বসন আপনার শক্তি, আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছে।

আর আপনি আমাদের স্তরে অবতরণ করেছেন যেন আপনার স্থান আমাদের মধ্যে। আপনি রাখালবালকের বেশে সজ্জিত হয়ে, হাতে অন্নগ্রাস নিয়ে বনে বনে খেলা করে বেড়াচ্ছেন। এসব দেখে আপনাকে চিনতে আমাদের ভুল হয়ে যায়। আর আপনি সাধারণ জিনিসের আদর করেন। এমন কি আপনি গলায় যে মালা পরে আছেন তাও সামান্য বনের ফুল দিয়ে তৈরী, মনে হয় যেন সামান্য জিনিসের প্রতিই আপনার আসক্তি।

আর এইসব লক্ষণই আমাদের বঞ্চনা করছে। আপনি হাতে একগ্রাস অন্ন নিয়ে গরুবাছুরের পিছনে ছোটেন। এসব তো সামান্য লোকের লক্ষণ। উচ্চবর্ণের লোকেরা, ব্রাহ্মণরা, ক্ষত্রিয়রা কখনও এইভাবে চলাফেরা করবে না বা হাতে অন্ন নিয়ে ছোটাছুটি করবে না। আপনি যে বাদ্যযন্ত্র নিয়ে ঘোরেন, তাও তো সামান্য বাঁশের বাঁশী। আর আপনি মৃদুপদে চলেন। এসবই আমাদের আপনার সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা দিচ্ছে, আপনাকে সামান্য করে দেখাচ্ছে। আপনি নিজেই নিজেকে লুকিয়ে রাখছেন, আপনাকে আমরা কেমন করে চিনব, কেমন করে বুঝব? তাহলে আপনার পরমতত্ত্ব চিনতে না পারার দোষ কি আমাদের? এটা উপলব্ধি করা কঠিন যে আপনি, কৃষ্ণ, সকল বস্তুর প্রভু, আপনি সর্ব্বেশ্বর।

আপনি কত সামান্য অলঙ্কার পরিধান করেছেন। এই বৃন্দাবনে আমরা কোন বহুমূল্য চোখধাঁধানো জিনিস দেখি না। সেসব জিনিস আমরা দেখি বৈকুণ্ঠে। কিন্তু **এখানকার সব কিছুই অভিনব। এখানে আপনি আপনার চপল লীলা দেখাতে এসেছেন। এই বৃন্দাবনে আমরা এক নতুন তত্ত্বের সংস্পর্শে এলাম। এখানে সবকিছুই অপূর্ব্ব, অভিনব, চমৎকার, সবকিছুই সামান্য অথচ অতি মধুর। সামান্য অথচ অতীব চিত্তাকর্ষক।**

কত সামান্য জিনিস দিয়ে আপনি নিজেকে সাজিয়েছেন, অথচ আপনি কি অসামান্য মধুর। এই মাধুর্য্য বোঝাও অসম্ভব, একে বর্ণনা করাও অসম্ভব। সাধারণত এ জগতে রাখালবালকের কোন মর্যাদা নেই। তাদের স্থান সমাজের নীচু স্তরেই। অথচ এই বৃন্দাবনে সেই রাখালবালকের স্থান এমনই অসামান্য, অভিনব ও মধুর যে, সর্ব্বাকর্ষক আপনি আমাদের মোহিত করে রেখেছেন।

আর আপনার চলার গতিও মৃদু অথচ দৃঢ়। আপনার গতিভঙ্গী দেখে বোঝা যায় আপনি এ জগতে কোনকিছুর পরোয়া করেন না। যদিও আপনি সমাজে সামান্য স্থান গ্রহণ করেছেন তবুও আপনার ভঙ্গী দেখেই বোঝা যায় আপনি এ জগতে কোন কিছুর পরোয়া করেন না। আপনার মধ্যে আমরা দেখি পরমতত্ত্ব এক সামান্য রূপে সজ্জিত — কিন্তু তা খুব অপূর্ব্ব অভিনব, পরম সুন্দর রূপে সজ্জিত। আপনার সঙ্গে যোগযুক্ত হলে সামান্য জিনিসও অসামান্য মধুর হয়ে যায়। যদিও আমি সৃষ্টিকর্ত্তা এবং এ জগতে সবকিছু সৃষ্টি করেছি, তবুও আমি এইরকম সৃষ্টির মমার্থ বুঝতে অসমর্থ। এ জগতে বহু কিছু সৃষ্টি করেছি বলে আমার অহংকার আছে, কিন্তু এই বৃন্দাবনের বাতাবরণের সৌন্দর্য্য দেখে আমি অভিভূত হয়ে গেছি। এখানে আপনার পদক্ষেপ, আপনার গতিভঙ্গী মৃদু অথচ দৃঢ় এবং পরম সুন্দর। এখানে হয়ত আপনি গোপবালক, সমাজে বা শাস্ত্রে যাদের খুব উঁচু স্থান দেওয়া হয়নি, কিন্তু আপনার ব্যক্তিত্বের বিশেষত্ব হল এই যে, যাই আপনি করেন তাই সর্ব্বোচ্চ স্থান পায়। এ কি অপূর্ব্ব তত্ত্ব! আপনি যেই হোন না কেন আপনার কাছে আমার অহংকার পরাজিত হয়েছে। আমি আপনার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় নিলাম, আমি আত্মসমর্পণ করলাম। আপনি কৃপা করে আমাকে সাহায্য করুন যেন আমি আপনার প্রকৃত স্বরূপ বুঝতে পারি।"

এইভাবে ব্রহ্মা আত্ম-সমর্পণ করলেন। সুতরাং কৃষ্ণ হলেন বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তারও উপলব্ধির অগম্য। তিনি অনন্ত। শুধু আয়তন বা ব্যাপকতার ধারণাতেই তিনি অনন্ত নন, কালের ধারণাতেও তিনি অনন্ত, সর্বরকমের ধারণাতেই তিনি অনন্ত। তাঁর অনন্ত শক্তি, চেতনার মধ্যে, অস্তিত্বের মধ্যে চিন্ময় প্রেমের আদানপ্রদানের মধ্যে প্রকাশিত হচ্ছে।

পরম মাধুর্য্য

শ্রীভগবান যিনি অনন্ত, শাস্ত্র তাঁর সম্বন্ধে তিনটি তত্ত্ব দিয়েছেন — ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান। অনন্তের সর্ব্বব্যাপী তত্ত্ব হলেন ব্রহ্ম। যা কিছু আমরা ধারণা করতে পারি সবই তার মধ্যে রয়েছে। পরমাত্মা হলেন ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম — "অণোঃ অণীয়াং" — "অণু থেকে সূক্ষ্ম" —

(শ্রীমদ্ভগবতগীতা ৮/৯)। আর ভগবান হলেন অনন্তের স্বরূপ। শ্রীভগবানের স্বরূপ দুই রূপে আছে, একদিকে তাঁর অনন্ত ঐশ্বর্য্যময় স্বরূপ, অন্যদিকে তাঁর পরম মাধুর্য্যময় স্বরূপ **শ্রীল জীব গোস্বামী তাঁর 'শ্রীভক্তিসন্দর্ভ' গ্রন্থে 'ভগবানে'র মূল অর্থ বা অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য কি তা বলেছেন। তিনি বলেছেন ভগবান হলেন "ভজনীয় সর্ব্ব - সদ্‌গুণ বিশিষ্ট।" 'ভগবান' বলতে তিনি অনন্তের এই দিকটা দেখিয়েছেন যে ভগবান হলেন ভজনীয়। ভগবান হলেন অনন্তের সেইস্বরূপ, যাঁর সংস্পর্শে এলে আমরা তাঁর সন্তোষের জন্যে নিজেদের নিবেদন করতে চাই। অনন্তের বহু রূপ আছে। কিন্তু অনন্তের সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব হল এই যে তিনি "ভজনীয় সর্ব্ব-সদ্‌গুণ-বিশিষ্ট।" তিনি এতই সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক যে তিনি সকলের চিত্তকে আকর্ষণ করেন তাঁর শ্রীপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করার জন্যে। অনন্তের অন্য কোন তত্ত্ব, তা ব্যাপকতারই হোক, বা কালেরই হোক অথবা অন্য যাই হোক না কেন তা অনন্তের এই সর্বোচ্চ, এই সর্ব্ব আশ্চর্য তত্ত্বের কাছে ঘেঁষতে পারে না। অনন্তের অন্য সমস্ত তত্ত্বই, যেমন অনন্ত কাল, অনন্ত ব্যাপ্তি অনন্ত শক্তি — সবই বাহ্যিক। কিন্তু অনন্ত অসীম প্রেম যা জীবের প্রেম ও আত্মনিবেদনকে আকর্ষণ করে তাই হল অনন্তের সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব। আর কৃষ্ণ হলেন তাই।**

সর্ব্বত্রই আকর্ষণই হল সবচেয়ে মূল উপাদান। যদি আকর্ষণ ও প্রেমের সংস্পর্শে আমরা আসি তবে অন্য সবকিছুকেই পরিত্যাগ করা যেতে পারে বা ভুলে যাওয়া যেতে পারে। যখন আমরা প্রেমের সঙ্গে যোগযুক্ত হই তখন অন্য সবকিছুকেই অবহেলা করা যেতে পারে। আমাদের অস্তিত্বের, সর্ব্ব অস্তিত্বের, সবকিছুর পরিপূর্ণতা হল প্রেমে। সমস্ত অস্তিত্বের একমাত্র পরিপূর্ণতার কেন্দ্রে রয়েছে প্রেমের তত্ত্ব। অস্তিত্বের মূল সারাংশই রয়েছে সেখানে, আমাদের মূল অস্তিত্বের অন্য কোন দিক তাকে উপেক্ষা করতে পারে না বা তার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। **এই প্রেমের তত্ত্বই হল পরম তত্ত্ব এবং অপরাজেয়।**

যে কোন অভিজ্ঞতাই আমাদের হোক না কেন পরিপূর্ণতার মূল প্রয়োজন যা তা তাই থাকে, আর তা হল প্রেম। সবকিছুর একচ্ছত্র রাজাধিরাজ হল

প্রেম। তার সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা হতে পারে না। প্রেমের নীতির সঙ্গে যদি বিরোধ হয়, তবে সেখানে সকলকেই পরাজয় স্বীকার করতে হবে। মহাপ্রভু দেখিয়ে দিয়েছেন যে এই প্রেমই হল এ জগতের সবচেয়ে সারবান বস্তু।

মধ্বাচার্য্যের যে ধারণা ছিল যে আচার্য্যকে কি দৃষ্টিতে দেখা উচিত তা ব্রহ্মা-বিমোহন লীলার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে নি। কারণ, আর যাই হোক না কেন ব্রহ্মা হলেন আমাদের সম্প্রদায় গুরু, ব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ের আদি গুরু। তাই মধ্বাচার্য্য শ্রীমদভাগবতম থেকে ব্রহ্ম-বিমোহন লীলার দুটি অধ্যায় বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু মহাপ্রভু তা করেননি। তিনি বিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈত বাদ অনুযায়ী শ্রীধর স্বামী শ্রীমদভাগবতমের যে সংস্করণ করেছেন তাকে গ্রহণ করেছেন। বিষ্ণুস্বামী সম্প্রদায় রাগমার্গকে অনুসরণ করেন। শ্রীধর স্বামী ঐ দুটি অধ্যায় শ্রীমদভাগবতমের অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তাঁর টীকা সমেত আর মহাপ্রভু তাকে স্বীকার করেছেন — শ্রীচৈতন্যচরিতামৃততে এই তথ্যের প্রমাণ রয়েছে। মধ্বাচার্য্য এই ধারণাকে স্বীকার করতে পারেননি যে গুরুও মোহিত হতে পারেন। তিনি এই ধারণাকে গ্রহণ করতে পারেননি যে গুরুও সবকিছু না জানতে পারেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ নাও হতে পারেন, কিন্তু মহাপ্রভু তা পেরেছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভক্তপরাধীন শ্রীভগবান

প্রেমের ক্ষমতা হল অচিন্ত্যনীয়। যদিও তা অসম্ভব, তবুও সেখানে অনন্ত অন্তের কাছে পরাজিত হন। এই অচিন্ত্যনীয় অবস্থাটা কি? কেবল প্রেমের দ্বারাই তাঁকে পাওয়া যায়। আর কি মূল্যবান, কি অমূল্য, কি পূজনীয়, কি আদরণীয় সেই প্রেম! সেই চিন্ময় প্রেমের একবিন্দু পাওয়ার জন্যে কোন আত্মত্যাগই যথেষ্ট নয়। তাই আমাদের 'বাঁচার জন্যে মরতে' প্রেরণা দেওয়া হয়েছে।

এই ধারণাটা বোঝা যাবে এই উপলব্ধির দ্বারা যে আমরা শ্রীভগবানের পিতৃরূপের পূজারী নই। আমরা তাঁর পুত্ররূপের পূজারী। আমরা বাৎসল্য রসের পূজারী। তাঁকে আমরা সৃষ্টিকর্ত্তা বলে, ঈশ্বর বলে পূজা করি না, যেখানে তিনি এক ঘনিষ্ঠ পরিধির বাইরে আছেন। কিন্তু তাঁকে আমরা সন্তানরূপে পূজা করি। যেখানে তিনি এক ঘনিষ্ঠ পরিধির কেন্দ্রে আছেন। তিনি বিশ্বের পরিধিতে নেই, তিনি বিশ্বের কেন্দ্রে আছেন। এমন নয় যে তিনি কেবল একদিক থেকে সবকিছু সরবরাহ করছেন, তিনি কেবল নেপথ্যে থেকে সবকিছু সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। না তা নয়, তিনি সবকিছুর কেন্দ্রে আছেন। তাই হল শ্রীমদভাগবতমের তত্ত্ব — প্রথমে বাৎসল্য, তারপরে মাধুর্য্যরস, এক উচ্চতর চিন্ময় অভিব্যক্তি সেখানে পাওয়া যায়। তিনি সেখানে সবকিছুর কেন্দ্রে আছেন আর তাঁর সমস্ত অংশ ও সৃষ্টি তাঁর থেকে উদ্ভূত হচ্ছে। তাই **পরব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের যে ধারণা বা তত্ত্ব, সেখানে তাঁর পিতা তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করছেন, তাঁর মাতা তাঁকে গালিগালাজ করছেন, শাস্তি দিচ্ছেন, এবং দেখা যাচ্ছে তিনি তাঁর প্রিয়ার পদতলেও**

পতিত হচ্ছেন। তাহলে আর গুরুর কথা কি, মনে হয় যে শ্রীভগবান নিজেই তার চরম আসন সম্বন্ধে বিভ্রান্ত হন।

আর তা কেন হয়? প্রেমের জন্যে। তাহলে এই চিন্ময় প্রেম কি অমূল্য জিনিসই বটে! মুক্তির পরে, হিসেবী ভক্তির ওপারে, সমস্ত সৃষ্টির সর্ব্বোচ্চ স্তরে এই শ্বাশ্বত প্রেমেরই একচ্ছত্র রাজত্ব। আর এই চিন্ময় প্রেম তাঁর থেকেই উদ্ভূত হয়, যেমন সূর্যরশ্মি সূর্য থেকে উদ্ভূত হয়।

সুতরাং তিনি কেন্দ্রে আছেন আর তাঁর অংশ কলা তাঁর চারদিকে আছে। একদিকে বলদেব অস্তিত্বের শক্তি সরবরাহ করছেন। অন্তরালে থেকে সবকিছুকে পালন করছেন, আর আনন্দের দিকটা নিয়ন্ত্রণ করছেন শ্রীভগবানের শক্তি শ্রীমতী রাধারাণী, স্বতন্ত্র ভগবান যাঁর হাতের মুঠোয় খেলনার মত।

এ হল অচিন্ত্যনীয়, ধারণাতীত। কিন্তু শ্রীভগবানের প্রকৃতিই হল এইরকম। শ্রীভগবান বলেন "অহং ভক্তপরাধীনো" (শ্রীমদভাগবতম ৯/৪/৬৩) 'হ্যাঁ আমি স্বেচ্ছায় আমার ভক্তদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছি। সেখানে আমার নিজের কোন স্বাধীনতা নেই। আমার প্রতি আমার ভক্তদের আচরণ এমনই চমৎকার যে তাই আমাকে তাদের বশীভূত করে ফেলে।' চিন্ময় প্রেম এতই মধুর যে তাকেই জীবনের চরম প্রয়োজন বলে মনে করা হয়। আর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে স্বয়ং এসেছিলেন পৃথিবীতে এই সংবাদ প্রচার করার জন্যে।

প্রেমের সমুদ্র

কেবল অমৃতের স্তরেই আমরা সেই চিন্ময় জীবনের স্বাদ পেতে পারি। সেই প্রেমসমুদ্রের তরঙ্গে যেন আমরা বাস করতে পারি এই হল আমাদের জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য।

সেই চিন্ময় জগতে আমাদের নিজস্ব ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করা যাবে। এমন কোন কথা নেই যে যদি আমরা চেতনার গভীরে ডুব দিই তাহলে আমাদের ব্যক্তিত্বকে, আমাদের নিজস্বতাকে হারাতে হবে। তার কোনই প্রয়োজন নেই। তবুও এই চিন্ময় প্রেমের প্রকৃতিই হল এমন যে তুমি থাকবে, কিন্তু

তুমি শুধু তাঁর জন্যেই থাকবে, তাঁর সেবার জন্যে তুমি নিজেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রাখবে। এ এক অপূর্ব্ব জিনিস যে তুমি কৃষ্ণের আনন্দের জন্যে নিজের ব্যক্তিত্বকে বজায় রাখতে পার। কিন্তু তোমার যেন কোন স্বার্থপর উদ্দেশ্য না থাকে, কোন অন্য অভিলাষের ধারণা যেন না থাকে। সেই জগতে মিশ্রিত হওয়া কোন শারীরিক বা জড়ীয় মিশ্রণ নয়, যেখানে বৈচিত্র্যকে হারাতে হবে। কিন্তু এই মিশ্রণ সম্বন্ধে শ্রীমদভাগবতমে বলা হয়েছে —

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ।।

(শ্রীমদ্‌ভাগবতম ১১/২৯/৩৪)

অর্থাৎ "যে কালে মনুষ্য সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করে, তৎকালে বিশিষ্ট-কর্ত্তৃরূপে গণ্য হয়ে অমৃতত্ব লাভ করে আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়ে থাকে।" "অর্থাৎ যিনি জন্মমৃত্যুর অধীন তিনি তখনই অমৃতত্ব লাভ করেন যখন তিনি সমস্ত জড়কর্ম্ম ত্যাগ করেন ও আমার আজ্ঞা পালনের জন্যে নিজেকে নিবেদিত করেন, ও আমার উপদেশ অনুযায়ী কাজ করেন। এইভাবে তিনি আমার সঙ্গে প্রেমের আদানপ্রদান করে যে চিন্ময় আনন্দ পাওয়া যায় তা উপভোগ করার অধিকারী হন।"

আর ভগবতগীতায় কৃষ্ণ বলেছেন —

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।।

(শ্রীমদ্‌ভগবতগীতা ১৮/৫৫)

"অর্থাৎ, (আমার ভক্ত) সেই পরাভক্তি প্রভাবে আমার ঐশ্বর্য্যময় ও মাধুর্য্যময় স্বরূপদ্বয় সম্যক্ জানতে পারেন এবং তৎপর স্বরূপগত সম্বন্ধজ্ঞান উপলব্ধি করে আমার অভিন্ন-স্বরূপ অন্তরঙ্গ পরিকরগণ মধ্যে প্রবেশ লাভ করেন।"

অর্থাৎ 'একমাত্র প্রেম ও ভক্তির দ্বারাই আমার স্বরূপ উপলব্ধি করা যায়। তাই আমাকে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করে তুমি আমার পরিকরগণের মধ্যে প্রবেশ করতে পার।'

এই "মিশ্রণ"কে কৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন "তারা আমার মধ্যে প্রবেশ করে আমারই পরিবারের সদস্য হবার জন্যে। আমার পরিবারবর্গ, বন্ধুমন্ডলীর মধ্যেই তিনি প্রবেশ করেন — বিশতে তদনন্তরম্।" শ্রীভগবানের পরিবারে প্রবেশ করা এক জীবন্ত মিশ্রণ, তা ব্রহ্মে প্রবেশ করার মত কোন শারীরিক বা মৃত মিশ্রণ নয়। চিন্ময় প্রেমের হল এই পরিণাম।

এই লক্ষ্য বা আদর্শ ব্রহ্মের একত্বের সঙ্গে মিশে যাওয়ার যে সাধারণ ধারণা তার অনেক উপরে। সেই ব্রহ্মতে বিলীন হওয়ার ধারণা হল এমন যে, যেন কেউ চেতনার সমুদ্রে হারিয়ে যায়, যেন কোন গভীর নিদ্রার মধ্যে তলিয়ে যায়। তাতে আমাদের কোন আগ্রহ নেই। বরং কৃষ্ণ ভাবনামৃতের মাধ্যমে আমরা মাধুর্য্যের সমুদ্রে সাতার কেটে হারিয়ে যেতে চাই। এই তত্ত্বকেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গ্রহণ করেছেন।

ভক্তির জয়

একদা রাধারাণী যখন রাসলীলায় দেখলেন যে কৃষ্ণ সব গোপীদের সঙ্গে সমান ব্যবহার করছেন তখন তিনি সেই রাসলীলা পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। এই সকলের সঙ্গে একই ব্যবহার তাঁকে সন্তুষ্ট করেনি। তখন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে তিনি এক অভূতপূর্ব সঙ্গীত ও নৃত্য রচনা করে এক অপূর্ব চিন্ময় রসে কৃষ্ণকে তৃপ্ত করবেন, তাঁকে আনন্দ দেবেন। রাধারাণী নানাভাবে তাঁর দক্ষতা প্রদর্শন করলেন আর তারপর হঠাৎ শেষমূহুর্তে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আর কৃষ্ণ যখন সেই নৃত্যগীতে মগ্ন ছিলেন তখন হঠাৎ তিনি আবিস্কার করলেন যে রাধারাণী সেখানে আর উপস্থিত নেই। তাই তিনি সবাইকে ছেড়ে রাধারাণীকে খুঁজতে গেলেন। পথে তিনি আবার রাধারাণীকে খুঁজে পেলেন আর তখন তাঁরা দুজনে সেই পথে চললেন। খানিকক্ষন চলার পরে রাধারাণী বললেন, "আমি

খুব ক্লান্ত, আমি আর চলতে পারছি না। তুমি যদি আরও যেতে চাও, তবে আমাকে তুলে নিয়ে চল। কারণ আমি আর যেতে পারব না।" তখন হঠাৎ কৃষ্ণ অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদের একজন শিষ্য তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন যে কৃষ্ণ কেন সেইসময় হঠাৎ ঐভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। কিন্তু আমাদের গুরুমহারাজ (শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর প্রভুপাদ) এই প্রশ্ন শুনে খুব ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে এই লীলায় কৃষ্ণ রাধারাণীর প্রতি একটু অবহেলা দেখিয়েছিলেন। তাই আমাদের গুরুমহারাজ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ প্রকৃতি অনুযায়ী, এইরকম প্রশ্ন শোনাটাও অসহ্য মনে করেছিলেন। রাধারাণীর প্রতি তাঁর এতই পক্ষপাতিত্ব ছিল যে তাঁর বিরুদ্ধে কোন কিছু শুনতে প্রভুপাদ রাজী ছিলেন না। সুতরাং তিনি একটু উত্তেজিত হয়েই উত্তর দিলেন 'এখানে কি তুমি কোন ভক্তি পেয়েছ? কি ভক্তি তুমি এখানে পেয়েছ যার জন্যে তুমি আমাকে এই প্রশ্ন করলে?' সুতরাং এই প্রশ্নটাকেই তিনি কোন স্বীকৃতি দিলেন না। এই লীলা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নও তিনি সহ্য করতে পারেন নি।

এই খবর যখন আমার কানে এল তখন আমি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর শ্রীমদভাগবতমের নিজস্ব অনুবাদ — 'ভাগবতার্ক-মরিচী মালা'য় তিনি নিজে শ্রীমদভাগবতমের এই শ্লোক সম্বন্ধে কি লিখেছেন সে বিষয়ে খোঁজখবর নিলাম। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই শ্লোকে যে সমস্যা আছে তাকে সুসঙ্গতি দিয়েছেন। তিনি ব্যাখ্যা করেছেন যে কৃষ্ণ ভেবেছিলেন, 'আমার বিরহে রাধারাণীর মধ্যে কি ভাব আসে আমি দেখতে চাই।' শুধু তাঁর অনুপস্থিতিতে রাধারাণীর বিরহের গভীরতাকে উপলব্ধি করার জন্যেই কৃষ্ণ অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলেন এবং তারপরে কৃষ্ণ অবশ্যই খানিকক্ষন পরে ফিরে এসেছিলেন।

কিন্তু আমাদের গুরুমহারাজ, শ্রীল প্রভুপাদ এই বিষয়বস্তুটাই সহ্য করতে পারেন নি। 'কি ভক্তি এখানে পাওয়া গেছে?' — এই ছিল তাঁর প্রশ্ন। কিন্তু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই লীলার ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই যে তার বিরহে রাধারাণী কি প্রেমসুখ অনুভব করবেন তা দেখার জন্যে কৃষ্ণ বড়ই

ব্যাকুল হয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে শ্রীভগবান কিভাবে তাঁর ভক্তের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন এটি তারই একটি উদাহরণ। তাই আমরা দেখি যে শ্রীভগবানের সেবিকা, যিনি অপরিপূর্ণের ভূমিকা নিয়েছেন সেই শ্রীমতী রাধারাণী এতই শক্তিমতী যে তাঁর কাছে কৃষ্ণ, যিনি পূর্ণব্রহ্ম, তিনি অসহায় হয়ে গেছেন। এর থেকে মনে হয় যে যিনি পূর্ণব্রহ্ম তিনি নিজের স্বতন্ত্রতা হারিয়ে ফেলেছেন, তাঁর আর কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। এই হচ্ছে প্রেমভক্তির জয়।

অপরিপূর্ণতার মাধ্যমে ভক্তি প্রকাশিত হয়, তা পূর্ণব্রহ্মকে আকর্ষণ করে। যেন ফলের মধ্যে রস আছে আর কেউ আছে যে সেই ফল থেকে রসকে নিংড়ে নেবে। সর্ব্বোচ্চ ভক্তি সেখানেই পাওয়া যায় যেখানে এই রস-নিস্কাসনের সর্ব্বাধিক তীব্রতা দেখা যায়। সেখানেই ভক্তের জয় যেখানে ভগবান তাঁর ভক্তের কাছে হার স্বীকার করেন। এর দ্বারাই সত্যিকারের ভক্তি, আত্মত্যাগ ও আত্মসমর্পণের উপস্থিতি উদ্‌ঘাটিত হয়।

প্রেমময় ভগবান — প্রেমের দেবতা

আত্মসমর্পণের এমনই ক্ষমতা যে তা ভগবানকেও বন্দী করে ফেলতে পারে। সেইরকম শক্তির জন্যেই আমরা আগ্রহী, অনুপ্রাণিত। এইরকম শক্তি যাঁদের আছে তাঁরাই সর্ব্বেসর্ব্বা, তাঁরা আমাদের প্রভু। আমাদের সর্ব্বোচ্চ স্বার্থের জন্যে আমাদের সেইদিকেই দৃষ্টি দেওয়া উচিত যেখানে এই শক্তির তীব্রতা আছে। যেখানে আমরা ঘণীভূত আত্মসমর্পনকে খুঁজে পাব সেদিকেই আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। আমাদের লক্ষ্য যেন সেদিকেই থাকে। তারই ভিখারী আমরা। এই জড়জগতে যা কিছু পাওয়া যায় তার কোনকিছুর ভিখারী আমরা নই — "ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং" — কিন্তু সবকিছু বর্জন করে আমাদের লক্ষ্য যেন একদিকেই থাকে — তা হল প্রেমময় ভগবানের তীব্রতম চিন্ময় সেবা।

আমাদের সর্ব্বস্বকে আমাদের এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত করতে হবে যে তা যেন সেই অজানা দিকে চলে যেতে পারে, যে দিক আমাদের মনঃকল্পিত বস্তু বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার গন্ডীর বাইরে — যেমন মহাশূন্যে রকেট

ছোড়া হয়। শ্রীমদভাগবতমে, যেখানে সমস্ত শাস্ত্রের সারমর্মকে উদ্‌ঘাটিত করা হয়েছে, — সেখানে বলা হয়েছে যে চিন্ময় প্রেমই সবচেয়ে আকাঙ্খিত বস্তু ও আদি বস্তু। ইতর আকাঙ্খার পরিতৃপ্তির জন্যে আমরা যেন নিজেদের এদিকে ওদিকে ছোটাছুটি না করতে দিই। আমাদের অবশ্যই, দরকার হলে জোর করেই এই চিন্ময় প্রেমের প্রতি মনোনিবেশ করতে হবে। চিন্ময় প্রেমই আমাদের জন্যে সর্ব্বোচ্চ বস্তু, সমস্ত সৃষ্টির জন্যে তা সর্ব্বোচ্চ বস্তু, নিত্যকালের জন্যে তা সর্ব্বোচ্চ বস্তু।

আর যদি আমরা মনে করি দৈন্যময় অপরিপূর্ণতার মধ্যেই আমাদের স্থান তবে কৃষ্ণের সর্ব্বোচ্চ সেবাস্থানে আপেক্ষিকভাবে অবস্থান করার জন্যে সেই হবে যথার্থ পন্থা। শ্রীল প্রভুপাদ একসময় একটি কবিতা রচনা করেছিলেন এই যথার্থ মনোভাবকে ব্যক্ত করে।

মাতল হরিজন বিষয় রঙ্গে।
পূজল রাগপথ গৌরব ভঙ্গে।।

চিন্ময় প্রেমের পথ আমাদের আরাধনার বস্তু আর তাকেই সর্ব্বোচ্চ প্রেরণার বিষয় মনে করে আমাদের তা শিরোধার্য্য করা উচিত।

তিনি আদেশ করেছিলেন তার জন্যে গোবর্দ্ধনে একটি কুটীর করে দিতে। তিনি বলেছিলেন, "আমি ওখানেই থাকব। রাধাকুন্ডে থাকার যোগ্য আমি নই। তাই আমি তার চেয়ে নিম্নস্থানে থাকব। কিন্তু আমার গুরুবর্গ — শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও অন্যান্যরা — তাঁদের ক্ষমতা আছে ঐখানে সেবা করার। তাই আমি সেই রাধাকুন্ডে গিয়ে সেখানে তাঁদের সেবা করব। তারপর এই অপেক্ষাকৃত নিম্নতর স্থানে, এই গোবর্দ্ধনে ফিরে আসব। এখানেই আমি থাকব। এক চিন্ময় আত্মবাদী জগতে একটি সেবাময় আত্মবাদী স্থান পাওয়ার জন্যে এই হল যথার্থ পন্থা।

তা না হলে যদি আমরা মনে করি আমরা ইতিমধ্যেই সর্ব্বোচ্চ স্থানে আছি তবে সেই সর্ব্বোচ্চ সত্য আমাদের কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবেন। কেবলমাত্র কোন নিম্নস্থান থেকেই আমরা সেই সর্ব্বোচ্চ স্তরকে শ্রদ্ধার

সঙ্গে দর্শন করতে পারি। কিন্তু যখনই আমরা মনে করব আমরা সেই সর্ব্বোচ্চ স্থানকে অধিকার করে ফেলেছি, আমরা ইতিমধ্যেই সেখানে আছি — তখন বুঝতে হবে আমরা কোথাও পৌঁছাইনি। সেই উচ্চতর জগতের প্রকৃতি হল এইরকম। তাই আমাদের একটা সম্মানজনক দূরত্ব বজায় রাখা উচিত। যদি আমরা প্রতক্ষ্যভাবে দর্শন করার চেষ্টা করি, তবে আমরা সেই চিন্ময় বস্তুকে হারাব। কিন্তু যদি আমরা সেই চিন্ময় স্তরকে পর্দ্দার আড়াল থেকে অথবা কোন গুপ্ত স্থান থেকে দেখার চেষ্টা করি তবে হয়ত আমরা তাঁকে দেখতে পাব। এ খুবই অদ্ভুত, আশ্চর্য্য ব্যাপার। উচ্চতর জগতের বস্তুর সঙ্গে যদি আমরা প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ করতে চাই তবে তা আমাদের অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। কেউ যদি কোন কিছুর প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে না আসতে পারে তাহলে সে গোয়েন্দার দ্বারা বা গুপ্তচরের দ্বারা হয়ত কিছু জানতে পারে, — এটা অনেকটা সেই গুপ্তচরবৃত্তির মত। একে প্রত্যক্ষভাবে জানা অসম্ভব। শুধু পর্দ্দার আড়াল থেকেই আমরা একটা আভাস পেতে পারি। এইভাবে আমরা সেই সর্ব্বোচ্চ তত্ত্বকে অনুভব করতে পারি। সেই সর্ব্বোচ্চ সত্য যেন দৈবক্রমে আমাদের কাছে আসেন, তিনি সহসা আমাদের গ্রহণ করেন, আর তখন আমরা তাঁকে খুঁজে পাই। তিনি পূর্ণব্রহ্ম, তিনি স্বৈরাচারী, তিনি স্বতন্ত্র, যখনই তিনি স্বেচ্ছায় আসেন আমাদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটাবার জন্যে তখনই আমরা সেই যোগাযোগকে পাই। এ জিনিস কখনই আমাদের হাতের মুঠোয় নেই। সরাসরি আমার অধীনে আসার বস্তু তিনি নন। তিনি সর্ব্বদাই উপরে আছেন।

এই পন্থায় আমরা সর্ব্বোচ্চ উপলব্ধির স্তরে আসতে পারি। রাধা-গোবিন্দের সর্ব্বোচ্চ লীলায় কৃষ্ণ যখন রাধারাণীকে কিছু করতে বলেন তখন রাধারাণী তা করতে অস্বীকার করেন, তিনি বলেন, 'না, আমি তা করব না।' তবুও তা আত্মনিবেদিত ভক্তির সর্ব্বোচ্চ ভাব বলে স্বীকৃত হয়েছে। কৃষ্ণ যা চান তাঁকে তা দিতে অস্বীকার করার রাধারাণীর এই যে মনোভাব — এর নাম বাম্যভাব। আর রাধারাণী এই বাম্যভাবে পরিপূর্ণ। কিন্তু এতে কৃষ্ণের আগ্রহ, তাঁর সঙ্কল্প আরও বেড়ে যায়। এই সমস্ত পন্থাটাই

এক বক্র কুটিল পন্থা। তবুও চরম অকিঞ্চনের পরম তত্ত্বের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটাবার জন্যে এই পন্থাকে উপযুক্ত বলে মনে করা হয়েছে। এ এক অপূর্ব্ব চমৎকার কৌশল। প্রত্যক্ষ বা মুখোমুখি লেনদেন এখানে নেই। এই সমস্ত ব্যাপারটাই একটা চোরা ব্যাপার। এখানে সবকিছুই সম্পন্ন হচ্ছে লুকোচুরি করে, চোরের মত। সর্ব্বোচ্চ স্তরে, স্বৈরতন্ত্রের রাজত্বে, সবকিছুই একেবারে চোরা কারবার, সম্পূর্ণ কালোবাজারি। আর সেইজন্যে তাকে 'অপ্রাকৃত' বলা হয়েছে — সর্ব্বনিম্ন স্তরের বস্তুর মত। আমাদের বর্ত্তমান জীবনধারণের যে প্রকৃতি তাতে আমরা স্বৈরতন্ত্রকে সহ্য করতে পারি না। একে আমরা চরম ইতর অবস্থা মনে করি। কিন্তু সর্ব্বোচ্চ জগতে স্বৈরতন্ত্র আছে। তাই তাকে 'অপ্রাকৃত' বলা হয়; সেই চিন্ময় জগতের সর্ব্বোচ্চ এলাকা যা সবকিছুর সমন্বয় সাধন করতে পারে।

সেই জগতের সুন্দরতা হল এইখানে যে এখানে যাকে চরম ইতর বলে মনে করা হয় সেখানে তার সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। সেখানকার সমন্বয় সাধনের শক্তি এমনই মহান ও অসাধারণ যে এখানে যা অবাঞ্ছিত, জঘন্য ও খারাপ, সেখানে তার এমন সমন্বয় করা হয়েছে যে তাই সেখানে সর্ব্বোচ্চ স্থান পায়। কৃষ্ণের অদ্ভুত, অভিনব ক্ষমতা হল এমন যে যা সর্ব্বনিম্ন তাও তাঁর মায়াবী স্পর্শে সর্ব্বোচ্চ বলে প্রমাণিত হয়। যেহেতু তিনি সেখানে আছেন তাই কোন দাগই সেখানে দাগ নয়, সবই অকলঙ্ক। কৃষ্ণ ভাবনামৃত হল কৃষ্ণেরই স্পর্শ, তা হল সর্ব্বোচ্চ ও সুন্দর। ঠিক যেমন স্পর্শমণি যে শুধু রূপাকে সোনা তৈরী করবে তাই নয়, তা লোহা, সীসা বা অন্য কোন নিম্নস্তরের জিনিসকেও সোনা করে তুলবে। কৃষ্ণের স্পর্শমণি এমনই শক্তি ধরে যে কোন ইতর জিনিস যা আমাদের ধারণায় আসতে পারে তাই তাঁর মায়াবী স্পর্শে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে।

শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী বলেছেন যে এই সত্যকে স্বীকার করার ক্ষমতা যদি তোমার না থাকে তবে তোমাকে বৈকুণ্ঠে নিক্ষেপ করা হবে। যাও সেখানে যাও, যেখানে সাধারণ নিয়ম চলে, যেখানে সব লেনদেনই ন্যায্য লেনদেন। সেই ন্যায্য লেনদেনের দেশে, সেই সহজ লেনদেনের দেশে নেমে যাও যেখানে তুমি হিসেব নিকেশ করে থাকতে পারবে, আর সেখানে তুমি সুখে জীবন কাটাতে পারবে।"

এক রাখাল বালক

কিন্তু বৃন্দাবনের উচ্চতর চিন্ময় জগত খুবই কূটনৈতিক জায়গা। এই বৃন্দাবনকে বুঝতে গিয়ে মহাদেব আর ব্রহ্মাও বিভ্রান্ত হয়ে যান। কৃষ্ণের দ্বারাই বিভ্রান্ত হন। ব্রহ্মা তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন ও স্বীকারোক্তি করেছিলেন, আমি কি করে জানব যে পরম তত্ত্ব হলেন এক রাখাল বালক যিনি একহাতে অন্ন আর বগলে একটা লাঠি নিয়ে তার বন্ধুদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন?' ব্রহ্মা বললেন আমার পিতা নারায়ণের সঙ্গে আমার কিছু ঘনিষ্ঠতা আছে; যখনই আমি কোন অসুবিধায় পড়ি তখনই তার কাছে এসে কিছু উপদেশ নিই ও সেইমত কাজ করি। কিন্তু এইরকম কোন পরমব্যক্তির সঙ্গে আমার কখনও যোগাযোগ হয়নি যিনি এক রাখাল বালক এবং যিনি একহাতে অন্ন নিয়ে আর এক হাতে লাঠি নিয়ে তাঁর বন্ধুদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন, তিনিই সর্ব্বোচ্চ? এ অচিন্ত্যনীয়। কিন্তু এখন আমি দেখছি যে আপনি আমার পিতা নারায়ণের অনেক উপরে। আমরা জানি যে বৈকুণ্ঠ এক ন্যায্য ও বিধিসঙ্গত ক্ষেত্র। কিন্তু এইরকম কৌশলী ও দুর্বোধ্য লীলার অভিজ্ঞতা আমাদের কখনও হয়নি। আমাদের এ জন্যে দোষ দেওয়া উচিত নয় যেহেতু আমরা জানি না যে সর্ব্বোচ্চ মহলে এই ধরণের ব্যাপার ঘটে যাচ্ছে। এ অভিনব, চমৎকার, গুপ্ত ও দুর্বোধ্য। এমন যে কোন ক্ষেত্র আছে যেখানে এত ঐশ্বর্য্য আছে, এত মাধুর্য্য আছে তা আমাদের কাছে অজানা থেকে গেছে।'

ইংরেজ কবি টমাস গ্রে তাঁর একটি কবিতায় ('এক গ্রামের চার্চের প্রাঙ্গনে শোকগাথা') লিখেছিলেন —

> ''Full many a gem of purest ray serene
> The dark unfathomed caves of ocean bear;
> Full many a flower is born to blush unseen,
> And waste its sweetness on the desert air.''
>
> –*Elegy in a Country Churchyard*

অর্থাৎ, 'সমুদ্রের অন্ধকার গহন গুহা কতই না ঝকমকে রত্নমানিককে

ধরে রেখেছে; কতই না ফুল ফোটে যাদের রক্তাভ আভা কেউ দেখে না, যারা তাদের মাধুর্য্যকে মরুভূমির হাওয়ায় অপচয় করে।'

কি আশ্চর্য্য এই আবিস্কার যে যিনি সকল বস্তুর প্রভু তিনি চোর। সবকিছুই তাঁর সম্পত্তি তবুও তিনি চোরের মত আসেন। সকলেই তাঁর সম্পত্তি তবুও তিনি লম্পটের ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাঁর সমস্ত লীলাই চমৎকার। সবকিছুই তাঁর। তবুও তাঁর আচরণ চোরের মত — যেন তিনি আমাদেরই মত। এ এক অভিনব ক্ষেত্র আর এ এক অভিনব লীলা।

সেখানে সকলেই তাঁর সমান এবং কেউ কেউ তাঁর গুরুজনও বটে। শ্রীভগবানের মাতাপিতা হয়ত তাঁকে তিরস্কার করবেন এবং তখন হয়ত তিনি কাঁদবেন। এই হল ভক্তি। ভক্তি কোথায়? শুদ্ধ ভক্তির লক্ষণ কি? যেখানে যিনি সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তা তিনি তাঁর দাসের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেন — সেই হল ভক্তি, যেখানে শ্রীভগবান 'ভক্তপরাধীন'। যিনি সর্ব্বোচ্চ তিনি বাধ্য হয়েছেন তাঁর ভক্তদের সেবা করার জন্যে। ভক্তির স্থান এমনই অপূর্ব আর এমনই তাঁর ক্ষমতা। 'ক্ষেত্র-হরি প্রেম ভজন', ভক্তির চরম অর্জন বা ঐশ্বর্য্য হল এই যে তা শ্রীভগবানকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে এবং তাঁকে বাধ্য করে তাঁর ভক্তের বন্ধুভাবে সেবক হতে। প্রভু তাঁর দাসের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

যিনি অসীম তিনি সসীমের আওতায় আছেন। এ কি আমরা ধারণা করতে পারি? শুধু তাই নয় এই ব্যাপার ঘটে কখনও চুপিচুপি কখনও নানা কুটিনাটি, ছলছুতোর মাধ্যমে। সুতরাং **কৃষ্ণ ভাবনামৃতে সসীম তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এক অভাবনীয় আসন অর্জ্জন করে, যেখানে অসীম আসেন তাঁর সেবা করার জন্যে। এইরকম এক গৌরবময়, অভাবনীয় আসন কেউ পেতে পারে তা অসম্ভব মনে হয়। তবুও এই অসম্ভব সম্ভব হতে পারে ভক্তির দ্বারা, রাগানুগা প্রেমের দ্বারা। প্রেমের ক্ষমতা অভাবনীয়। যদিও তা অসম্ভব তবুও অসীম সসীমের দ্বারা পরাজিত হন। কি সেই অভাবনীয় অবস্থা? কেবল প্রেমের দ্বারাই তাঁকে পাওয়া যায়।**

আর কি মূল্যবান, কি অমূল্য, কি পূজনীয়, কি আদরণীয় সেই প্রেম। সেই চিন্ময় প্রেমের একবিন্দু পাওয়ার জন্যে কোন আত্মত্যাগই যথেষ্ট

নয়। তাই আমাদের 'বাঁচার জন্যে মরতে' প্রেরণা দেওয়া হয়েছে। সেই অর্থে সেইরকম মৃত্যুও বরণীয়। সেই চিন্ময় প্রেমকে পাওয়া অসম্ভবের চেয়েও অসম্ভব, কিন্তু মহাপ্রভু এসেছিলেন আমাদের সেই প্রেম দিতে। কি মহান ও উদার তিনি! তিনি স্বয়ং এক ভিখারীর ভূমিকা গ্রহণ করে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করেছিলেন, 'আমার খাতায় তোমরা নাম লেখাও। আমি এসেছি সবাইকে সেই সর্ব্বোচ্চ মহলে ভর্ত্তি করতে যেখানে অসীম সসীমের দাসত্ব করবেন। সেই অমূল্য বস্তুর একবিন্দু তোমরা গ্রহণ কর।' এ হল অসম্ভবের চেয়েও অসম্ভব, অচিন্ত্যনীয়ের চেয়েও অচিন্ত্যনীয়।

সুতরাং তোমাদের এই সোনার হরিণের পিছনে ছোটার অভ্যাসটা ছেড়ে দাও, আর সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে মনোনিবেশ কর এই পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে, চেষ্টা কর সেই চিন্ময় প্রেমের মন্দিরে যাওয়ার জন্যে।

শ্রীমদ্ভাগবতমে উদ্ধব বলেছেন,

আসামহো চরণরেণু জুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্।।

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ১০/৪৭/৬১)

অর্থাৎ, 'অহো! আমি যেন ব্রজসুন্দরীদের পাদপদ্ম সেবী বৃন্দাবনের গুল্মলতা অথবা ঔষধির মধ্যে কোন একটিরূপে জন্ম গ্রহণ করতে পারি, যেহেতু তাঁরা দুস্ত্যাজ্য স্বজন ও আর্যপথ পরিত্যাগ করে শ্রুতিগণের অন্বেষণীয় মুকুন্দ-পদবী ভজনা করেছেন।'

প্রেমের জন্য যখন ঝুঁকি নেওয়া হয় তখন তা প্রেমের ভাবকে তীব্রতর করে। সর্ব্বোচ্চ প্রেমভক্তির এ হল এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যে তার জন্য সমস্ত জাগতিক প্রাপ্তিকে বর্জন করার ঝুঁকি নেওয়া হবে। সেই চিন্ময় প্রেমের অনুসন্ধানে অবশ্যই এমনভাবে নিরত হতে হবে যে তাঁর জন্য এজগতের তথাকথিত শুচিতা ও সুনীতিও বর্জ্জনের ঝুঁকি নিতে হবে। সেইরকম প্রেমের স্থানই সর্ব্বোচ্চ। তবুও সেখানে খুব সাবধানে এগোতে

হবে। সেখানে নম্রতার পথে, দৈন্যের পথে যেতে হবে। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটন সেরকম দৈন্য দেখিয়েছিলেন। তাঁর সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকরা মনে করতেন নিউটন সবই জানেন। কিন্তু তিনি নিজে বলেছিলেন 'আমি কিছুই জানিনা।' যথার্থ উপলব্ধির এই হল পথ, যতই একজন সত্যিকারের শুদ্ধতার মধ্যে থাকবেন, ততই তিনি মনে করবেন 'আমি অশুদ্ধ।' অনন্তের পরিমাপ এইভাবে হয়। সেখানকার মাধুর্য্য এত অনন্ত। তাঁকে এইভাবে ছাড়া অন্য কোন ভাবে মাপা যায় না।

এ পথে যতই তাঁরা পান, ততই তাঁদের তৃষ্ণা বাড়ে আর তাঁদের মধ্যে ততই আগ্রহ দেখা যায়। অনন্তের উপলব্ধির এই হল বৈশিষ্ট্য। যতই তাঁরা প্রগতির পথে এগিয়ে যান ততই তাঁরা মনে করেন অনন্তের পরিমাপের পথে যেতে তাঁরা অসমর্থ, অসহায়। অনন্তের কোন অংশই মাপজোকের এলাকায় আসে না।

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ-মাধবম্।।

অর্থাৎ যাঁর কৃপা মূককে বাচাল করতে পারে এবং পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করাতে পারে সেই পরমানন্দ স্বরূপ মাধবকে আমি বন্দনা করি।'

অনন্তকে আমরা বুঝতে পারি না; আমরা মনে করি না তাঁকে কোনভাবে বর্ণনা করার যোগ্যতা আমাদের আছে, তাই আমরা মূক হয়ে যাই এই চিন্তা করে যে 'আমি কি বলব?' কিন্তু তিনি আমাদের দিয়ে কথা বলান, তিনি আমাদের মুখ খোলান। তা না হলে যিনি পাঠক, যিনি জ্ঞাতা তিনি মূক হয়ে যান।

একজন সত্যিকারের অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি কৃষ্ণের রীতিনীতি চালচলনের কাছে মূক হয়ে যান। একে বর্ণনা করতে, ব্যক্ত করতে তিনি পারেন না। কিন্তু উপর থেকে একটি শক্তি অবতরণ করে এসে তাকে দিয়ে কিছু বলান, কিছু বিবৃতি দেন। এইভাবে সেই চিন্ময় জগতের সত্য এখানে আসে। তখন যিনি সত্যদ্রষ্টা তিনি সেই উপরের জগতের, সেই উপরের শক্তি দ্বারা প্রেরণা পেয়ে কিছু বলেন। তাঁর অনুভূতিকে প্রকাশ করার জন্যে।

তাঁর নিজের কোন ক্ষমতা নেই চলার, কিন্তু শ্রীভগবানের অপূর্ব ক্ষমতা তাঁকে দিয়ে পর্ব্বত লঙ্ঘন করায়। এই হল সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানের কৃপার প্রকৃতি যে তার শক্তি দ্বারা সবকিছুই এগিয়ে যেতে পারে, জীবনধারণ করতে পারে।

'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি
জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম।'

(তৈত্তিরীয়োপনিষদ্ — ৩/১/১)

বরুণনন্দন ভৃগু পিতা বরুণের নিকট উপস্থিত হয়ে বললেন, 'ভগবন্, আমাকে ব্রহ্ম উপদেশ করুন। বরুণ তদুত্তরে বললেন, যার থেকে এই সকল প্রাণী জাত হয়েছে, জাত হয়ে যার দ্বারা সমস্ত প্রাণী জীবিত আছে, প্রলয়কালে যাতে গমন ও সর্ব্বতোভাবে প্রবেশ করে, তার বিষয় জিজ্ঞাসা কর, — তিনিই ব্রহ্ম।'

আমরা এক প্রবাসে থেকে এখানে কোন অলীক লাভ বা পাওনার জন্যে ঝগড়াঝাঁটি করছি। কিন্তু কৃষ্ণ তাঁর হারানো ভৃত্যদের জন্যে এক প্রেমময় অন্বেষণে রত আছেন। তিনি চান তাঁর হারানো ভৃত্যদের উদ্ধার করতে আর তাদের নিজ গৃহে নিয়ে যেতে।একমাত্র শ্রীভগবানের কৃপাতেই তা সম্ভব। সেখান থেকে একটা তরঙ্গ আসছে আমাদের আপন ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, যেখানে সকলেই শেষপর্য্যন্ত যাবে। জগতে যখন মহাপ্রলয় আসবে তখন যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তাই অদৃশ্য হয়ে সূক্ষ্ম অস্তিত্বে থাকবে। কিন্তু নতুন সৃষ্টির বিবর্ত্তনে আবার তারা প্রকাশিত হবে। আর কেউ কেউ তাদের নিত্যলীলায় প্রবেশ করে আর এই শোষণ বা ভোগ ও ত্যাগের জগতে ফিরে আসবে না।

কৃষ্ণের সন্ধানে

আমাদের অবশ্যই কৃষ্ণের সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে হবে। কিন্তু প্রথমে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে 'আমি কে?' আমি কোথায় আছি? কোন পথে চলে আমি সেই জগতের দিকে যেতে পারব? আমরা তো সবসময়ই

কোন না কোন প্রশ্ন করছি, কিন্তু কিরকম জিনিস নিয়ে? এখন যেন আমরা আমাদের হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দিই আর তাঁর সম্বন্ধে প্রশ্ন করি। এই হল আমাদের চরম প্রয়োজন। একে আমরা এড়াতে পারি না। আর সেই কৃষ্ণঅন্বেষণের জন্যে আমাদের কিসের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে, কি থাকবে সেই পথে, কোন স্তরে পৌছবে আমাদের কৃষ্ণভাবনা তা আমরা আগে থেকে বলতে পারি না। পরব্রহ্মের তিনরূপ — ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান। শ্রীভগবান সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসাই সর্ব্বোচ্চ, তাই হল সত্য ও সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ।

এ আমাদের এক স্বাভাবিক প্রয়োজন, আমাদের নিজেদের স্বার্থেই, একে আমরা এড়াতে পারি না। যাঁর মানসিক সুস্থতা আছে, যিনি নিজেকে প্রবঞ্চনা করতে চান না, তিনি কখনই কৃষ্ণ-অন্বেষণকে এড়াতে পারবেন না। আমাদের স্বভাবের সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য হল এই যে আমরা সুখের অন্বেষণ করি। সমস্ত চেতন প্রাণীর এইটাই প্রধান অনুসন্ধিৎসা। কৃষ্ণ অন্বেষণের অর্থ হল রসের অন্বেষণ, সর্ব্বোচ্চ আনন্দের অন্বেষণ।

যদি আমরা নিজেদের পরীক্ষা করি তাহলে আমাদের জীবন, আমাদের অন্তঃকরণের লিপিকা পাঠ করে আমরা কাঁদব, এ আমি কি করেছি? আমার প্রয়োজন কি? আর কেমন করে আমি আমার দিন কাটাচ্ছি? আমাকে এর জন্যে নিশ্চয়ই অনুতাপ করতে হবে, চোখের জল ফেলতে হবে। আমি নিরর্থক ভাবে আমার দিন কাটিয়েছি, আমি নিজের সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছি; এতো আমি আত্মহত্যা করছি। আমার প্রকৃত অভিযোগ হচ্ছে আমার নিজেরই বিরুদ্ধে আর আমার তথাকথিত বন্ধুদের বিরুদ্ধে। এখানে আমাদের কিছুই সম্পর্ক নেই। তাই নিজের জীবনের লিপিকা পাঠ করে আর চোখের জল ফেলো। নিজের কর্ত্তব্য কর অথবা মৃত্যুবরণ কর। ঠিকপথে এগিয়ে যাও অথবা জেনো যে তুমি নিজের মৃত্যুকে আমন্ত্রণ করছ। সবচেয়ে বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে সমস্ত জীবনের, সমস্ত অস্তিত্বের সার্ব্বজনীন মর্ম হল এই যে সত্য ও সুন্দর শ্রীকৃষ্ণের অন্বেষণ করা। শুধু মানবসমাজেরই নয়, সমস্ত সৃষ্টির এই হল সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য। আর সমস্ত সমস্যার সমন্বয় ও সমাধান হয় এর দ্বারা।

এই প্রয়াসের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই স্বাভাবিক নয়। এই প্রধান শিক্ষা থেকে, এই প্রধান কর্ত্তব্যের ডাক থেকে পথভ্রষ্ট হয়ে যা পাওয়া যাবে তা সবই মেকী, অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর। এই হল সত্য, তা যেখানেই জীবন আছে সেখানেই সকলেরই প্রয়োজন। সমস্ত পৃথিবীর প্রতি, সবচেয়ে মহান, ব্যাপক ও প্রীতিপূর্ণ ডাক, একমাত্র প্রীতিপূর্ণ ডাক হল এই যে কৃষ্ণের দিকে দুর্ব্বারভাবে এগিয়ে যাও। এই হল একমাত্র ডাক। অন্য সব ডাককে নীরব করে দেওয়া উচিত। অন্য সব প্রসঙ্গকে নীরব করে দেওয়া উচিত, থামিয়ে দেওয়া উচিত আর যদি শুধু এই ডাকই থেকে যায় তবে জগতের প্রকৃত কল্যাণও থাকবে। তাই উপনিষদ বলেছেন,

যস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্বম্ ইদম্ বিজ্ঞাতং ভবতি
যস্মিন্ প্রাপ্তে সর্ব্বম্ ইদম্ প্রাপ্তম্ ভবতি
তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম।

(শাণ্ডিল্য উপনিষদ্ ২/২)

অর্থাৎ যাঁকে জানলে সব জানা হয়ে যায়, যাঁকে পেলে সব পাওয়া হয়ে যায় তাঁর কথা জিজ্ঞাসা কর, তিনিই ব্রহ্ম।

এক সর্ব্বব্যাপক ডাক জগতে চলে আসছে যা সত্যিই কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঁধা নেই। যাদের চিন্তাধারা অস্বাভাবিক তাদের কাছে আপাতদৃষ্টিতে এই ডাক সাম্প্রদায়িক বলে মনে হতে পারে। কিন্তু যে কোন ব্যক্তি যাঁর চিন্তাধারা স্বাভাবিক, তাঁর কাছে এ এক প্রধান, বিশ্বজনীন বস্তু যার মোকাবিলা অবশ্যই করা দরকার।

বর্ত্তমানে আমরা এক প্রবাসে কোন মেকী পাওনার জন্যে, লাভের জন্য ঝগড়াঝাঁটি করছি। কিন্তু উপর থেকে এক মধুর তরঙ্গ আসছে আমাদের উদ্ধার করে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। শুধু শ্রীভগবানের হারানো ভৃত্যদের জন্যে তাঁর প্রেমময় অন্বেষণ রূপ করুণা দ্বারাই তা সম্ভব। আর আমাদের কাছ থেকে শুধু এটাই আশা করা যায় যে আমরা এই কৃষ্ণ অন্বেষণে যোগ দেব আর সেই চিন্ময় জগতের দিকে এগিয়ে যাব। আসুন, আমরা সেই চিন্ময় জগতের দিকে যে বিশ্বজনীন যাত্রা তাতে যোগদান করি, নিজেদের উদ্ধার করি আর আমাদের আপন ঘরে, শ্রীভগবানের কাছে ফিরে যাই।

সপ্তম অধ্যায়

জ্ঞানশূন্যা ভক্তি

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি।।

(শ্রীমদ্ভাগবতম — ১১/২০/৩০)

অর্থাৎ 'তখন সাধকের অবিদ্যাময় হৃদয়গ্রন্থি ভেদ হয়, সকল সংশয় ছেদ হয় এবং আমাকে অখিলাত্মা বলে দৃষ্ট হলে সমুদয় কর্মক্ষয় হয়।' রসের জন্যে, আনন্দের জন্যে, আমাদের ভিতরে যে ব্যাকুল বাসনা আছে তাকে হৃদয়ের অভ্যন্তরে সমাহিত করে গ্রন্থি বা গিঁট দিয়ে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। কিন্তু কৃষ্ণ নামগুণ শ্রবন কীর্ত্তনে হৃদয়ের এই গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে যায় এবং সেই বাসনাকে জাগিয়ে দেয় এবং হৃদয়কে উন্মুক্ত করে দেয় কৃষ্ণকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে, যিনি সকল আনন্দের আধার, যিনি স্বয়ং রসস্বরূপ বা আনন্দময়স্বরূপ (রসো বৈ সঃ)।

এখানে শ্রীমদভাগবতম বলছেন যে আমাদের হৃদয়ে একটা গ্রন্থি আছে, কিন্তু কৃষ্ণ ভাবনামৃতের দ্বারা তা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। সেইসময় চিন্ময় প্রেমের জন্যে আমাদের অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি সমস্ত হৃদয়কে প্লাবিত করে দেবে। হৃদয়ের গ্রন্থি যখন ছিন্ন হয়ে যায়, সেইসময় আত্মা যখন জেগে ওঠে তখন গোলোকের তত্ত্ব তার অভ্যন্তরে উন্মোচিত হবে ও তার সমস্ত সত্ত্বাকে প্লাবিত করে দেবে।

কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে এ এক কঠিন সমস্যা। এ কি করে সম্ভব যে আমাদের সব সংশয় ঘুচে যাবে? সীমিত জীবের পক্ষে সব জানা কি সম্ভব? মনে হয় এই বিবৃতির মধ্যে যেন কিছু অসঙ্গতি আছে। একে অদ্ভুত,

অযৌক্তিক মনে হয়। উপনিষদ অবশ্য বলেছেন যাঁকে জানলে সব জানা হয়ে যায়, যাঁকে পেলে সব পাওয়া হয়ে যায়।' সীমিত জীব কেমন করে জানবে যে তার সব পাওয়া হয়ে গেছে, তার সব জানা হয়ে গেছে? এ খুব অযৌক্তিক মনে হয়, তবুও শাস্ত্রে একে সমর্থন করা হয়েছে। আর যদি এই সমস্যার সমাধান হয় তবে অন্য সব সমস্যার আপনিই সমাধান হবে। সীমিত জীব তার সম্পূর্ণ সন্তোষ উপলব্ধি করবে, তার সমস্ত অনুসন্ধিৎসু মনোবৃত্তিও সন্তোষ লাভ করবে। একে শুধু উপনিষদে সমর্থন করা হয়েছে তাই নয়, শ্রীমদভাগবতমেও একে সমর্থন করা হয়েছে।

আমি যখন প্রথম গৌড়ীয় মঠে এসেছিলাম তখন সেখানকার ভক্তদের সঙ্গে আমি খুব সতর্কতার সঙ্গে মেলামেশা করেছিলাম। আমি মনে করেছিলাম যে 'এঁরা বলেন যে এঁরাই শুধু সত্যকে প্রচার করেন — বাদ বাকি সবই মিথ্যা' — এতো বিশ্বাস করা খুব কঠিন। এঁরা বলেন, 'সকলেই অজ্ঞানতা থেকে দুঃখভোগ করছে আর আমরা যা বলছি সেটাই ঠিক।' আমি মনে করলাম, 'সে কি কথা! কোন সুস্থ লোক কখনও এরকম কথা বিশ্বাস করবে না।' আমিও প্রথমে একথা সহজে হজম করতে পারিনি। কিন্তু তাঁরা যা বলছিলেন তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীমদভাগবতম, ভগবদ্গীতা ও উপনিষদ সমর্থন করেছেন। সমস্ত কর্ত্তৃপক্ষই বলেছেন যে 'হ্যাঁ, একথা সত্য। যদি তাঁকে জানতে পার তবে সবই জানা হয়ে যাবে, যদি তাঁকে পেতে পার তবে সবই পাওয়া হয়ে যাবে।'

শ্রীমদভাগবতমেও উপনিষদের এই কথার সঙ্গে মিল আছে এইরকম একটি শ্লোক আছে। যেখানে বলা হয় কৃষ্ণভাবনামৃতের দ্বারা সব সংশয় ঘুচে যাবে এবং তার ফলে আমরা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করব। সেখানে বলা হয়েছে,

যথা তরোর্মূল নিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সবার্হনমচ্যুতেজ্যা।।

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৪/৩১/১৪)

অর্থাৎ, যেরকম তরুর মূলে জল সেচন করলে বৃক্ষের স্কন্ধ, ভুজ ও উপশাখা সকলই তৃপ্ত হয়, উদরে আহার দিলে সকল ইন্দ্রিয় পুষ্ট হয়, সেরকম অচ্যুত বা কৃষ্ণের উপাসনা করলে সকল দেবতার অর্চন হয়, সকল কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হয়।

যদি আমরা পাকস্থলীতে খাদ্য পাঠাই তবে সমস্ত শরীরই পুষ্ট হয়। যদি আমরা গাছের গোড়ায় জল দিই তবে সমস্ত গাছটাই খাদ্য পাবে। সেইরকম যদি আমরা কেন্দ্রের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য করি তবে সমস্ত কর্ত্তব্যই সম্পন্ন হবে। সেই পরব্রহ্ম যিনি সবকিছুর কেন্দ্রে আছেন এই হল তাঁর মহত্ব, তাঁর রহস্যময় তত্ত্ব। সম্পূর্ণ পূর্ণতার উপরে তাঁর নিয়ন্ত্রণ আছে। সমস্ত প্রাণবন্ত পরিপূর্ণতার কেন্দ্রে যিনি আছেন তাঁর তত্ত্ব এমনই অভিনব।

মস্তিষ্কের কোন বিশেষ জায়গাকে যদি ধরে ফেলা যায় তবে সমস্ত শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, মস্তিষ্কের কোন বিশেষ জায়গা যদি আহত হয় তবে সমস্ত শরীরই অসাড় হয়ে যাবে। সেই পরম কেন্দ্রের অভিনব তত্ত্ব অনেকটা সেইরকম। তাই অসম্ভব সম্ভব হয়।

ধরা যাক আমি একটি দরিদ্র মেয়ে যার কিছুই নেই। সাধারণতঃ আমার পক্ষে সম্ভব হবে না কোন ধনসম্পত্তি জোগাড় করা। কিন্তু আমি যদি কোন ধনী লোককে বিয়ে করি, যার বিশাল ধনসম্পত্তি আছে, তাহলে তার সঙ্গে আমার সম্পর্কের মাধ্যমে আমারও অনেক কিছুর উপর দখল হবে। যদিও আমরা দরিদ্র, অকিঞ্চন, তবুও কোন শক্তিমান মালিকের সঙ্গে সম্পর্ক আমাদেরও অনেক কিছুর প্রভুত্ব দেয়। সেই একইভাবে সেই পরম কেন্দ্র সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করছেন আর তাঁর সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক আমাদেরও অনেক কিছুর উপর কর্ত্তৃত্ব দেয়। এইভাবে সসীম জীবাত্মার পক্ষে সম্ভব সবকিছুর মালিকানা পাওয়া — সেই প্রীতির সূক্ষ্ম যোগাযোগের মাধ্যমে।

কৃষ্ণের মাধ্যমে সবকিছুই সম্ভব। যতই আমরা তাঁর নিকটে যাব ততই আমরা লাভ করব। তাঁর প্রভাব তাঁর ভক্তদের অনুপ্রেরণা দেয় আর তাঁর গুণাবলী তাদের হৃদয়কে ভরিয়ে দেয়।

সর্ব্বমহাগুণগণ বৈষ্ণবশরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকলি সঞ্চারে।।

(শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত মধ্য/২২/৭৫)

এইভাবে যদিও ভক্ত নিজে প্রভু নয় তবু তার প্রেমভক্তির সম্পর্কে সেও যে কোন কিছুর প্রভু হতে পারে। এই চিন্তাধারাই শ্রীমদভাগবতমে ও উপনিষদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

সেই পরম কেন্দ্রের সঙ্গে সত্যিকারের যোগাযোগ বিনা সবকিছু জানার তোমার যে চেষ্টা তা ব্যর্থ হবে। তুমি যদি একটা বালুকণাকেও জানার চেষ্টা কর, তবে বহু জন্ম আসবে যাবে। বহু জীবন অতিবাহিত হবে, তবুও সেই বালুকণাকে বিশ্লেষণ করেই যাবে কিন্তু একটি ক্ষুদ্র কণাকেও জানার কোন অন্ত পাবে না।

পরম কেন্দ্র

আমাদের বলা হয়েছে 'যদি তুমি প্রশ্ন করতে চাও অনুসন্ধান করতে চাও তবে সেই কেন্দ্রের সম্বন্ধে প্রশ্ন কর।' এই হল উপনিষদের ডাক, 'বৃথা সময় নষ্ট কোর না এই বিশ্বের ক্ষুদ্রতম অংশকে জানার জন্যে আর তার উপর প্রভুত্ব করার জন্যে; তা কখনও সম্ভব নয়। তোমার অনুসন্ধিৎসা যথাযথ ভাবে চালিত হওয়া উচিত।' কৃষ্ণ বলেন 'আমিই কেন্দ্র আর আমি বলছি আমাকে জানার চেষ্টা কর, আর আমার মধ্যে দিয়ে তুমি সবকিছুকেই জানতে পারবে কারণ আমি সবকিছুই জানি আর আমিই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করি। আমার সঙ্গে যোগাযোগই তোমাকে সেই ক্ষমতা বা যোগ্যতা দিতে পারে। আমার মাধ্যমেই সবকিছুকে জানার চেষ্টা কর। তাহলেই তুমি সবকিছুর প্রকৃত তত্ত্ব জানতে পারবে। তা না হলে তুমি কেবল সত্যের এক আংশিক দিকের সঙ্গে পরিচিত হবে আর সেই পরিচয় হবে বাহ্যিক আর অসম্পূর্ণ। আর তাহলে সত্যকে জানার ও বোঝার চেষ্টায় তোমার লক্ষকোটি জন্ম পেরিয়ে যাবে, তবুও তুমি তাঁর কোন অন্ত পাবে না। শ্রীমদভাগবতমে বলা হয়েছে,

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়–
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।।

(শ্রীমদভাগবতম ১০/১৪/২৯)

অর্থাৎ ব্রহ্মা বললেন — 'হে ভগবান্! তোমার পাদাম্বুজদ্বয়ের — প্রসাদ-লেশে যাঁরা অনুগৃহীত তারাই কৃষ্ণমহিমা ও কৃষ্ণতত্ত্ব জানেন, অন্য কেউ শাস্ত্র ও বুদ্ধিদ্বারা চিরকাল আলোচনা করেও জানতে পারেন না।'

এখানে শ্রীমদভাগবতমের মাধ্যমে কৃষ্ণ আমাদের বলছেন যে 'কোন ভুলপথে তুমি যদি অনন্তকালের জন্যে নিজেকে নিয়োজিত কর তবুও তাঁকে বোঝার চেষ্টার কোন অন্ত পাবে এরকম সম্ভাবনা নেই। কিন্তু পরমতত্ত্বের কেন্দ্রের মাধ্যমে যদি তুমি কিছু জানার চেষ্টার কর তাহলে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই প্রকৃত তত্ত্ব জানতে পারবে যে কোনটা আসলে কি। উপনিষদ আর শ্রীমদভাগবতমে সেই নির্দ্দেশই আমাদের দেওয়া হয়েছে আর সেই নির্দ্দেশই আমাদের নিতে হবে আর তাই হল ভক্তি।

আর তা এতই সন্তোষজনক যে একবার যদি তুমি তা পাও তাহলে অন্য কিছু জানার জন্যে তোমার আর কোন আগ্রহ থাকবে না। কৃষ্ণের সেবার প্রতি সমস্ত মনোযোগ দেওয়াই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন। শ্রীমদভাগবতম ঘোষণা করেছেন ঃ

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি –
র্যে প্রায়শোঽজিত! জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।।

(শ্রীমদভাগবতম ১০/১৪/৩)

অর্থাৎ (ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণ স্তবে বলছেন) 'জ্ঞানের অর্থাৎ অক্ষজজ্ঞান দ্বারা ভগবৎস্বরূপৈশ্বর্য ও মহিমা বিচারের প্রয়াস সর্বতোভাবে পরিত্যাগপূর্বক নিজ নিজ আশ্রমে বা সাধুসন্নিধানে অবস্থিত হয়ে যারা সাধুগণের মুখে স্বতঃ উচ্চারিত এবং তৎ সান্নিধ্যমাত্র আপনা হতেই শ্রবণপথে প্রবিষ্ট ভবদীয়

নাম রূপ গুণ-লীলা পরবাক্য শরীর, মন ও বাক্যের দ্বারা সৎকার করতে করতে জীবন ধারণ করেন তাঁরা অন্য কোন কর্ম না করুন তথাপি ত্রিলোকে অন্যান্য ব্যক্তির অজিত আপনি তাঁদের দ্বারা জিত অর্থাৎ বশীভূত হন।'

অর্থাৎ যাঁরা পরব্রহ্ম শ্রীভগবান আপনাকে উপলব্ধি করতে চান তাঁরা যেন সর্ব্বরকমের জ্ঞানের প্রয়াসকে ঘৃণার সঙ্গে পরিত্যাগ করে সম্পূর্ণভাবে আপনার শ্রীচরণেই আত্মনিবেদন করেন। আপনার শ্রীনাম ও চিন্ময়লীলা যেন তাঁরা আত্মবিদ সাধুদের কাছে শ্রবণ করেন। যে কোন স্থানে যে কোন অবস্থাতেই তাঁরা থাকুন না কেন, আপনার শ্রীচরণে তনু, মন, বাক্য নিবেদন করে তাঁরা ভক্তিপথে সর্ব্বদাই অগ্রসর হবেন। এইভাবে যিনি অনন্ত, যাঁকে কেউ কখনও জয় করতে পারে না তাঁকে প্রেমের দ্বারা জয় করা যায়।'

একমাত্র আত্মনিবেদনের দ্বারাই আমরা শ্রীভগবানের দিকে অগ্রসর হতে পারি আর তাঁকে যখন আমরা পাব তখন অন্য কিছু জানার জন্যে আর আমাদের কোন আগ্রহ থাকবে না। বাইরের জগতে কি হচ্ছে না হচ্ছে তার জন্যে আমাদের আর কোন মাথাব্যথা থাকবে না। তাঁর সন্তোষের জন্যে তাঁর সেবাতেই আমরা গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করব। সেইখানে তাঁর সেবার মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনের পরম প্রয়োজনকে সিদ্ধ হতে দেখব। আর এই বাইরের জিনিষের বাহ্যিক জ্ঞানকে আমাদের কাছে তখন আবর্জ্জনা বলে মনে হবে।

আমরা উপলব্ধি করব যে নানারকমের হিসেবনিকেশ করে সময় নষ্ট করার কি প্রয়োজন — অমৃত তো এখানেই রয়েছে। সেইসময় আমাদের সমস্ত মনোযোগ আমরা তাঁর সেবায় দেব।

অনেক সময়ই এই প্রশ্ন ওঠে যে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু কেন বর্ণাশ্রমধর্মকে অগ্রাহ্য করে ছিলেন এবং যে কোন সমাজের যে কোন স্তরের ব্যক্তিকেই কেন আমাদের ভক্তিশিক্ষায়তনে গ্রহণ করা হয়। বর্ণাশ্রমধর্মের বিধিনিষেধকে আমাদের ডিঙ্গিয়ে যেতে হবে বা অতিক্রম করে যেতে হবে। কর্ম্মমিশ্র ভক্তি ও জ্ঞানমিশ্রভক্তি এই দুইকেই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু কোন স্বীকৃতি দেন নি। তাঁর শ্রীমুখের বাণীই ছিল যে 'এহ বাহ্য, আগে কহ আর।' অর্থাৎ এইসব বাহ্যিক বস্তুকে অতিক্রম করে আরও গভীরে যাও, আরও গভীরে

যাও। যখন মহাপ্রভু জিজ্ঞেস করলেন এইসব বিভিন্ন ভগবৎচিন্তার ওপারে ও উপরে কি আছে, তখন রামানন্দ রায় জ্ঞানশূন্যা ভক্তির উত্থাপন করলেন। রামানন্দ রায়ের মুখে সেকথা শুনে মহাপ্রভু বললেন, হ্যাঁ, প্রকৃত ভগবৎচিন্তার এখানেই শুরু।'

কর্ম ও জ্ঞান

তার মানে কর্ম ও জ্ঞান হল অপ্রয়োজনীয়। কর্ম ও জ্ঞানের উপর নির্ভর না করে কর্ম ও জ্ঞান থেকে স্বতন্ত্র হয়েই — যে কোন অবস্থা থেকেই একজন তার ভক্তির জীবন শুরু করতে পারেন। ভক্তি কেবল বিকশিত হয় সুকৃতির দ্বারা ও রুচির মাধ্যমে অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রতি প্রবল আগ্রহ ও আন্তরিকতার দ্বারা। এরই প্রয়োজন, প্রয়োজন নেই জ্ঞানের অর্থাৎ সবকিছুর জানার আগ্রহের, প্রয়োজন নেই কর্মেরও অর্থাৎ শক্তিসঞ্চয়ের। এই দুটি পথ আমাদের শোষণ ও মুমুক্ষার দিকে নিয়ে যায়। যে কোন অবস্থাতেই কেউ থাকুন না কেন, তাঁর যদি শ্রীভগবানের সংস্পর্শে আসার ইচ্ছে থাকে, তাহলে তাঁর যেন কেবল কোন যথার্থ উৎস থেকে, প্রকৃত সাধুর থেকে কৃষ্ণকথা শ্রবণের প্রবৃত্তি থাকে। ভক্তির এই হল যথার্থ প্রারম্ভ। সুতরাং বর্ণাশ্রমের স্থান থেকে স্বতন্ত্র হয়েই যে কেউ ভক্তিশিক্ষায়তনের পাঠ শুরু করতে পারেন।

কৃষ্ণকে জানার জন্যে কারোর জ্ঞানী বা শক্তিশালী হওয়ার প্রয়োজন নেই, ঐশ্বর্য্য ও ক্ষমতার অধীশ্বর হওয়ারও প্রয়োজন নেই। যেটুকু মাত্র তাঁর কাছে দাবী করা হয় তা হল এই যে কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্যে তার অন্তরে যেন প্রবল ক্ষুধা থাকে। কোন প্রকৃত উৎস থেকে, প্রকৃত সাধু থেকে যখন তিনি শ্রীভগবানের বাণী ও লীলা শ্রবণ করবেন তখন তাতে যেন তিনি কোন মাধুর্য্য আস্বাদন করেন। তাতে যেন তাঁর কিছু রুচি হয়। সেই রুচিই ক্রমশঃ তাঁকে সেই উচ্চতর এলাকার আরও ভিতরে নিয়ে যাবে।

অনন্তের অনুসন্ধানে যদি তাঁরা সফল হতে চান তবে জ্ঞানী ও কর্মীকে শেষপর্যন্ত তাদের জ্ঞান ও কর্মের আসক্তিকে পরিত্যাগ করতে হবে, সেই

পরিধির বেড়া ভেঙ্গে এই অবস্থায় আসতে হবে। তাঁদের রুচির উপরে, আস্বাদনের উপরে নির্ভর করতে হবে। রুচি, আস্বাদনই সব। তাঁর লীলার প্রতি রুচি, শ্রীভগবানের লীলা আস্বাদনের আগ্রহ ভক্তের সবচেয়ে বড় যোগ্যতা। যেখানেই কেউ থাকুক না কেন তাতে কিছু এসে যায় না। কৃষ্ণের প্রতি যদি কারোর রুচি থাকে তাহলে সেই রুচি থেকেই সে জীবনের পরম প্রয়োজনের দিকে এগিয়ে যাবে।

তাই **আমাদের বলা হয়েছে সবকিছু ত্যাগ কর, এমনকি সমস্ত সামাজিক ও ধার্ম্মিক ধারণাকেও বাহ্যিক জেনে পরিত্যাগ করে কৃষ্ণের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিবেদন কর, তাঁর শরণাগত হও। কোন দ্বিধা না করে, অসৎসঙ্গ ত্যাগ করে, এমনকি সমাজ ও ধর্ম্মের বৈধী আচরণকেও অগ্রাহ্য করে আমাদের উচিত পূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে শ্রীভগবানের সম্পূর্ণ আশ্রয় নেওয়া। তার অর্থ হল এই যে বিষয়ে সমস্ত আসক্তিই আমাদের ত্যাগ করতে হবে। শরণাগতির অর্থ হল এই যে শ্রীভগবানের সুরক্ষার ছায়ায় সম্পূর্ণরূপে আশ্রয় নাও।**

ভক্তিলতা

ভক্ত মনে করে 'কৃষ্ণ বড়ই মধুর। তাঁকে ছাড়া আমি থাকতে পারি না। কৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদন না করে আমি বাঁচতে পারি না। এইরকম অনুভূতিই সেই প্রকৃত বীজ যা ভক্তিলতার জন্ম দিতে পারে। আর সেই ভক্তিলতা ক্রমশ বর্দ্ধিত হবে যতদিন পর্য্যন্ত না সে কৃষ্ণচরণ স্পর্শ করে।

সেই ভক্তিলতা ক্রমশঃ বাড়বে কিন্তু তবুও এই জগতের চেতনার স্তরে কোথাও সে তার অবলম্বন খুঁজবে না, কিন্তু তবুও সে আরও উঁচুতে উঠতেই থাকবে। শেষপর্যন্ত যখন সে শ্রীভগবানের নিজস্ব তত্ত্বের সংস্পর্শে আসবে তখন সে খানিকটা সন্তোষ লাভ করবে। তবুও সেখানে সে থামবে না। সে আরও উঁচুতে উঠে গোলোকে পৌছবে। বৈকুণ্ঠের হিসেবী ভক্তির স্তরে সে থামবে না। সেই স্তরকে অতিক্রম করে সে স্বতঃস্ফূর্ত্ত, স্বাভাবিক ভক্তির স্তরে পৌছবে।

শ্রীভগবানের কাছে প্রত্যাবর্ত্তন

সেখানে আমরা আমাদের প্রেমের প্রভুকে খুঁজে পাব। সেই জগতের সর্ব্বত্র প্রেমই পূজনীয় ও আদরণীয় বস্তু। কেন্দ্রে যে বিষয়বিগ্রহ আছেন তাঁর প্রতি চিন্ময় প্রেমের সম্পর্কই সেই জগতের অপরিহার্য্য অঙ্গ। তাঁর সঙ্গে কোন বিশেষ সম্পর্কের সেবার মাধ্যমেই আমরা খুঁজে পাব আমাদের পরমতৃপ্তি ও পরিপূর্ণতা। সকলেরই সেই একই প্রয়োজন, সেই প্রেমের দেশে প্রবেশ করে, সেই পরম মাধুর্য্য, সৌন্দর্য্য ও প্রেমের প্রতিমূর্ত্তির প্রেমময় সেবার ভূমিকাকে খুঁজে নেওয়া। আর সেই সর্ব্বোচ্চ পরম কেন্দ্রই অবতরণ করে এসেছিলেন শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুরূপে তাঁর বহুদিনের হারানো ভৃত্যদের ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে, 'তোমরা সকলে চলে এস আমার সঙ্গে।' কি সৌভাগ্যময় সুযোগ আমরা পেয়েছি। তাঁর প্রস্তাবকে স্বীকার করে নিয়ে, সেই ধারায় প্রবেশ করার সুযোগ পেয়ে, কত সুখে আমরা বাড়ী ফিরে যেতে পারি, শ্রীভগবানের কাছে ফিরে যেতে পারি।

সর্ব্বধর্ম্মের এই হল সার। জেনে বা না জেনে প্রত্যেক জীবাত্মাই চিন্ময় প্রেমের অন্বেষণ করছে। তবুও নানাধরণের বিঘ্ন আসছে এই অভিযান থেকে আমাদের বিরত করার জন্যে। তবু হৃদয় সন্তুষ্ট হবে না যদি না এবং যতক্ষন না সে তার গন্তব্যে পৌছয়। একবার শুরু হলে কৃষ্ণের প্রতি আমাদের যাত্রা কোথাও থেমে যেতে পারে না। এ শুধু দেরীর প্রশ্ন, বহুদিন, বহুযুগ চলে যেতে পারে, কিন্তু আমাদের চরম সাফল্যকে আটকানো যাবে না।

কেবলমাত্র কৃষ্ণই আমাদের সত্যসত্যই আকর্ষণ করতে পারেন। হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে অন্য কোন কিছুর আস্বাদনে আমরা সেই তৃপ্তি বা আনন্দ পেতে পারি না, অন্য কোন কিছুকে আমাদের পরম গন্তব্য বলে মেনে নিতে পারি না। আমরা কেবল সৌন্দর্য্য ও প্রেম চাই, ক্ষমতা বা জ্ঞান চাই না।

প্রেমের ভিখারী

এমন মনে হতে পারে যে আমরা ক্ষমতা চাই। কখনও কখন আমরা মনে করি আমাদের অবশ্যই সবকিছুই চাই; নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আমাদের

চাই। আমরা চাই সবকিছুই আমাদের ক্ষমতার আয়ত্বে আসবে আর আমরা যা চাইব তাই হবে। সত্যসত্যই আমরা যা চাই তা কিন্তু এ নয়। এমন মনে হতে পারে যে আমরা ক্ষমতা চাই, কিন্তু ক্ষমতা কখনও আমাদের তৃপ্তি দিতে পারে না। আবার কখনও আমরা ভাবি আমরা সবকিছু জানতে চাই। সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা আমরা না চাইতে পারি। কিন্তু সবকিছু জানতে চাই আমরা, কারণ আমরা অজ্ঞ হয়ে থাকতে চাই না। কিন্তু সেটাও আমাদের চরম লক্ষ্য নয় যা আমাদের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনকে তৃপ্ত করতে পারে। সত্যসত্যই আমরা যা চাই তা এ নয়। **আমাদের প্রকৃত প্রয়োজন কি, আমাদের হৃদয়ের আভ্যন্তরীণ অন্বেষণ কিসের জন্যে তা অবশ্যই আমাদের শিক্ষা করতে হবে। তা যদি আমরা ঠিকমত করি তাহলে দেখব যে আমরা হলাম স্নেহপ্রীতি ও প্রেমের ভিখারী। সর্ব্বক্ষেত্রেই সর্ব্বগুহ্যতম প্রয়োজন হল এই যে যিনি আদরণীয় ও ভক্তিভাজন তাঁর প্রেমভক্তিময় সেবা। আর সেই প্রয়োজন সম্পূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হতে পারে একমাত্র বৃন্দাবনের কৃষ্ণলীলায়।**

বৈদিক শাস্ত্রের রচয়িতা বেদব্যাসের দ্বারা এই সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়েছিল। এমনকি সমসাময়িক পন্ডিতরাও স্বীকার করেছেন যে বেদব্যাস, বেদ, পুরাণ, মহাভারত ও বেদান্ত সূত্রের সমস্ত সম্ভাব্য দার্শনিক ধারাকে বপন করেছেন। আর তাঁর শেষজীবনে, তাঁর দার্শনিক পরিণতির কালে, তিনি দিয়েছিলেন শ্রীমদভাগবতম যার সর্ব্বোচ্চ পরিণতি হল চিন্ময় প্রেম, কৃষ্ণপ্রেম।

আমরা কৃষ্ণকে চাই

সমস্ত জীবাত্মার গুহ্যতম লালসা হল সৌন্দর্য্য, প্রেম, প্রীতি, সমন্বয় ও সুসঙ্গতির জন্যে, ক্ষমতার জন্যে নয়। সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে সমস্ত সৃষ্টির এই হল বৈশিষ্ট্য, তাদের সার্ব্বজনীন উদ্দেশ্য একই। কিন্তু সেই জীবাত্মা খুবই দুর্লভ যিনি একথা বুঝতে পারেন, সত্যের জন্যে যাঁর লালসা এইরকম উন্নতস্তরে পৌঁছেছে। পৃথিবীতে খুব কম জীবাত্মাকেই খুঁজে পাওয়া যায়, যাঁরা তাদের গুহ্যতম প্রয়োজন সম্বন্ধে সত্যই সচেতন, যাঁরা

উপলব্ধি করেন, 'আমরা কৃষ্ণকে চাই, আমরা বৃন্দাবনধামকে চাই' এইরকম আগ্রহী জীবাত্মা সহজে দেখা যায় না। একথা শাস্ত্রে বহুজায়গাতেই উল্লেখ করা হয়েছে।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৭/৩)

অর্থাৎ, অসংখ্য জীবগণের মধ্যে কখনও কেউ কেউ মনুষ্য হয়, সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কেউ কেউ স্ব-পরাত্ম অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার দর্শন নিমিত্ত যত্ন করেন, তাদৃশ যত্নশীল স্ব-পরাত্মদর্শী সহস্র সহস্র ব্যক্তির মধ্যেও কেউ কেউ মাত্র শ্যামসুন্দরাকার আমাকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন।'

গন্তব্য, পরিণাম বা লক্ষ্য একটাই — অনেক লক্ষ্যের প্রয়োজন নেই — সেই একমাত্র লক্ষ্য, সেই একটাই লক্ষ্য, সেই বিশেষ লক্ষ্য যাকে আমরা চাই তা হল চিন্ময় প্রেমের সম্পর্ক।

কৃষ্ণভাবনামৃতের বুদ্ধিবাদী উপলব্ধি বা বিশ্লেষণ অসম্ভব। মৌমাছি যেমন কাঁচের শিশির বাইরেটা চেটে চেটে ভিতরকার মধুর স্বাদ পেতে পারে না, সেইরকম কেবলমাত্র বুদ্ধি সম্বল করে কেউ কেউ সেই উচ্চতর আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করতে পারে না। সেই রাজ্যের প্রজা হিসেবে আমরা সেই পরম বিষয়-বিগ্রহের অধীনে আছি। সুতরাং সেবা অবশ্যই প্রয়োজন। সেবাই হল সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বস্তু। শ্রীমদভগবদগীতায় বলা হয়েছে সেই চিন্ময় প্রেমের রাজ্যে প্রবেশের জন্য প্রয়োজন হল প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবার। শুধুমাত্র সেবার দ্বারাই কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হবেন ও নেমে আসবেন ও কেবল তখনই আমরা সেই উচ্চতর স্তরের প্রকৃতি উপলব্ধি করব। এই হল বৈদিক জ্ঞান।

আমরা হলাম তটস্থা শক্তি, তাই সেই উচ্চতর বাস্তবিকতার কোন সত্যকে যদি আমরা জানতে চাই তাহলে আমাদের অবশ্যই বুঝতে হবে যে আমাদের অস্তিত্বের চেয়ে তা অনেক সূক্ষ্ম বস্তু, তা পরম আত্মবাদী। তা আমাদের স্পর্শ করতে পারে, কিন্তু আমরা আমাদের খুশীমত সেই রাজত্বে লাফ দিয়ে উঠতে পারি না। যদি আমরা সেই কৃপা পাই যা আমাদের সেখানে

নিয়ে যেতে পারে তবেই আমরা সেখানে যেতে পারি।

এই উপলব্ধি যাঁর আছে তিনি সমস্ত বর্ত্তমান বুদ্ধিবাদীর সঙ্গে লড়াই করতে পারেন। যুক্তিবাদী বুদ্ধির ক্ষমতা নেই সেই উচ্চতর চিন্ময় আত্মবাদী এলাকায় প্রবেশ করার। পরম সত্য হল অতিন্দ্রিয়-মনস-গোচর, তা মন-বুদ্ধি-ইন্দ্রিয়ের স্তরের অতীত। ব্রহ্মা যখন কৃষ্ণের কাছে স্বীকার করলেন যে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর (ব্রহ্মার) কায়মনোবাক্যের অতীত তখন তার যে অভিব্যক্তি — 'মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ' (শ্রীমদভাগবতম ১০/১৪/৩৮ অর্থাৎ 'আপনার বৈভব আমার কায়মনোবাক্যের গোচরীভূত নয়') তাঁর এই কথা শুধু মুখের কথা ছিল না। **যদি আমরা সেই পরম সত্যকে জানতে চাই তবে তাঁর একটাই শর্ত আছে তা হল আমাদের যেন দৈন্যময় আত্মনিবেদিত ভাব থাকে। সেইরকম ভাব থাকলে তিনি হয়ত আমাদের প্রচেষ্টায় সন্তুষ্ট হয়ে নিজেকে আমাদের কাছে প্রকাশিত করবেন। চিন্ময় প্রকাশ এ জগতের গবেষণার বস্তু নয় — হৃদয়ে আন্তরিকতা নিয়ে আমাদের সেখানে সেবা করতে হবে।**

বৈজ্ঞানিকরা কত অভূতপূর্ব তথ্য আবিস্কার করছেন। কিন্তু এসব তথ্য কি ইতিমধ্যেই বর্ত্তমান? নাকি বৈজ্ঞানিকরা এর স্রষ্টা? এইসব অত্যাশ্চর্য্য তথ্য ইতিমধ্যেই বর্ত্তমান। মাঝে মাঝে তার কিছু কিছু আবিস্কৃত হচ্ছে। এসব তথ্য বৈজ্ঞানিকদের সৃষ্টি নয়, সুতরাং তাঁদের এসবের উর্দ্ধে কোন উর্দ্ধতন স্থান নেই। সে যাই হোক না কেন, তাঁরা অবশ্য এসব তথ্য কেবল আংশিকভাবেই জানতে পারেন এবং তাও অনেক চেষ্টা করে। কিন্তু যদি তাঁরা চিরকাল গবেষণা করেই যান, তবুও সত্যের চেতন প্রকৃতি, ভগবত্তার চিন্ময় কারণ তাদের কাছে অজানা থেকে যাবে, তাঁরা যাই পান না কেন, তা কেবল বাইরের খোসাটা, সত্যবস্তু, সারবস্তু তা নয়।

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপণীয়মানা-
স্তেঽপীশ-তন্ত্র্যা-মুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।।

(শ্রীমদভাগবতম ৭/৫/৩১)

অর্থাৎ (শ্রীপ্রহ্লাদ বললেন) 'যাদের চিত্ত বিষয়রোগদুষ্ট হয়েছে ও যারা বহির্বিষয়াসক্ত কামিগণকে গুরুত্বে বরণ করেছে তারা পরমপুরুষার্থ লিপ্সু জনগণের একমাত্র গতি ভগবান শ্রীবিষ্ণুর মহিমা জ্ঞাত নন। সুতরাং অন্ধ চালিত অন্ধ ব্যক্তিগণ যেমন প্রকৃত পথের সন্ধান না জেনে গর্তে পতিত হয়, সেইরকম ঐসকল বহিরর্থমানী, দুরাশয়, ঈশতন্ত্রীতে দৃঢ়, বদ্ধ ব্যক্তি বিষ্ণুকে জীবের একমাত্র স্বার্থগতি বলে জানে না।' শ্রীমদভাগবতমে বলা হয়েছে—

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্।।

(শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৭/৫/৩০)

অর্থাৎ (শ্রীপ্রহ্লাদ বললেন) 'যে সকল গৃহব্রত (গৃহেতে আসক্ত) ব্যক্তি অসংযত ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা ঘোর অন্ধকার নরকে প্রবেশ করে ও সংসারের চর্বিত সুখ-দুঃখ বারংবার চর্বন করে, তাদের বুদ্ধি কখনও পরের অর্থাৎ অসৎ গুরুব্রুবের উপদেশে কিংবা নিজ চেষ্টায় অথবা উভয়ের সংযোগে কোনরূপেই কৃষ্ণের দিকে ধাবিত হতে পারে না।'

শ্রীমদ্ভাগবতম্ আমাদের বলেছেন যে সেই উচ্চতর সত্যের জগতে যদি আমরা যুক্তিবাদী বুদ্ধির পথে প্রবেশ করতে যাই তবে আমাদের প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে আমাদের ফিরে আসতে হবে।

যদি আমরা জোর করে বুদ্ধির দ্বারা সেই রাজ্যে প্রবেশ করতে যাই তবে আমাদের হতাশা ও অসন্তোষ নিয়ে ফিরে আসতে হবে এবং এই জড়জগতেই বারবার ঘোরাফেরা করতে হবে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার জগত নানা দশার মধ্যে দিয়ে আসবে যাবে কিন্তু সেই চিন্ময় স্তরে সে প্রবেশ করতে পারবে না। সেই জগতে প্রবেশ করার জন্য একমাত্র প্রয়োজন হল শ্রীভগবানের কোন যথার্থ প্রতিনিধির কাছে আত্মসমর্পন করা। তিনি আমাদের সেই যথার্থ পদ্ধতি প্রদান করতে পারেন আর যদি আমরা তা গ্রহণ করতে পারি তবেই সেই জগতে প্রবেশ করতে পারব, তা না হলে

আমাদের এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতির জগতেই ঘোরাঘুরি করতে হবে।

কোন কোন পণ্ডিতরা মনে করেন জ্ঞানই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের মতে কেউ যদি সেই রাজ্যে প্রবেশ করতে চান তাহলে তাকে প্রথমে পাণ্ডিত্যের দ্বারা জ্ঞান অর্জ্জন করতে হবে। তারপর প্রেমের জন্যে চেষ্টা করতে হবে। তাঁরা মনে করেন কেবল জ্ঞানের দ্বারাই আমরা বুঝতে পারব যে চিন্ময় প্রেম কি বস্তু এবং তখন আমরা সেই রাজ্যে প্রবেশ করতে পারব। জ্ঞানশূন্যা ভক্তির অনুমোদন তাঁরা করেন না।

একসময় ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা চেয়েছিলেন আমি তাঁদের প্রতিষ্ঠানে যোগ দিই। আমি তাঁকে বললাম "আমার মাথা ইতিমধ্যেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার কাছে বিক্রি হয়ে গেছে।" তিনি আমাকে বললেন যে 'হ্যাঁ আমিও তাঁকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু আমি আপনাকে বলি প্রথমে আপনি জাগতিক সুখের প্রতি উদাসীনতা শিক্ষা করুণ, যে মত বুদ্ধ প্রচার করেছিলেন। তারপর শঙ্করের বেদান্ত অধ্যয়ন করতে পারেন প্রকৃত জ্ঞান কি তা বোঝার জন্য এবং এইটা উপলব্ধি করার জন্যে যে জগত মিথ্যা এবং ব্রহ্মই সত্য। তারপরে আপনি শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম্মের দিকে যেতে পারেন, যাকে আমিও চরম লক্ষ্য বলে মনে করি।" আমি তার উত্তরে বললাম যে 'হ্যাঁ, আপনি তাই বলছেন বটে, কিন্তু শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেননি যে তাঁর কাছে আসার আগে আমরা যেন বৌদ্ধ দর্শনের কাছে ত্যাগ শিক্ষা করি ও তারপর শঙ্করাচার্য্যের দর্শন অনুযায়ী বেদান্তের জ্ঞান শিক্ষা করি। তিনি বলেছেন যে কেউ যে কোন অবস্থাতেই থাকুক না কেন সে যেন প্রকৃত বৈষ্ণব সাধুর সঙ্গ করে এবং শ্রবণকীর্ত্তনের পন্থা চালিয়ে যায়।' তিনি তখন হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না, একেবারে নীরব হয়ে গেলেন।

আর একবার আর্য সমাজের সঙ্ঘপতি করাচীতে এসেছিলেন আমার সঙ্গে দেখা করতে। তিনি আমাকে বললেন "সসীম যদি অসীমকে জানতে পারে তবে তো তিনি অসীম নন।" আমি তাঁকে বললাম 'অসীম যদি সসীমের কাছে নিজেকে জানাতে না পারেন তবে তো তিনি অসীম নন।' আমার এই যুক্তির উত্তরে তিনি কিছু বলতে পারলেন না।

সর্ব্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

সুতরাং আমাদের দিক থেকে কোন যোগ্যতা দিয়ে আমরা শ্রীভগবানকে ধরতে পারি না। তিনি যার কাছে নিজেকে জানাতে চাইবেন সেই তাঁকে জানতে পারবে। এই তত্ত্বকে উপনিষদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বক্তৃতা বা অলোচনা করে তাঁকে জানা যায় না। তীব্র স্মৃতিশক্তি বা বিরাট বুদ্ধি দিয়েও তাঁকে জানা যায় না। প্রতিভা দিয়ে বা অসাধারণ মেধা দিয়ে তাঁকে জানা যায় না। কেউ হয়ত সমস্ত উদ্‌ঘাটিত শাস্ত্রকে ব্যাপকভাবে অধ্যয়ন করেছেন, কিন্তু তাও কোন যোগ্যতা নয়। সমস্ত স্বতন্ত্রতাকে কৃষ্ণ নিজের কাছে সংরক্ষণ করেছেন। তাঁকে জানার কেবল একটাই উপায় আছে, তিনি যদি কারোর কাছে নিজেকে জানাতে চান তবেই সে তাঁকে জানতে পারে। তা না হলে তাঁর মধুর ইচ্ছার দ্বারা, তাঁর খুশীমত তাঁর সর্ব্বসত্ত্ব সংরক্ষিত আছে।

তাঁর মধুর ইচ্ছাকে আমরা কি করে আকর্ষণ করতে পারি? সেইটাই হল প্রশ্ন। তাঁর মধুর ইচ্ছাকে আমরা কি করে বশ মানাতে পারি? তা সম্ভব কেবলমাত্র শরণাগতির দ্বারা, আমাদের দৈন্যভাব বৃদ্ধির দ্বারা। এইভাব যেন আমাদের অবশ্যই থাকে যে 'আমি বড় দরিদ্র, হে ভগবান, তোমার কৃপা ছাড়া, তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারি না।' তাঁর হৃদয়ে আমাদের জন্য করুণার উদ্রেক করতে গেলে আমাদের এইরকম চিন্তা করতে হবে। তাঁর কাছে আমাদের অবশ্যই এই আবেদন জানাতে হবে যে তাঁকে আমাদের অত্যন্ত প্রয়োজন আর তাঁর কৃপা ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। কেবলমাত্র সেইরকম আত্যন্তিক প্রয়োজনের আন্তরিক অনুভবই আমাদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। তা নাহলে তাঁকে ধরার আমাদের কোন সম্ভাবনা নেই। তাই তাঁকে ধরার জন্যে, তাঁকে পাওয়ার জন্যে দৈন্যভাব অবলম্বন করারই উপদেশ দেওয়া হয়েছে। আমাদের অনন্য প্রার্থনা হল এই যে আমরা বড়ই অভাবগ্রস্ত আর তাঁকে পাওয়ার জন্যে আমাদের আন্তরিক ব্যাকুলতা আছে। কেবল তাই আমাদের প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আর এটা কারো ব্যক্তিগত মত বা অনুমান নয়। এ হল সত্য। এ হল বাস্তব।

একবার বদরিকাশ্রমে আমার এক পন্ডিত সন্ন্যাসীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। আমাদের আলোচনা কালে তিনি এক নাস্তিকের ভূমিকা নিলেন। তিনি তর্ক তুললেন ভগবান বা আত্মার যে অস্তিত্ব আছে তার কি প্রমাণ আছে?' আমি তখন শ্রীমদভাগবতম থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করলাম,

আত্মাপরিজ্ঞানময়ো বিবাদো
হ্যস্তীতি নাস্তীতি ভিদার্থনিষ্ঠঃ।
ব্যর্থোঽপি নৈবোপরমেত পুংসাং
মত্তঃ পরাবৃত্তধিয়াং স্বলোকাৎ।।

(শ্রীমদভাগবতম ১১/২২/৩৪)

অর্থাৎ 'জগতের সত্যত্ব ও মিথ্যাত্ববিষয়ক বিবাদ আত্মবিষয়ক-অজ্ঞানমূলক এবং ভেদনিষ্ঠ বলে ব্যর্থ হলেও স্বরূপভূত আমা থেকে যারা বহির্মুখ সেইসব মানুষের ঐ বিবাদ নিবৃত্ত হয় না।''

আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে যদিও আত্মা স্বয়ংপ্রভ, আপন দীপ্তিতে আপনি প্রকাশমান, তবুও দুটি বিরুদ্ধ দলের মধ্যে সর্ব্বদাই এক বিবাদ অছে। একদল বলবেন 'ভগবান আছেন!' আর একদল বলবেন 'ভগবান নেই!' শ্রীমদভাগবত বলেছেন যে আত্মা হচ্ছে স্বয়ংপ্রভ তবুও আমরা দেখি যে একদল মানুষ বলেন, 'তিনি আছেন, তাঁকে আমরা দেখি, শ্রীভগবানকে দেখা যায় আর অন্য এক দল বলেন, 'ভগবান কোন কালেই ছিলেন না।' এ বিবাদের কোন অন্ত নেই, কারণ এদের মধ্যে একদলের যা স্বতঃসিদ্ধ তা দেখার চোখ নেই। এ বিবাদ হল সময়ের অর্থহীন অপব্যবহার, তবুও এ কখনও থামবে না। এ চিরকাল চলতেই থাকবে। কেন? কেননা **কিছু লোক আছে তাদের ভগবানকে দেখার চোখ আছে আর কিছু লোক আছে যাদের ভগবানকে দেখার বা তাদের নিজেদের স্বরূপকে দেখার চোখ নেই। এঁদের মধ্যে একদল পথভ্রষ্ট হয়ে ভগবৎচেতনা থেকে দূরে চলে গেছেন। তাদের মধ্যে আর ভগবৎচেতনার মধ্যে, তাঁদের মধ্যে আর আত্মচেতনার মধ্যে একটা ব্যবধান রয়ে গেছে। সুতরাং তাদের অজ্ঞতার জন্যে এই বিবাদ চলতেই থাকবে।**

যাঁদের চোখ আছে দেখার তাঁরা বলবেন 'সূর্যের অস্তিত্ব আছে, সূর্য

আছে।' আর যাঁদের চোখ নেই তাঁরা বলবেন, 'না, না, সূর্য বলে কিছু নেই।' এ তর্ক চলতেই থাকবে, তার মানে এই নয় যে সূর্যের অস্তিত্ব নেই। সূর্য নিজেই নিজেকে দেখাতে পারে।

এই প্রসঙ্গে একটা উপমা দেওয়া হয়েছে। মাটির নীচে এক অন্ধকার কারাগারে একটি ছেলে জন্মেছিল। সূর্যের আলো সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতা ছাড়াই সে বড় হয়েছিল। কারাগারের বাইরে থেকে তার এক বন্ধু এসে তার সঙ্গে দেখা করত। একদিন তার বন্ধু তাকে বলল, 'চল আমরা সূর্য দেখব। আমার সঙ্গে এস, আমি তোমাকে দেখাব।' ছেলেটি বলল, 'হ্যাঁ আমি যাব তোমার সঙ্গে।' তারপর সে তার সঙ্গে একটা লণ্ঠন নেওয়ার জোগাড় করতে লাগল। তার বন্ধু বলল, 'লণ্ঠন সঙ্গে নেওয়ার কোন দরকার নেই।' ছেলেটি বলল 'কি বলছ তুমি! তুমি কি ভাব আমি এত বোকা? লণ্ঠন ছাড়া আবার কিছু দেখা যায় নাকি? অত বোকা আমি নই।' তখন তার বন্ধু জোর করে তার হাত ধরে নিয়ে গিয়ে তাকে সূর্য দেখিয়ে দিল। ছেলেটি তখন বলল, 'ওঃ, এই হল সূর্য। এর আলোতেই সবকিছু দেখা যায়।'

আত্মা হল সেইরকম। ভগবান হলেন সেইরকম। **শ্রীভগবানের নিজের জ্যোতিতেই তাঁকে দেখা যায় আর কেবলমাত্র তাঁর জ্যোতিতেই আমরা সবকিছু দেখতে পাই। তিনি হলেন স্বয়ংপ্রভ। তাঁর নিজের জ্যোতিতেই তিনি নিজেকে সকলের কাছে প্রকাশিত করতে পারেন। সকল জ্ঞানের তিনি উৎস। এই হল শ্রীভগবানের যথার্থ তত্ত্ব। তাঁর অস্তিত্ব স্বতঃসিদ্ধ, তিনি নিজের শক্তিতেই বিদ্যমান। আমাদের জ্ঞান দিয়ে তাঁকে দেখা যায় না, যেমন সূর্যকে অন্য কোন আলো দিয়ে দেখা যায় না।** বুদ্ধি বা জ্ঞানের মাধ্যমে ভগবৎচেতনা আহরণ করার কোন প্রয়োজন নেই। ভগবৎতত্ত্ব হল স্বতন্ত্র। তা নিজের ইচ্ছাতেই আসাযাওয়া করতে পারে। আর তিনি যদি আমার কাছে আসেন তাহলে সবকিছুই আমার কাছে আসবে। কিন্তু কোন কিছুই জোর করে তাঁকে আমাদের দৃষ্টিপথে আনতে পারে না। সূর্যকে তোমার অন্ধকার কারাগারে নিয়ে যাওয়া যাবে না, কিন্তু তুমি সূর্যের কাছে যেতে পার এবং তারই জন্যে সবকিছু দেখতে পার। সেই একই

ভাবে শ্রীভগবান স্বয়ংপ্রভ। কেবলমাত্র তাঁর নিজের জ্যোতিতেই তাঁকে দেখা যায়। বুদ্ধিবাদ একরকম অক্ষমতা। আমরা জ্ঞানশূন্যা ভক্তিতে আগ্রহী। প্রীতি, আকর্ষণ, সহানুভূতি — এসবই হৃদয়ের পরিণাম, হৃদয় আছে বলেই এসব অনুভূতি আছে। বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন জীবজন্তুদের বিশেষ কোন মস্তিষ্ক নেই, তাদের সেরকম বুদ্ধি নেই। তবুও আমরা দেখি যে সেরকম মস্তিষ্ক না থাকা সত্ত্বেও জীবজন্তু বেঁচে থাকতে পারে, কিন্তু হৃদয় ছাড়া কেউই বাঁচতে পারে না। মস্তিষ্ক যেরকম কমপিউটারের প্রতিরূপ, জীবজন্তুদের সেরকম কোন উন্নত কমপিউটারের মত মস্তিষ্ক নাই, যার দ্বারা তারা হিসেবনিকেশ ও পরিকল্পনা করতে পারে। জীবজন্তুরা তাদের সহজাত প্রবৃত্তিকে অনুসরণ করে, সুতরাং তারা অচেতন ভাবে কাজ করতে পারে। এও আমরা দেখি যে তাদের এই সহজাত প্রবৃত্তি বা স্বতঃলব্ধ জ্ঞান উন্নত মস্তিষ্কের হিসেবনিকেশের উপরেও যেতে পারে। কত পশুপাখী বুঝতে পারে কখন ভূমিকম্প আসবে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত মানুষের কোন গবেষণার দ্বারা আন্দাজ করা যায় না কোন নির্দিষ্ট সময়ে ভূমিকম্প হতে পারে। বহু জিনিস আছে যা আমাদের মস্তিষ্ক অনুভব করতে পারে না, যা তার ধরাছোঁয়ার বাইরে, অথচ জীবজন্তুরা পূর্ব্ব থেকেই তার ঈঙ্গিত পায়। আর দীর্ঘ ও গভীর গবেষণার পরেও মানুষ যা তার যুক্তির বাইরে তাকে বুঝতে পারে না। যুক্তি ও বুদ্ধির এই অবস্থাকে শ্রীমদভাগবতমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে :

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত! জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।।

(শ্রীমদভাগবতম/১০/১৪/৩)

(এই শ্লোকের আলোচনা পূর্ব্বেই হয়েছে।)

সুতরাং **বুদ্ধিবাদী প্রচেষ্টাকে ঘৃণার সঙ্গে পরিত্যাগ করে আমাদের ভিতরে আত্মনিবেদনের ভাবকে বিকশিত করতে হবে এবং যেখানে শ্রীভগবানের কথা হয়, হরিকথা হয় সেইরকম সাধুসঙ্গে জীবন কাটাতে**

হবে। তার মানে অবশ্যই এই নয় যে শ্রীভগবান সম্বন্ধে যে কোন কথাই হরি কথা। সেই কথা যেন অবশ্যই কোন যথার্থ উৎস থেকে আসে। আমরা বর্তমানে কি অবস্থায় আছি তাতে কিছু এসে যায় না। যে কেউ শ্রীভগবানের দিব্য প্রতিনিধিদের শিক্ষাকে কায়মনোবাক্যে অনুসরণ করবেন তিনিই শ্রীভগবানকে জয় করতে পারবেন, অন্যথা যিনি অজেয়।

বুদ্ধিবাদী পরিণতির পন্থাকে নিন্দা করে শ্রীমদভাগবত এই উপলব্ধির পথকেই অনুসরণ করতে উপদেশ দিয়েছেন।

শ্রেয়ঃস্মৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্‌যথা স্থূল তুষাবঘাতি নাম্।।

(শ্রীমদভাগবতম ১০/১৪/৪)

অর্থাৎ 'ভক্তিই কেবল শ্রেয়লাভের একমাত্র পথ। হে বিভো! সেই ভক্তিকে ত্যাগ করে বোধলব্ধির জন্যে যে সকল লোক চেষ্টা করেন, ক্লেশই তাঁদের চরম ফল হয়। স্থূলতুষাবঘাতী ব্যক্তি যে রকম কোন ভাবে তণ্ডুল লাভ করেন না, সেইপ্রকার।' অর্থাৎ 'হে ভগবান যাঁরা বুদ্ধির দ্বারা আপনার সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা চান তাঁদের চেষ্টা বৃথা হয়। যাঁরা তুষ বা শূন্য ধানের খোসা পিটিয়ে তার থেকে চাল বার করতে চান, তাঁদেরই মত তাঁদের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পরিণত হয়।'

সুতরাং জ্ঞান হল শূন্য ধানের খোসার মত। শক্তি ও জ্ঞান বাইরের দিক, ধানের খোসার মত। সত্যকারের সারবস্তু, যেমন খোসার ভিতরের চাল, তা হল ভক্তি, তা হল চিন্ময় প্রেম। তাই হল ভিতরকার স্বাদু বস্তু। অন্য সব জিনিস হল খোসা (জ্ঞান-কর্ম্মাদি অনাবৃতম)। কিন্তু খোসার ভিতরে যা আছে তা হল স্বাদু। শ্বাশ্বত, শুভ ও সুন্দর! সত্যম, শিবম, সুন্দরম। সৌন্দর্য্য হল বাস্তব, আনন্দ হল বাস্তব, অন্য সব কিছু কেবল বাইরের আবরণ। আবরণ নিয়ে যদি আমরা বেশী মাথা ঘামাই, তা হলে ভিতরের সারপদার্থ পাব না। তখন আমাদের জীবন হতাশাময় হয়ে যাবে।

নৈস্কর্ম্যমপ্যচ্যুত ভাববর্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে
ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্।

(শ্রীমদভাগবতম ১/৫/১২)

অর্থাৎ 'নৈস্কর্ম্যরূপ ব্রহ্মজ্ঞান অচ্যুতভাব অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তিবর্জিত হলে নিরঞ্জন হয়েও শোভা পায় না, কেননা তাতে চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য থাকে না। তখন স্বভাবতঃ অভদ্র যে কর্ম, তা নিস্কাম হলেও ঈশ্বরে অনর্পিত থাকলে কিরূপে শোভা পাবে?' অর্থাৎ শুধু নৈস্কর্ম্য কারোর জীবনের প্রকৃত সন্তোষজনক পরিণতি হতে পারে না। যদিও মুক্তির স্তর জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধিতে কলুষিত নয়, তবুও তাকে পরিপূর্ণতা বলা যায় না। তাহলে আর কর্ম্মের কি কথা — সেই কষ্টকর কর্ম, যা কৃষ্ণের সন্তোষের জন্যে সম্পন্ন হয় না।

একমাত্র বস্তু যা কর্ম ও বিশ্রাম-এই দুই অবস্থাতেই সন্তোষ দিতে পারে তা হলেন কৃষ্ণ, তিনিই হলেন এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয়কারী উপাদান। কর্ম্ম যদি কৃষ্ণের সেবার জন্যে করা যায় তবে তা সোনায় পরিণত হয়, তা আর লোহা থাকে না। আর মুক্তি যদি শ্রীভগবানের সেবার সঙ্গে সম্পর্কিত থাকে তবেই তার কোন মূল্য থাকে।

অ্যাডাম ও ইভ

যারা কঠিন পরিশ্রম থেকে কষ্ট পাচ্ছে তারা স্বভাবতই বিশ্রাম চায়। বাঁচার জন্যে তারা পরিশ্রমের উপর নির্ভরশীল, তবুও এই পরিশ্রমকে ব্যর্থ ও অবাঞ্ছিত বলে মনে করা হয়। বাঁচার জন্যে আমাদের অবশ্যই পরিশ্রম করতে হবে, তবুও এই পরিশ্রমের জীবনকে অসম্মানকর মনে করা হয়। সাধারণতঃ আমাদের আগ্রহ হল কি করে কষ্ট না করে বাঁচা যায়, আমরা এক শান্তিপূর্ণ বিশ্রামের জীবন খুঁজছি যেখানে আমাদের শ্রমের দাস হতে হবে না। আমাদের এই সংগ্রাম ও পরিশ্রমের জীবনে এই হল আমাদের সাধারণ প্রবণতা।

বাইবেলে আমরা দেখি অ্যাডাম আর ইভ যতক্ষণ ভগবানে আত্মসমর্পিত ছিল ততক্ষণ তাদের ভরণপোষণ আপনাআপনিই হচ্ছিল। যেই তাদের পতন হল ওমনি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাদের রুটি রোজগার করতে হল। বাঁচার জন্যে তারা পরিশ্রম করতে বাধ্য হল। আর এ হল এক ইতর ও অসম্মানজনক জীবন। কিন্তু বাঁচতে গেলে আমাদের পরিশ্রম করতেই হবে। আমরা চিন্তা করি 'এমন কোন ধরণের জীবন কি আছে যেখানে আমরা পরিশ্রম না করেই বাঁচতে পারি?' আমাদের জীবনে এইরকম একটা প্রবণতা আমাদের অস্তিত্বের শুরু থেকেই পাওয়া যায়। তাই কর্ম্ম থেকে ছাড়া পাওয়ার আকুল আকাঙ্ক্ষা আমাদের।

বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্য

বৌদ্ধ ধারা ও শঙ্করাচার্য্যের ধারা দুইই এমন একটি স্থান আবিষ্কার করতে চেয়েছে যেখানে আমরা পরিশ্রম না করে বাঁচতে পারি। বুদ্ধ বলেছেন জীবনটাই অপ্রয়োজনীয়; বাস্তবিকপক্ষে কর্ম্ম বলেও কিছু নেই, জীবন বলেও কিছু নেই, অস্তিত্ব বলেও কিছু নেই। বৌদ্ধ ধারার মতে আমাদের অস্তিত্বকে আমরা ত্যাগ করতে পারি। এই সংগ্রামের জগতে আমাদের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখাটাই একটা পাগলামী, সুতরাং এই পাগলামী আমাদের ছেড়ে দেওয়া উচিত। আমাদের বেঁচে থাকারই বা কি দরকার? সুতরাং বৌদ্ধরা 'নির্বাণের উপদেশ দেন — যা হল অস্তিত্বের অন্ত।

আর শঙ্করাচার্য্য বলেন, 'জীবন অবশ্যই আছে, কিন্তু এ জীবন বাঞ্ছিত নয়। আমরা সবসময়ই আঘাত থেকে কষ্ট পাচ্ছি, আর একটা শক্তি আছে যা সর্ব্বদাই আমাদের ক্ষয় করে দিচ্ছে ও শেষ পর্য্যন্ত আমাদের মৃত্যু হয়। মন্থর মৃত্যু। ধীরগতি বিষ আমাদের জীবনযুদ্ধে আহ্বান করে।' একথা সত্য যে মৃত্যুময় জগতের জীবন হল অবাঞ্ছিত। তাহলে এর সমাধান কি? শঙ্করাচার্য্য বলেছেন নিজের ব্যক্তিসত্ত্বাকে টিকিয়ে রাখার চেষ্টাটাই অবাঞ্ছিত। নিজের ব্যক্তিসত্ত্বাকে বাঁচিয়ে রাখার এবং একই সঙ্গে সত্যিকারের শান্তি, শ্বাশ্বত শান্তি পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। তাই ব্যক্তিসত্ত্বাময় জীবনের আকর্ষণকে আমাদের ত্যাগ করতে হবে।

শঙ্করাচার্য্যের মতে এক নিখিল আত্মা (ব্রহ্ম) আছেন এবং তা হল এক শান্তিময় তত্ত্ব। আমরা তাঁরই প্রতিবিম্ব মাত্র। সেই নিখিল আত্মা সর্ব্বত্র প্রতিবিম্বিত হচ্ছেন। কোনভাবে তাঁর থেকে এই রহস্যময় ব্যক্তিসত্ত্বা বা ব্যক্তিচেতনার (অহং) সৃষ্টি হয়েছে। এই মিথ্যে অহং টিকিয়ে রাখার জন্যে আমরা যেন আগ্রহী না হই, বরং একে ভেঙ্গে ফেলাই আমাদের উচিত। তা যখন হবে তখন আমরা দেখব যে কেবল সেই নিখিল আত্মা বা ব্রহ্মই বর্ত্তমান।

আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় মৃত্যু ব্যাধির কোন চিকিৎসা নেই। প্রত্যেক মূহুর্ত্তেই আমরা কোন না কোনভাবে নিজেদের ক্ষয় করে ফেলছি। এর কোন সমাধান নেই। বুদ্ধ ও শঙ্করাচার্য্য আংশিক উপলব্ধি দিয়েছেন। কিন্তু শ্রীমদভাগবতম বলেছেন যে 'এই সমস্যার সমাধান হল এই যে কৃষ্ণের সেবার সঙ্গে সম্পর্কিত দেখে এই পারিপার্শ্বিক থেকে উদাসীনতা ও ত্যাগের সাধনা করা। যে জ্ঞান বা তত্ত্বের দ্বারা তুমি নিজের ব্যক্তিসত্ত্বাকে, নিজের রুচি ও সম্ভাবনাকে বজায় রেখেই পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারবে তা কেবল ভক্তি ও আত্মনিবেদনের দ্বারাই সম্ভব। শোষণের দ্বারা তোমাকে পুনঃপুনঃ মৃত্যু বরণ করতে হবে। আর নিজেকে বঞ্চনারূপ ত্যাগের দ্বারা তুমি এক শূন্যতার মধ্যে মিশে যাবে (বিরজা, ব্রহ্মলোক) সেই অজানা জায়গা থেকে তুমি আর উঠতে পারবে না। কিন্তু আমি তোমাকে সেই ত্যাগ ও জ্ঞানের উপদেশ করব যা কৃষ্ণের প্রতি ভক্তি ও আত্মনিবেদনের আলিঙ্গন পায়। তা যদি তুমি গ্রহণ করতে পার তবে তোমার আভ্যন্তরীণ সত্ত্বা, তোমার প্রকৃত সত্ত্বা নিত্যকালের জন্যে সুখময় জীবনযাপন করতে পারে।'

'নৈষ্কর্ম্য' মানে যেখানে শ্রমের কষ্ট নেই। প্রেমময় শ্রম হল আত্মার আভ্যন্তরীণ, স্বাভাবিক ধর্ম্ম। আমাদের সাধারণ ধারণায় কর্ম্মের একটা ফল বা প্রতিক্রিয়া আছে। যেমন আমরা কর্ম্ম করি, তেমন মৃত্যুর দ্বারা আক্রান্ত হই, সবকিছুই ক্ষয় হয় ও অদৃশ্য হয়। কিন্তু শ্রীমদভাগবতমের উপদেশ দ্বারা এইসব বাধা দূর হয়ে গেছে। শ্রীমদভাগবতম এক আত্মনিবেদিত জীবনের উপদেশ দিয়েছেন, ভক্তির দ্বারা আলিঙ্গিত জ্ঞান

ও বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়েছেন। শ্রীমদভাগবতম বলেন, 'শোষণ ও ত্যাগকে ঝেড়ে ফেল। তোমাকে তাদের উপর নির্ভর করতে হবে না। তারা আত্মনিবেদনের মধ্যে একাত্ম হয়ে যাবে। ত্যাগ ও জ্ঞান ভক্তির মধ্যেই সম্পূর্ণ হয়ে গেছে আর সেই একইসঙ্গে তুমি তোমার ব্যক্তিসত্ত্বাকেও বজায় রাখতে পারবে।'

শ্রীমদভাগবতম জ্ঞান ও ত্যাগের সমন্বয় করেছেন ভক্তির মধ্যে তাদের জীবন দিয়ে। ভক্তির মাধ্যমে আমরা আমাদের ব্যক্তিসত্ত্বাকে, আমাদের ক্রিয়াকর্ম্মকে, আমাদের সম্ভাবনাকে বজায় রাখতে পারি আর সেই একই সঙ্গে জীবনে এক বিশাল শান্তি ও আনন্দ পেতে পারি। শ্রীমদভাগবতম আমাদের এক সুখময়, নিত্য জীবন অর্পণ করেছেন শুধুমাত্র জ্ঞান ও কর্ম্মের সঙ্গে আত্মনিবেদনকে যুক্ত করে।

তুমি কাজ করবে অথবা শক্তিসঞ্চয় করবে কিন্তু কর্ম্মের অধীনে আসবে না, তার কোন প্রতিক্রিয়া থাকবে না। তোমার শক্তি কেন্দ্রের জন্যে ব্যবহার হবে। ভগবদগীতা আমাদের বলেছেন, 'কেন্দ্রের জন্যে কাজ কর তা না হলে তুমি কর্ম্মফলের দ্বারা বদ্ধ হবে।' সুতরাং এটা খুব পরিস্কারভাবেই বোঝানো হয়েছে যে একটা খুব প্রশংসনীয় জীবন আমাদের পক্ষে সম্ভব যদি আমরা সর্বোচ্চ কেন্দ্রের কাছে আত্মনিবেদন করি। সেইরকম জীবন অসম্মানজনক বা ক্লান্তিকর নয়। তা অজ্ঞতাও নয়। সুতরাং শ্রীমদভাগবতমের উপদেশ অনুযায়ী এই পথ আমাদের অনুসরণ করা উচিত।

সেই প্রকৃত উৎস থেকে, প্রকৃত সাধুগণের কাছ থেকে যে উপদেশ আসছে তার প্রতি যদি আমরা মনোযোগ দিই এবং তার অনুসরণ করার চেষ্টা করি তবে আমরা যথার্থ সুসঙ্গতি পাব এবং এক যথার্থ উপলব্ধিকে বিকশিত করতে পারব। তখন সবকিছুরই সমন্বয় সাধন হবে। যাঁর এই উপলব্ধি আছে তিনি জ্ঞানের সর্বরকমের সম্ভাব্য তত্ত্ব ও অভিভাবকের উপরে বিজয়ী হবেন। কেবল মাত্র কৃষ্ণে ভক্তি ও আত্মনিবেদন দ্বারা আমরা এই দুঃখময় জগতের অজ্ঞতা থেকে মুক্ত হতে পারি।

ভক্ত হওয়ার অর্থ সেবা করা, সেবাই সর্ব্বস্ব। নিজেকে নিবেদনের

দ্বারা, নিজেকে বিতরণের দ্বারাই আমরা প্রকৃত জীবন খুঁজে পাব, আত্মপ্রতিষ্ঠার দ্বারা নয়। সেবার মধ্যে আমরা বেঁচে থাকতে পারি। সমস্ত বাধাবিঘ্ন, অসুবিধা দূর হয়ে যাবে যদি আমরা এই আত্মনিবেদনের ধারাকে গ্রহণ করতে পারি। সেখানে আমরা সবই পাব, আমাদের ব্যক্তিসত্ত্বা, সবচেয়ে অনুকূল বাতাবরণ, আমাদের সর্ব্বোচ্চ সম্ভাবনা। শুধু আমাদের দৃষ্টিকোণকে পালটাতে হবে। আর সেই দৃষ্টিকোণকে কেন্দ্র থেকে সংগ্রহ করতে হবে। কেন্দ্রের সম্পর্ক থেকে সবকিছুকে কেমন দেখাবে তা আমাদের অবশ্যই বোঝার চেষ্টা করতে হবে। যা কিছু আমরা দেখব কেন্দ্রের দৃষ্টিকোণ থেকে তার অবস্থান যেন আমরা বিশ্লেষণ করি। কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্কে তাঁর অবস্থান কোথায় তা যেন আমরা অবশ্যই নির্ধারণ করি। আর সেইরকম দৃষ্টিকোণ নিয়ে যে কোন জিনিসের সঙ্গে আমরা আমাদের সম্পর্ক চালু করতে পারি। এই দৃষ্টিভঙ্গী যদি আমরা বিকশিত করতে পারি তাহলে আমরা সব অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাব। এই হল শ্রীমদভাগবতমের শিক্ষা।

এই হল ভাগবত-দর্শনের বৈশিষ্ট্য। শ্রীমদভাগবত সবসময়ই বুদ্ধিবাদ ও ক্ষমতার উপর ও প্রভুত্বের উর্দ্ধে চিন্ময় প্রেম, চিন্ময় ভাব ও চিন্ময় অনুভূতির তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠা করেন। ক্ষমতার প্রভুর ও জ্ঞানের প্রভুর কোন মূল্য নেই যদি তারা প্রেমের প্রভুর বর্জ্জিত হয়। অন্য দিকে যার ক্ষমতা ও জ্ঞান নেই তার পক্ষে সম্ভব প্রেমের এলাকায় প্রবেশ করার, তার জীবন সফল। তার গতিবিধি আর কর্ম্মফলের মধ্যে পড়বে না। তার জ্ঞান হচ্ছে কৃষ্ণ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান (সম্বন্ধজ্ঞান)। এই জগতে বৈজ্ঞানিক গবেষণা দ্বারা যে জ্ঞান আমরা অর্জন করতে পারি, কৃষ্ণ সম্বন্ধে, তাঁর লীলা-পরিকর ও পার্ষদ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান সেই জ্ঞানের এলাকায় পড়ে না। এ জ্ঞান সেরকম নয়, এ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ।

আর দেবর্ষি নারদ এসেছিলেন বেদব্যাসকে উপদেশ দিতে, 'আপনার বর্ত্তমান গ্রন্থে আপনি এই তত্ত্বকে খুব পরিষ্কারভাবে প্রবর্ত্তন করুন। পূর্ব্বে বেদ, উপনিষদ ও মহাভারতে আপনি কর্ম্ম ও জ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই তত্ত্ব সেখানে তত পরিস্কার নয়। এখন

জ্ঞান ও কর্ম্ম থেকে স্বতন্ত্র হয়ে খুব পরিস্কার ভাবে ও যথাযথভাবে জীবনের পরিপূর্ণ সাফল্যকে, জীবনের পরম প্রয়োজনকে আপনি স্পষ্টভাবে ও যথাযথভাবে বর্ণনা করুন।' ক্ষমতা ও বুদ্ধিবাদী গবেষণা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে আমাদের হারানো ঐশ্বর্য্যকে আমাদের জীবনে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

অহংকারের ঢাকনা

কেবলমাত্র অহংকারের ঢাকনাকে আমাদের ভেঙ্গে ফেলতে হবে আর তখন চিন্ময় প্রেমের সহজাত ধারা প্রবাহিত হবে আর সে আপনার কাজ আপনি করবে। আমাদের ঘরে ফিরে যাওয়ার জন্যে এইরকম একটা ব্যবস্থা সেখানে রয়েছে। আমাদের মনে হবে না এ এক ক্লান্তিকর, শ্রমসাধ্য যাত্রা। বাইরে থেকে কোন নির্দেশ ছাড়াই আমাদের স্বাভাবিক আকর্ষণ দ্বারাই আমরা চালিত হব। আমাদের আপন ঘরের জন্যে সেখানে এক স্বতঃস্ফূর্ত্ত আকর্ষণ থাকবে, কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজন নেই। বরং আমাদের বুদ্ধিবাদ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও জাগতিক বাসনাকেই থামিয়ে দিতে হবে। এ সব অপ্রয়োজনীয়। এ কেবল মরীচিকার পিছনে ছোটা। আমাদের লক্ষ্যে এ আমাদের পৌঁছে দেবে না। আমাদের হৃদয় একে নাকচ করে দেবে। আমাদের চিন্ময় যাত্রায় সন্দেহের কোন অবকাশ থাকবে না। এই পথের মনোনয়ন হল স্বাভাবিক, সম্পূর্ণ ও অভ্রান্ত। সুতরাং এই স্বাভাবিক বস্তুকে আমাদের খুঁজে নেওয়া উচিত যা কোন দীর্ঘ গবেষণার ফল নয়। এ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমাদের ভিতরের অস্বাভাবিক প্রবৃত্তিকেই সরিয়ে ফেলতে হবে ও চিরতরে বিদায় জানাতে হবে।

আর আমাদের দীর্ঘদিনের ভুল যাত্রার প্রতিক্রিয়া হিসেবে যা কিছু আমরা সংগ্রহ করেছি তা সবই নিজে নিজেই ধোঁয়ার মত মিলিয়ে যাবে। তারা আর কোন সমস্যা আনবে না। এ বিষয়ে নিশ্চিত। কোন প্রতিক্রিয়া আর থাকবে না আর নতুন কিছু আবিষ্কারেরও কোন প্রয়োজন আর থাকবে না। একবার এই উপলব্ধি হলে আমরা দেখব যে আমাদের 'উন্নততর জ্ঞানের সভ্যতা' হল এক প্রয়োজনাতিরিক্ত আতিশয্য।

বুদ্ধিবাদের কোন প্রয়োজন নেই। ঠিক যেমন ছোট শিশু তার মাকে

চেনে, তেমনি আমরা আমাদের প্রকৃত গৃহকে চিনে নিতে পারি। বহু গরুর মধ্যে বাছুর তার নিজের মার কাছে ছুটে যায়। তারা একটা সহজাত গন্ধ পায়, একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাদের নির্দ্দেশ দেয়। ঠিক সেইভাবেই আমাদের যাত্রাতেও কোন অসুবিধা, কোন গবেষণা, কোন পরীক্ষানিরীক্ষা, কোন সন্দেহের প্রয়োজন নেই। কৃষ্ণে ভক্তি হল সহজাত, স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত্ত ও সুখময়। এ হল এক স্বতঃস্ফূর্ত্ত জীবন। এক সহজাত ধারা, এক স্বাভাবিক গতিবিধি।

আমাদের প্রকৃত আগ্রহ হল প্রেমের প্রতি। প্রেম সবকিছু থেকে স্বতন্ত্র। এ হল আমাদের অস্তিত্বের গূহ্যতম সারবস্তু। আমাদের বলা হয়েছে 'সত্যের গভীরে ডুব দাও। সত্যের গভীরে ডুব দাও আর সেই চিন্ময় প্রেমের রাজ্যে তুমি তোমার আপন গৃহকে খুঁজে পাবে। তুমি সেই মাটিরই সন্তান।' এই হল শ্রীমদভাগবতম ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী। আর এ কোন সামান্য তত্ত্ব নয়, এ কোন অস্পষ্ট, ধোঁয়াটে স্বপ্ন নয়। এ হল সবচেয়ে তীব্র ও মূর্ত্ত সত্য।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর চরিত্রে এই সত্যকে প্রকট করেছেন। যেসব সত্য বাইরের জগতে খুব স্পষ্ট বলে মনে হয় তাকে উপেক্ষা করে তিনি কি ব্যাকুলতার সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সন্ধান করেছেন, কি তীব্রতার সঙ্গে, কি গভীরতার সঙ্গে তিনি নিজেকে কৃষ্ণলীলায় মগ্ন রেখেছেন। সবকিছুকে ভুলে গিয়ে, আমাদের কাছে যা গুরুত্বপূর্ণ তাকে ঘৃণার সঙ্গে ত্যাগ করে তিনি সব কর্ম্ম, সর্ব্ব কর্ত্তব্যকে অবহেলা করেছিলেন। কৃষ্ণলীলার গভীরে ডুব দিয়ে তিনি তাতে এমনি তীব্রতা ও গভীরতার সঙ্গে মগ্ন ছিলেন এবং এমনইভাবে কৃষ্ণলীলা তাঁর সমস্ত হৃদয়কে অধিকার করে ছিল যে বাইরে থেকে দেখলে তাঁকে খুব অসহায় মনে হোত।

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীনাম

কৃষ্ণের শ্রীনামের মধ্যে যদি দিব্যভাব থাকে অর্থাৎ সাধক যদি ভক্তিভাবে তা জপ করেন তবেই তা কার্যকরী হয়। কৃষ্ণের শ্রীনাম, যা অনন্ত, তা আমাদের ভিতরের সব অবাঞ্ছিত বস্তুকে দূর করে দিতে পারে; কিন্তু সেই শ্রীনাম প্রকৃত আধ্যাত্মিক ধারণা দিয়ে বিভূষিত করতে হবে। এটা যেন শুধুমাত্র মুখ ও জিহ্বার সাহায্যে সৃষ্ট এক শারীরিক অনুকরণমাত্র না হয়। সেই শব্দ শ্রীনাম নয়। যদি তা বিশুদ্ধ ও অকৃত্রিম হয় তবে কৃষ্ণ, হরি, বিষ্ণু বা নারায়ণের শ্রীনাম অবশ্যই বৈকুণ্ঠ নাম হবে; তার চিন্ময় অস্তিত্ব থাকবে, তার পিছনে দিব্যকৃপা থাকবে। শ্রীনাম জপের জন্যে এই নীতিই সর্ব্বেসর্ব্বা।

আমরা সেই শব্দের ধ্বনিতেই আগ্রহী যার মধ্যে আধ্যাত্মিক গভীরতা আছে। শ্রীনামের শারীরিক অনুকরণ যথার্থ নাম নয়, তা শব্দব্রহ্ম নয়। জাগতিক ধারণার স্তর থেকে কেবল চিন্ময় শব্দের অনুকরণই আসতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণের শ্রীনাম হল শব্দব্রহ্ম; তার পিছনে নিশ্চয়ই কোন চিন্ময় পরিপ্রেক্ষিত থাকবে। এই শারীরিক ধ্বনির মধ্যে দিয়ে অবশ্যই কোন চিন্ময় বস্তু যেন পরিবেশিত হয়।

ওষুধের বাইরের কোষটাই ওষুধ নয় আসল ওষুধ ভিতরে আছে। বাইরে থেকে দেখতে গেলে সব ঔষধ কোষ বা ক্যাপসুল হয়ত একইরকম দেখতে। কিন্তু হয়ত তাদের একটির ভিতরে ওষুধ আছে, অন্যটির ভিতরে বিষ আছে। ক্যাপসুল নিজেই ওষুধ নয়। সেইরকম কৃষ্ণের নামের ধ্বনিই কৃষ্ণ নয়, সেই ধ্বনির ভিতরে কৃষ্ণ আছেন। কোন জাগতিক ভাবাবেগ নয়; প্রকৃত চিন্ময় চেতনা দিয়েই যেন শ্রীনামকে উজ্জীবিত করা হয়।

এমনকি যাঁরা শঙ্করাচার্য্যের নৈর্বক্তিক দর্শনের অনুকরণ্কারী তাঁদেরও এই বিশ্বাস যে জাগতিক শব্দের এলাকার মধ্যে শ্রীনাম বদ্ধ নয়। তাঁরা মনে করেন শ্রীনাম মানসিক স্তরে, সত্ত্বগুণের স্তরে আছে। দুভার্গ্যবশতঃ তাঁরা মনে করেন শ্রীনাম হল মায়া সৃষ্ট, তাই তাঁদের সিদ্ধান্ত হল হরি, কৃষ্ণ, কালী, শিব সব নামই এক ও সমান। রামকৃষ্ণ মিশন ও শঙ্করাচার্য্যের দর্শন দুইই এই মত প্রচার করেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত এসেছে ভুল ধারণা থেকে।

শুদ্ধনাম

শুদ্ধনামের উৎস অবশ্যই ভ্রান্তধারণা বা মায়ার এলাকার বাইরে থাকবে। জড়বিশ্বের সর্ব্বোচ্চ গ্রহ 'সত্যলোক' পর্য্যন্ত মায়ার এলাকা। সত্যলোকের পরে হল বিরজা নদী, ও চেতনার জগত ব্রহ্মলোক, আর তারপরে হল চিন্ময় আকাশ, পরব্যোম। কৃষ্ণের শুদ্ধনামের উৎস অবশ্যই পরব্যোম হবে। আর যদি আমরা এই তত্ত্বকে আরও বিশদভাবে পরীক্ষা করি তাহলে দেখব যে প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণের শ্রীনাম তাঁর আদি অস্তিত্বের স্তর থেকেই আসছে যা হল ব্রজ, গোলোক। এই উপলব্ধি থেকে বোঝা যাবে যে যদি শ্রীনামকে শুদ্ধনাম বলে বিবেচনা করতে হয় তবে তাঁর উৎস হবে নিশ্চয়ই বৃন্দাবনে, চিন্ময় জগতের সর্ব্বোচ্চ স্তরে।

কেবলমাত্র শারীরিক বা জাগতিক শব্দ কৃষ্ণের শ্রীনাম নয়। শ্রীনামের প্রকৃত ধারণা হওয়া খুব প্রয়োজন, শুধুমাত্র এই ভ্রান্ত ধারণার জগত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যেই নয়, বৃন্দাবনে কৃষ্ণের সেবা পাওয়ার জন্যেও। কেবলমাত্র কৃষ্ণের সেই প্রকৃত নাম যার উৎস বৃন্দাবনের স্তরে তাই আমাদের উত্তোলন করে সেখানে নিয়ে যেতে পারে।

তা না হলে যদিও নামের মধ্যে তেজ আছে তবুও যে শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে তার ভিত্তি যদি অন্য কোন ধারণার উপরে থাকে তবে সেই শব্দের ধ্বনি কেবলমাত্র আমাদের সেই ধারণার স্তরেই নিয়ে যাবে। এটা খুবই বৈজ্ঞানিক বা যুক্তিসঙ্গত ধারণা, এর মধ্যে অযৌক্তিক কিছু নেই। কৃষ্ণ এই শব্দ মাত্র শ্রীনাম নয়। যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল সেই শব্দের অর্থ, সেই

অর্থের গভীরতা, নামের অর্থের গভীর ধারণা। এই হল সর্ব্বস্ব — আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে এই সবচেয়ে প্রয়োজনীয়।

একটি ভাল কাহিনী আছে যা এই তত্ত্বকে আরও ভাল ব্যাখ্যা করতে পারে। যখন আমাদের গুরুদেব শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর অল্পবয়স্ক বালক ছিলেন তখন তিনি তাঁর পিতা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে কলকাতার নিকটে বর্দ্ধমান জেলায় শ্রীধাম কুলীনগ্রাম দর্শন করতে গিয়েছিলেন। 'কুলীনগ্রাম' নামে গ্রামে মহাবৈষ্ণব শ্রীহরিদাস ঠাকুর এবং অন্যান্য নানা বিখ্যাত বৈষ্ণব বাস করেছেন এবং সেই গ্রাম চারপুরুষ বৈষ্ণবের শ্রীপাট।

এক ভুতুড়ে মন্দির

তাঁরা সেই প্রাচীন শ্রীধাম দর্শন করতে গেলেন। যখন তাঁরা সেই গ্রামে প্রবেশ করতে যাচ্ছিলেন তখন ঠিক কুলীনগ্রামের বাইরেই তাঁরা এক প্রাচীন মন্দিরের পাশ দিয়ে গেলেন। হঠাৎ সেই সময় একজন লোক মন্দিরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন ও তাঁদের খুব বিনীতভাবে বললেন, 'দয়া করে আজ রাত্রিটা এখানে থাকুন। কাল সকালে গ্রামে গিয়ে সব শ্রীপাট দর্শন করতে পারবেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও আমাদের গুরুমহারাজ, — তিনি সেসময় বালক ছিলেন — তাঁরা সে রাত্রে সেই মন্দির গৃহে থাকলেন।

ঠিক রাত্রি হবার একটু পরেই, যখন তাঁরা বিশ্রাম করছিলেন তখন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এক অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করলেন। তিনি দেখলেন কে যেন চারিদিক থেকে ইটপাটকেল ছুড়ছে। তিনি ভাবলেন 'এটা কি ব্যাপার হচ্ছে আর কেনই বা হচ্ছে? কে এরকমভাবে বড় বড় ইটপাটকেল ছুড়বে? তখন তাঁর সন্দেহ হল যে হয়ত সেখানে কোন ভূত বাস করছে যে এরকম ঝামেলা করছে। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র জপ করতে লাগলেন। খানিকক্ষণের মধ্যে সব ঝঞ্ঝাট থেমে গেল আর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আর শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর বাকী রাত্রিটা শান্তিতে কাটালেন।

সকালবেলা তাঁরা গ্রামে প্রবেশ করে বিভিন্ন বৈষ্ণবের শ্রীপাট দর্শন করতে লাগলেন। খানিকক্ষণ পরে একজন স্থানীয় ভদ্রলোক তাঁদের লক্ষ্য করলেন। তিনি বললেন 'আপনারা আমাদের গ্রামে খুব ভোরেই এসেছেন। আপনারা কোথা থেকে এসেছেন? রাত্রে কোথায় ছিলেন?' শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বললেন, 'রাত্রে আমরা গ্রামের ঠিক বাইরেই যে মন্দির সেখানে ছিলাম। তখন তাদের একজন বলল, 'ওঃ! কেমন করে আপনারা ওখানে ছিলেন? কত ভূত ওখানে থাকে আর রাত্রে যে কেউ ঐ মন্দিরের পাশ দিয়ে যায় তার দিকে তারা ইটপাটকেল ছোড়ে। ওরকম জায়গায় থাকলেন কি করে?' তখন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বললেন যে, 'হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে যেই আমি দেখলাম এই সব ঝঞ্ঝাট হচ্ছে তখনই আমি উচ্চৈঃস্বরে 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র জপ করতে লাগলাম আর তার ফলে একটু পরেই সব ঝঞ্ঝাট থেমে গেল। গ্রামের লোকেরা তখন শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কে? কোথা থেকে এসেছেন?'

তখন তারা জানলেন যে তিনি হচ্ছেন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর। তারা ইতিপূর্বেই তাঁর নাম শুনেছেন, কেউ কেউ তাঁর গ্রন্থও পড়েছেন। তারা তাঁদের দুজনকে স্বাগত জানালেন এবং যেসব শ্রীপাট তাঁদের তখনও দেখা হয়নি সেসব দেখিয়ে দিলেন।

একসময় তারা শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে বললেন 'যে ভদ্রলোক পূর্ব্বে ঐ মন্দিরের পুরোহিত ছিলেন তিনি মৃত্যুর পরে ভূত হয়ে গেলেন। সেইসময় থেকেই আমরা নিয়মিতভাবে এই ভূতের ঝঞ্ঝাট দেখছি। তিনি ভূত হলেন কেন? ঐ মন্দিরের পুরোহিত হিসেবে তিনি নিয়মিতভাবে কৃষ্ণের শ্রীনাম জপ করতেন। আমরা এই সত্য প্রত্যক্ষ করেছি, আমরা তাঁর জপ শুনেছি। তবে তিনি ভূত হলেন কেন? এ আমরা বুঝি না। আপনি বুঝিয়ে বলুন।'

মুখের শব্দ মাত্র

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাদের বললেন ঐ পুরোহিত নিশ্চয়ই কেবল নাম-অক্ষরই জপ করেছেন। যে নাম তিনি জপ করেছিলেন তা মায়িক

শব্দ মাত্র ছিল, তা কেবল শারীরিক শব্দ, মুখের শব্দ। সেই নামের মধ্যে কোন চিন্ময় সারবস্তু ছিল না, তিনি যখন জপ করছিলেন সেই নামের মধ্যে প্রাণ ছিল না। তা কেবল নাম অপরাধ ছিল। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাদের জিজ্ঞেস করলেন 'পুরোহিতের চরিত্র কেমন ছিল?' তারা বললেন 'তিনি ভাল লোক ছিলেন না। তিনি অনেক পাপ করেছিলেন। তা আমরা জানি। কিন্তু এটাও আমরা অস্বীকার করতে পারি না যে তিনি প্রায় সবসময়ে ভগবানের নামজপ করতেন। তিনি ভুত হলেন কি করে?'

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বুঝিয়ে বললেন যে নামের বাহ্যিক ধ্বনিই যথার্থ নাম নয়। ঐ পুরোহিত নাম-অপরাধ করেছিলেন আর তারই ফলে তিনি ভুত হয়েছেন। তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন 'তাহলে কি করে এই দুর্দ্দশা থেকে তিনি মুক্তি পাবেন?' শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বললেন, 'যদি তিনি কোন প্রকৃত সাধু — যাঁর কৃষ্ণের সঙ্গে আন্তরিক যোগাযোগ আছে — তাঁর কাছ থেকে শুদ্ধ নাম শোনেন অথবা তাঁর শ্রীমুখ থেকে ভগবদগীতা বা শ্রীমদভাগবতমের যথার্থ ব্যাখ্যা শোনেন তবে এই ভূতযোনি থেকে তিনি মুক্তি পেতে পারেন। শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে জড়প্রকৃতির মায়াজাল থেকে উদ্ধার পাবার এই একমাত্র উপায়।' এই আলোচনার পরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কুলীনগ্রাম ছেড়ে চলে গেলেন।

সেইদিন থেকে কুলীনগ্রামের মন্দিরের ভুতের ঝঞ্ঝাট থেমে গেল। গ্রামবাসীরা তা দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। তাদের একজন বলল 'ঐ পুরোহিত যে ভুত হয়েছিল সে নিশ্চয়ই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীনামজপ শুনে তার ভুতদশা থেকে মুক্তি পেয়েছে। সে যখন ঝামেলা শুরু করেছিল তখন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করেছিলেন আর ক্রমশঃ তাঁর শ্রীমুখ থেকে কৃষ্ণের শুদ্ধনাম শুনে সেই অবদমিত আত্মা তার ভুতদশা থেকে মুক্তি পেয়ে গেল।

এরপর বহু লোক শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে দেখতে গেল। তারা তাঁকে বলত, 'আমাদের বিশ্বাস আপনি একজন মহান বৈষ্ণব — আপনার শ্রীমুখ থেকে কৃষ্ণের শ্রীনাম শুনে একটা ভুত মুক্তি পেয়ে গেল।' এই

ঘটনা কাগজে ছাপা হয়েছিল আর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে এই ঘটনা আবার বলেছেন।

আসল কথা হল কেবল এই যে নামের বাহ্যিক ধ্বনিই প্রকৃত নাম নয়। নামের পিছনে যে আত্মিক উপলব্ধি আছে তাই হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বস্তু, তাই হল প্রকৃত নাম। তা না হলে তো একটা টেপ রেকর্ডারও কৃষ্ণের শ্রীনাম উচ্চারণ করতে পারে। এমনকি তোতাপাখীও কৃষ্ণের শ্রীনাম উচ্চারণ করতে পারে, কিন্তু সেই বাহ্যিক শব্দ আসল জিনিস নয়। নামের পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চয়ই চিন্ময় সত্য থাকতে হবে, যা চেতন। সেই অপ্রাকৃত জ্ঞান এই জড়জগতের জ্ঞানের অতীত।

মনের অতীত শ্রীনাম

শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু একটি শ্লোকে এই উপলব্ধিকে সমর্থন করেছেন ঃ

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ।।

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ব ২/২৩২)

'অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রাকৃত চক্ষু-কর্ণ-রসনাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, যখন জীব সেবোন্মুখ হন অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখনই জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে নামাদি স্বয়ং স্ফূর্ত্তিলাভ করেন।'

শ্রীল রূপ গোস্বামী বলছেন, কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, নিত্যপার্ষদ — বা তাঁর সম্বন্ধে কোনকিছুই প্রাকৃত নয়, পরন্তু শুদ্ধ চিন্ময়। আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয় দিয়ে তা দেখা বা জানা যায় না। শুধুমাত্র 'কৃষ্ণ' শব্দ উচ্চারণ করে আমাদের জিহ্বা কৃষ্ণকে জানতে পারে না, আমাদের নাসিকায় তাঁর দেহের চিন্ময় সুগন্ধের ঘ্রাণ আসে না, তাঁর অপূর্ব্ব সুন্দর শ্রীমূর্ত্তি যা মনের অতীত তা আমাদের নয়নের দর্শনে আসে না। এ কেবল শারীরিক ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধেই সত্য নয়, মনের সম্বন্ধেও সত্য। আমাদের মন কৃষ্ণকে ধারণা করতে পারে না। তিনি চিন্ময় ও মনের অতীত। আমাদের আয়ত্বে যত জ্ঞান আছে তাঁর অস্তিত্ব তার অতীত।

আমরা কর্ত্তা হয়ে কৃষ্ণকে আমাদের অধীন করতে পারি না। তিনিই

কর্ত্তা। আত্মা এবং পরামাত্মা দুইয়েরই অতীত তাঁর অস্তিত্ব। আমরা যেন কখনও তা ভুলে না যাই। তিনি কোন স্তরে রয়েছেন সে সম্বন্ধে আমাদের সর্ব্বদা সচেতন থাকতে হবে। সীমিত আত্মা হিসেবে আমরা হলাম তটস্থা জীব — শ্রীভগবানের তটস্থা শক্তি। ক্ষুদ্র জীব কেবল তাই জানতে বা চিন্তা করতে পারে যা তার থেকেও স্থূল; কিন্তু যা তার চেয়ে সূক্ষ্ম তা জানার চেষ্টা করতে গেলে তখন সে অসহায় বোধ করে। সেই উচ্চতর চিন্ময় রাজ্যের সঙ্গে একটা যোগাযোগ তখনই সম্ভব যখন সেই উচ্চতর এলাকা এই নিম্নস্তরকে তাঁর দিকে তুলে নিয়ে যাবে। তাই শুধু আত্মনিবেদন ও সেবার দ্বারাই তাঁকে জানা সম্ভব ("সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ")।

চিন্ময় দাসত্ব

আত্মনিবেদনের ধারাকে যদি আমরা গ্রহণ করতে পারি — বর্ত্তমানে আমরা যে অবস্থায় আছি যদি তার থেকে মরতে পারি আর আমাদের গূহ্যতম অন্তর্নিহিত সত্ত্বাকে যদি তাঁর শ্রীচরণে নিবেদন করতে পারি — তাহলে তিনি সহজেই তাঁর চিন্ময় স্তরে আমাদের তুলে নেবেন। সেই ধারার মধ্যে আমাদের আত্মা যেন একটি ঘাসের বা পাতার মত সেই তরঙ্গে চালিত হয়ে অনন্তের কেন্দ্রে উঠে যাবে। এমন নয় যে আমরা নিজেরাই সেখানে প্রবেশ করব আর গর্ব্বের সঙ্গে পা চালিয়ে চলব যেমন আমরা এই স্থূল জড়জগতে চলি। এখানে আমরা পা দিয়ে চলি সেখানে আমরা মাথা দিয়ে চলব। কেবলমাত্র আমাদের মাথার উপর শ্রীভগবানের কৃপার দ্বারাই আমরা সেই স্তরকে আকর্ষণ করতে পারি আমাদের সেখানে তুলে নেওয়ার জন্যে।

আমাদের নিজেদের অস্তিত্ব থেকে সেখানে সবকিছুই গুণগতভাবে শ্রেষ্ঠ। সেই চিন্ময় রাজ্যের বিষয়বস্তু, সেখানকার বাতাবরণ, সেখানকার হাওয়া, সেখানকার আকাশ — সেখানকার সবকিছুই এখানে আমাদের যা কিছু মূল্য আছে তার চেয়ে বেশী। শুধু যাঁদের মধ্যে আন্তরিক সেবাপ্রবৃত্তি আছে তাঁদেরই সেখানে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়। সেখানকার অধিবাসীরা, যাঁরা পূজনীয়, উদার, প্রীতিপূর্ণ ও শুভাকাঙ্খাপূর্ণ,

তাঁরা এই নবাগতদের চিন্ময় প্রেমের সর্ব্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যাবেন।

সেখানে যাওয়ার সুযোগ পাওয়ার একটা সম্ভাবনা আমাদের আছে; কিন্তু শুধুমাত্র চিন্ময় কৃপার মারফত, কখনই অধিকারের মারফতে নয়। এই তত্ত্বকে আমাদের প্রথম থেকেই গ্রহণ করতে হবে। তবুও সেখানকার বাতাবরণ এমনই সুখময় ও প্রেমময় যে কেউই সেখানে প্রভু ও ক্রীতদাসের মধ্যে কোন পার্থক্য অনুভব করেন না। যে ক্রীতদাস সে অনুভব করে না যে সে ক্রীতদাস। সকলেই সেখানে একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এই চিন্ময় ক্রীতদাসত্বের দশা লাভ করার পরে একজনের চিন্তা করা উচিত যে 'আমি হলাম ক্রীতদাস — কৃষ্ণ ও তাঁর নিত্যপার্ষদগণের বদান্যতাই (সেবাঅধিকার দেওয়ার) আমার ঐশ্বর্য্য। কিন্তু সেই স্তরে যাঁরা উন্নীত হন, তাঁরা যোগমায়ার শক্তিতে মোহিত হয়ে ভুলে যান যে তাঁরা ক্রীতদাস। সেই বাতাবরণ যেখানে প্রেমের ধারা তীব্রভাবে বয়ে চলে সেখানকার মহত্ব ও উদারতা হল এইরকম। আমাদের সৌভাগ্যের দ্বারা নয়, কেবলমাত্র তাঁদের প্রেমের দ্বারাই আমরা সেই উচ্চ ও মহান ভূমিতে প্রবেশ লাভ করতে পারি।

কিন্তু এইটা উপলব্ধি করার জন্যে আমাদের বুঝতে হবে কৃষ্ণের নাম, রূপ ও নিত্যপার্ষদগণের চিন্ময় অবস্থানটা কোথায়। শুধুমাত্র নামের অক্ষরকে জিহ্বার দ্বারা ধ্বনিত করেই আমরা কৃষ্ণের নামকে ধরে ফেলতে পারি না। রাবণ সীতাদেবীকে বন্দী করতে চেয়েছিল এবং ভেবেছিল সে তাই করেছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হল এই যে সে সীতাদেবীর চিন্ময় দেহকে স্পর্শও করতে পারেনি। রাবণ যাকে বন্দী করেছিল সে ছিল কেবল সীতাদেবীর মায়িক প্রতিমা, তাঁর প্রাকৃত জুড়ি, তাঁর অনুকরণে সীতাদেবীর একটি মূর্ত্তি মাত্র। সীতাদেবী স্বয়ং অন্য বস্তু। তিনি রক্তমাংসের তৈরী নন। এই জড়জগতের কোন ব্যক্তির পক্ষে সীতাদেবী ও তাঁর চিন্ময় জগত ধরাছোঁয়ার বাইরে। প্রাকৃত জীব সেই জগতকে দেখতে ও অনুভব করতে পারে না সেখানে প্রবেশ করতে পারে না — সীতাদেবীকে ধরা বা তাঁকে কোথাও নিয়ে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। শাস্ত্র ব্যাখ্যা করেছেন যে সীতাকে বন্দী

করা নাটকের মত ছলনা মাত্র ছিল। রাবণ প্রবঞ্চিত হয়েছিল। অবশ্য রাবণের দ্বারা সীতার এই আপাতদৃষ্টির বন্দীদশাও ঘটেছিল কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে, এই জড়জগতের লোকদের কিছু শিক্ষা দেওয়ার জন্যে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শ্রীভগবানের নিত্যপার্ষদগণ যাঁরা বৈকুণ্ঠে বাস করেন. কোন রাবণ তাঁদের কারও সংস্পর্শে আসতে পারে না। সেই একই ভাবে শুধু শব্দের অনুকরণ করে কোন প্রাকৃত জীব সেই বৈকুণ্ঠ নামের অনুকরণ করতে পারে না।

একটি ছেলে যে এক দুর্ঘটনায় মারা গিয়েছিল তার সম্বন্ধে সম্প্রতি আমাকে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল। আমি শুনলাম মৃত্যুর সময় ছেলেটি চিৎকার করে কৃষ্ণের নাম উচ্চারণ করেছিল। তাঁরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন 'ঐ ছেলেটির গন্তব্য বা নিয়তি কি?' আমি তাঁদের বুঝিয়ে বললাম যে এই রক্তমাংসের স্তরে কারো বয়স কম কি বেশী সেটা আধ্যাত্মিক সাফল্যের জন্যে কোন যোগ্যতা নয়। একজনের মানসিকতাই নিশ্চয়ই জানা দরকার। স্থান কাল পাত্র বিশেষে এবং পাত্রের ধারণা বিশেষে নামের শব্দ প্রকৃত নাম হতে পারে অথবা তা নামাভাস বা নামের ছায়া মাত্র হতে পারে।

জাতীয় নাম

গাঁন্ধীকে যখন গুলি করা হল তখন তিনি 'হে রাম, হে রাম' বলে উঠেছিলেন। তিনি একটি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় বক্তৃতা দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তাঁর মন অধিকার করেছিল জাতীয় প্রগতি সম্বন্ধে চিন্তা। তাই তাঁর ক্ষেত্রে নামের ধ্বনি হয়ত জাতি-গঠনের স্তরেই কাজ করেছে। মৃত্যুর সময়ে কারও গন্তব্যকে বুঝতে হলে আমাদের এই প্রশ্নই করতে হবে যে 'সে সময় তার মানসিকতা কি ছিল?'

কখনও কখনও নামজপ কেবল নামাভাসেই পরিণত হতে পারে। সেই নাম শুদ্ধনাম হচ্ছে কিনা তা নির্ভর করে যিনি নামজপ করছেন তাঁর মানসিকতার উপরে। তা নির্ভর করে তাঁর উদ্দেশ্যের উপরে, কৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের উপরে।

গোপী! গোপী! গোপী!

সন্ন্যাস নেবার কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু 'গোপী গোপী গোপী' এই নামজপ করছিলেন। তাই শুনে একজন তান্ত্রিক ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে কিছু উপদেশ দিতে এলেন। তিনি বললেন 'পন্ডিত, তুমি তো বিদ্বান্। শাস্ত্র সবই জান। তবে 'গোপী গোপী' নাম জপ করছ কেন? এতে তোমার কি উপকার হবে? শাস্ত্র বলেন কৃষ্ণ নাম জপ করতে, তাতে তোমার কিছু উপকার হতে পারে। বহু শাস্ত্রে, বিশেষ করে পুরাণে তুমি তা দেখবে। তবে তুমি 'গোপী গোপী' জপ করছ কেন?'

ব্রাহ্মণের অজ্ঞতা দেখে মহাপ্রভু ক্রুদ্ধ হলেন, তিনি গোপী আনুগত্যের ভাবে তাকে একটা লাঠি নিয়ে তাড়া করলেন ও তাকে তিরস্কার করতে লাগলেন। 'তুমি শত্রুর দল থেকে এসেছ আমাদের কৃষ্ণের দলে নিয়ে যাবার জন্যে?' তিনি ব্রাহ্মণকে লাঠি দিয়ে মারবেন বলে তাড়া করলেন। এই উদাহরণে আমরা দেখি যে মহাপ্রভু কৃষ্ণ নাম উপেক্ষা করে 'গোপী গোপী' জপ করেছিলেন। বাহ্যতঃ তাঁকে কৃষ্ণ নামের উপদেশ দেওয়া হয়েছিল আর তিনি তাতে রেগে গিয়েছিলেন — কিন্তু এর গভীরে কি চিন্তা, কি তত্ত্ব আছে?

কারও শ্রীনামজপের প্রভাবকে বুঝতে গেলে আমাদের নিশ্চয়ই তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যকে বুঝতে হবে। কখনও তার নামজপের কোন ফল হতে পারে, কিন্তু সবসময় নাও হতে পারে। তবু শ্রীল জীব গোস্বামী একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়েছেন যে যদি সে শ্রীনামের অর্থ সম্বন্ধে সচেতন নাও থাকে তবুও সে শ্রীনামের কিছু ফল পেতে পারে।

একদা এক মুসলমান এক বন্য শূকর দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল। সে 'হারাম হারাম' বলে চিৎকার করে উঠেছিল। 'হারামে'র অর্থ 'ঘৃন্য শূয়োর' কিন্তু অন্যদিকে 'হা রাম' বলতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রকে বোঝায় (যাঁর অনুমোদনে এখানে বন্য শূয়োর আমাকে আক্রমণ করেছে)। কোনভাবে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের উদ্দীপন হয়েছিল এবং তাঁর শ্রীনামের দিব্যপ্রভাব সেই মুসলমানের উপরে পড়ায় সে মুক্তি পেয়ে গেল।

শাস্ত্রে আর একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে বাল্মিকীর সম্বন্ধে। সাধু হওয়ার পূর্ব্বে ঋষি বাল্মিকী একজন দস্যু ছিলেন — 'দস্যু রত্নাকর'। কিন্তু নারদ দস্যু রত্নাকরের মঙ্গলের জন্যে একটা পরিকল্পনা করলেন। নারদমুনি চিন্তা করলেন যে 'এই লোকটির মত কুখ্যাত জঘন্য দস্যু আমি আর দেখিনি। শ্রীনামের দিব্যপ্রভাব আমি এর উপরে পরীক্ষা করে দেখব। আমি একে রামের শ্রীনাম জপ করতে বলব। তিনি চেষ্টা করলেন কিন্তু দস্যু রত্নাকর রামের শ্রীনাম উচ্চারণ করতে পারলেন না। তখন নারদমুনি তাকে বললেন রামের উলটো শব্দ 'মরা' উচ্চারণ করতে। তখন দস্যু বলল 'হ্যাঁ আমি তা উচ্চারণ করতে পারি। তখন সে জপতে লাগল — 'মরা মরা মরা রাম রাম রাম'। এইভাবে খানিকক্ষন পরে 'মরা' 'রাম' হয়ে গেল। দস্যু রত্নাকর 'রাম' নাম জপতে লাগল এবং ক্রমশঃ তার মানসিক ভাবের পরিবর্ত্তন হল। সুতরাং কারোর যদি শ্রীনামের অর্থ সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা নাও থাকে তবুও তার উপরে নামের কিছু প্রভাব পড়া সম্ভব। একেই বলা হয় 'নামাভাস' বা নামের ছায়া। নামাভাস মুক্তি দিতে পারে। কিন্তু কোন প্রকৃত ভক্ত মুক্তিতে আগ্রহী নন। তিনি চাইবেন চিন্ময় সেবার জগতে প্রবেশ করতে।

নামের শব্দ ও তার ফল নির্ভর করে আমরা কি মনোভাবে গ্রহণ করেছি তার উপর এবং আমরা কি গুণ ধারণা করতে পারি তার উপর, কারণ প্রকৃত বৈকুণ্ঠ নাম হল অনন্ত। সেই জগতে শ্রীনাম তার তত্ত্বের সঙ্গে সমান। যখন নামের শব্দ নামের আদি তত্ত্বের সঙ্গে এক ও সমান তখন তা হল বৈকুণ্ঠ নাম। এই জগতে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন হতে পারে, যদিও আসলে সে কানা। নামের থেকে নামধারী সম্পূর্ণ পৃথক হতে পারে। কিন্তু বৈকুণ্ঠে, অনন্তের জগতে, নাম ও নামী এক ও অভিন্ন।

তবু সেই বৈকুণ্ঠ নামকে অনুভব করার জন্যে আমাদের নামাপরাধ ও নামাভাস দুইই ত্যাগ করতে হবে। নামাভাসের দ্বারা আমরা এই জাগতিক বন্ধন থেকে খানিকটা মুক্তি পাই আর নামাপরাধের দ্বারা আমরা এই মায়িক জগতের জালে জড়িয়ে পড়ি। কিন্তু সাধারণ বাহ্যিক বা শারীরিক শব্দ সেই শুদ্ধ নাম, যা অপ্রাকৃত, তাকে প্রকাশ করতে পারে না।

বলা হয়েছে এক কৃষ্ণনাম যত অজ্ঞতা ও পাপ হরণ করতে পারে মানুষের সাধ্য নেই তত পাপ করার। কিন্তু সেই একটি নামের গুণগত যোগ্যতা কি? আমরা বহুবার কৃষ্ণের বাহ্যিক নাম জপ করতে পারি, একটিমাত্র শুদ্ধনাম জপের ফল না পেয়ে। নামের সাধারণ শব্দের সঙ্গে, অগভীর মায়িক নামের সঙ্গে, শুদ্ধ নামের বিরাট পার্থক্য আছে। শুদ্ধনাম কৃষ্ণের সঙ্গে এক ও অভিন্ন, কিন্তু আমাদের স্তরে তা অবতরণ করে কেবল তাঁরই কৃপার দ্বারা। কেবলমাত্র মুখ ও জিহ্বার আন্দোলন দ্বারা সেই নামকে আমরা ধ্বনিত করতে পারি না। কৃষ্ণের শুদ্ধনাম মুখের মধ্যে নেই, হৃদয়ের মধ্যে আছে। শেষপর্যন্ত তা হৃদয়কে অতিক্রম করে কৃষ্ণের শ্রীধামে পৌঁছে যায়। কৃষ্ণ যখন নেমে আসেন, তখন কৃষ্ণের নাম হৃদয়ের মধ্যে দিয়ে এসে মুখ ও জিহ্বাকে আন্দোলিত করায়। সেই আন্দোলনই কৃষ্ণ নাম।

দৈন্যময়ী শক্তি

কৃষ্ণ যখন চিন্ময় জগত থেকে শব্দরূপে হৃদয়ে অবতরণ করেন এবং হৃদয় থেকে স্নায়ুতন্ত্রের সমস্ত অংশ অধিকার করে মুখের মধ্যে এসে নৃত্য করেন সেই হল কৃষ্ণনাম। তার উৎস হল চিন্ময় জগতে। সেই শব্দের সৃষ্টি শারীরিক স্তরে নয়। সেই চিন্ময় শব্দকে এই স্তরে নেমে আসতে হবে, তিনি নেমে আসতে পারেন, কিন্তু আমরা এত সহজে সেখানে উঠে যেতে পারি না। তিনি হলেন পরমকর্ত্তা, আমরা তাঁর অধীনে আছি। তাঁর স্বতন্ত্রতার মধ্যে আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারি না। কেবলমাত্র আত্মসমর্পণের দৈন্যময়ী শক্তির দ্বারাই আমরা সেই পরমপুরুষকে আকর্ষণ করতে পারি আমাদের স্তরে নেমে আসার জন্যে। সুতরাং শ্রীনাম আমাদের ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি নয়। শ্রীনামকে তখনই উপলব্ধি করা যাবে যখন আমরা শ্রীভগবানের কাছে যাব তীব্র সেবার মনোভাব নিয়ে। সেইসময়ে আমাদের সেবাপ্রবৃত্তি দ্বারা আকর্ষিত হয়ে কৃষ্ণ নিজেই নেমে আসতে পারেন তাঁর কৃপার দ্বারা। তখন তিনি এই পঞ্চভূতাত্মক ক্ষেত্রকে অধিকার করতে পারেন, ও চিন্ময় শব্দ ধ্বনিত করতে পারেন আর এই প্রাকৃত স্তরে নৃত্য করতে পারেন। সেই হল শ্রীনাম, সেই হল বৈকুণ্ঠ নাম, কৃষ্ণের প্রকৃত নাম।

আমাদের মুখ দিয়ে তা আমরা সৃষ্টি করতে পারি না। আমাদের শরীর বা মন দিয়ে যে কাজ আমরা সৃষ্টি করি তা কৃষ্ণ নয়। আমরা যে কোন শব্দই সৃষ্টি করি না কেন তার থেকে তিনি স্বতন্ত্র আর তবুও যেহেতু তিনি সবকিছুর নিয়ন্তা, তাই যে কোন জায়গায়, যে কোন রূপে, যে কোন স্তরে, যে কোন শব্দে তিনি আবির্ভূত হতে পারেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় একথা সমর্থন করা হয়েছে। সেখানে (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪/৬) কৃষ্ণ বলেছেন, 'আমি জন্ম-মৃত্যু-রহিত নিত্য-বিগ্রহ এবং সমস্ত জীবের নিয়ামক হয়েও নিজ স্বরূপে অধিষ্ঠিত থেকে স্বেচ্ছায় যোগমায়া বিস্তার-পূর্ব্বক জগতে আবির্ভূত হই।' কৃষ্ণ যখন আসেন তখন জড়জগতের তরঙ্গকে তিনি জোর করে পিছনে সরিয়ে দেন, যেমন আকাশে যখন এরোপ্লেন ওঠে তখন সে হাওয়ার গতিকে পিছনে সরিয়ে দিয়ে জোরের সঙ্গে উড়ে চলে। জড় তরঙ্গের প্রভাবকে সরিয়ে দিয়ে তিনি এই জগতে আবির্ভূত হন তাঁর নিজের শক্তির জোরে।

শ্রীভগবান বলেন, 'আমার নিজস্ব শক্তি আছে, আর সেই স্বরূপশক্তির জোরে আমি এই স্থূল বহিরঙ্গা শক্তিকে সরিয়ে দিই। এইভাবে আমি এই পৃথিবীতে আসি ও এখানে লীলা করি।' বহিরঙ্গা শক্তির নিয়মকানুন তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। তাঁর বিশেষ শক্তি আছে। সেই বিশেষ শক্তির জোরে তিনি জড়প্রকৃতির শক্তিকে দমিয়ে রেখে এখানে আসেন। তাঁর যা ইচ্ছা হয় তিনি তাই করেন তাঁর স্বরূপশক্তির দ্বারা। তিনি যেখানেই যান সেখান থেকেই জড়প্রকৃতির নিয়মকানুন সরে যায় আর তাঁর লীলার পথ করে দেয়। এইভাবে তিনি তাঁর শ্রীনাম হয়ে শব্দের রাজ্যে আবির্ভূত হন।

নামের প্রকৃত গুরুত্ব শুধুমাত্র তার অক্ষররচনার মধ্যে নেই, পরন্তু সেই চিন্ময় শব্দের যে গূঢ় অর্থ — তার মধ্যেই আছে। কোন কোন পন্ডিতরা তর্ক তোলেন যে 'কলি-সন্তরণ' উপনিষদে ব্রহ্মাজী বলেছেন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র তখনই ঠিকভাবে উচ্চারিত হবে যখন রামের নাম কৃষ্ণের আগে আসবে : 'হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে। হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।'

কৃষ্ণনাম

কলি-সন্তরণ উপনিষদে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র এইভাবে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রামের নাম অবশ্যই কৃষ্ণের আগে আসা উচিত এই ধারণা একটা অপেক্ষাকৃত অগভীর উপলব্ধি থেকে আসে। বলা হয়েছে যে, যেহেতু এই মন্ত্র উপনিষদ থেকে এসেছে সুতরাং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র হল বৈদিক মন্ত্র, তাই সাধারণ লোক সেই মন্ত্রে প্রবেশ করতে পারেননি। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই মন্ত্রটিকে অন্যভাবে সাজিয়েছেন। একে উলটো করে দিয়েছেন এবং তার ফলে এটি আর বৈদিক মন্ত্র থাকল না এবং বৈদিক নিয়মকানুন অগ্রাহ্য করে তিনি সর্ব্বসাধারণের মধ্যে এই মন্ত্র বিতরণ করেছেন এরকম কথা অনেকে বলেন। উত্তরপ্রদেশের কিছু ভক্ত যাঁদের শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি প্রীতি আছে তাঁরা এই মত পোষণ করেন।

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস হল এই যে প্রথমে 'হরে রাম' বলতে হবে এই তত্ত্বটি একটি অগভীর তত্ত্ব। এই তত্ত্বের পিছনে যে ধারণাটি আছে সেটি হল এই যে যেহেতু রাম অবতার প্রথমে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং কৃষ্ণ অবতার পরে, তাই মহামন্ত্রে রামের নাম আগে আসা উচিত। কিন্তু আর একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে যে যখন দুটি সমপ্রকৃতির বস্তু একসঙ্গে যোগযুক্ত আছে তখন তাদের মধ্যে কার গুরুত্ব বেশী তা তাদের ঐতিহাসিক কালের উপরে (অর্থাৎ কার আবির্ভাব আগে ও কার আবির্ভাব পরে তার উপর) নির্ভর করবে না, পরন্তু দুটির মধ্যে কোনটি উচ্চতর পরিণত বিকশিত তত্ত্ব — তার উপর নির্ভর করবে। কৃষ্ণের শ্রীনামের স্থান রামের শ্রীনামের স্থানের উর্দ্ধে। পুরাণে বলা হয়েছে রামের তিনটি নাম কৃষ্ণের একটি নামের সমান। কৃষ্ণনাম রাম নামের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যেখানে দুই বস্তু একসঙ্গে যোগযুক্ত অছে সেখানে দুইয়ের মধ্যে যা শ্রেষ্ঠ তাকেই প্রথম স্থান দিতে হবে। তাই মহামন্ত্রে কৃষ্ণনাম অবশ্যই আগে আসবে।

এই হল একটি তত্ত্ব। আর একটি তত্ত্ব হল এই যে শ্বাশ্বত নিত্যস্তরে সবকিছুই বৃত্তাকারে বা চক্রের মত ঘুরছে। সেই শ্বাশ্বত নিত্য বৃত্ত বা চক্রের

মধ্যে কি আগে কি পরে তা নির্ধারণ করা যাবে না। তাই শাশ্বত নিত্যলীলার স্তরে বলা যাবে না যে কৃষ্ণ রামের আগে আসেন, না, রাম কৃষ্ণের আগে আসেন। সুতরাং এই তত্ত্বের ভিত্তিতেও যেহেতু কৃষ্ণ ও রামের নাম নিত্য এবং কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কিত নয় তাই এই মন্ত্র যে কোন জায়গা থেকেই শুরু করা যায়।

রাম মানে কৃষ্ণ

কিন্তু এই দুটি তত্ত্বের উপরে আমাদের সম্প্রদায় অন্য একটি উচ্চতর তত্ত্ব দিয়েছেন। একটি গভীর বিশ্লেষণের দ্বারা এই তথ্য উদ্ঘাটিত হবে যে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র রামলীলার সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। হরেকৃষ্ণ মন্ত্রে যেখানে রামের নাম আছে সেখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ 'রাধারমণ রাম'কে পান। 'রাধারমণ রামে'র অর্থ 'কৃষ্ণ' যিনি শ্রীমতী রাধারানীকে আনন্দ (রমণ) দেন।' আমাদের ধারণা বা উপলব্ধিতে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র সম্পূর্ণ কৃষ্ণ-চেতনাময়, রাম চেতনাময় নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব সর্ব্বদাই স্বয়ং ভগবানের সম্বন্ধে, কৃষ্ণলীলা রাধাগোবিন্দ লীলা সম্বন্ধে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর আবির্ভাব ও শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যই তাই। সেই উপলব্ধির পরিপ্রেক্ষিতে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রে অযোধ্যার রামলীলার উল্লেখ নেই। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের সর্ব্বোচ্চ তত্ত্বের সঙ্গে এই রামলীলার যোগাযোগ নেই।

তাই মন্ত্রের অন্তর্নিহিত তত্ত্ব আমাদের আধ্যাত্মিক সিদ্ধিলাভের কারণ। যখন এই মন্ত্রে কেউ রাম নাম উচ্চারণ করবে তখন যদি সে দাশরথি রামকে স্মরণ করে তবে সে সেখানেই, সেই অযোধ্যার দিকে আকৃষ্ট হবে। কেউ যদি পরশুরামকে স্মরণ করে তবে সে অন্যত্র আকৃষ্ট হবে। আর যদি কেউ রাম বললে রাধারমণ রাম কে স্মরণ করে তবে সে গোলোকে যাবে। ভক্তের অন্তর্নিহিত উপলব্ধিই তাঁকে তাঁর গন্তব্যের দিকে নিয়ে যাবে।

আমার পূর্ব্বাশ্রমের নাম ছিল 'রামেন্দ্র চন্দ্র'। শ্রীল প্রভুপাদ আমাকে দীক্ষার সময়ে 'রামেন্দ্র সুন্দর' নাম দিলেন। আমি প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করলাম 'রামেন্দ্র মানে কি? তিনি বললেন আমাদের উপলব্ধিতে 'রাম'

মানে দাশরথি রাম বা শ্রীরামচন্দ্র নয়। রাম মানে রাধারমণ রাম — কৃষ্ণ, রাধারাণীর দয়িত।

'হরে' এই নামেরও বিভিন্ন অর্থ হতে পারে বিভিন্ন উপলব্ধি অনুযায়ী। এই মন্ত্রে 'হরে' শব্দের অর্থ যে রাধারাণী তাও নির্ধারিত হবে যিনি জপ করছেন তাঁর আধ্যাত্মিক পরিণতি, যোগ্যতা বা অধিকার দ্বারা। যখন কেউ সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে রাধাকৃষ্ণের তত্ত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত হবেন, সমস্ত সৎ চিন্তার অন্তর্নিহিত তত্ত্বের মধ্যে শ্রীভগবানের স্বয়ংরূপকে খুঁজে পাবেন — তখন তিনি এই অর্থকেই খুঁজে পাবেন, অন্য কিছুকে নয়।

কনিষ্ঠ অধিকারীর পক্ষে হরেকৃষ্ণ মন্ত্রে 'হরে' শব্দের অর্থ 'হরি' হতে পারে। সে এক অর্থ। আবার নৃসিংহদেবকেও বোঝাতে পারে। যেমন 'রাম' বলতে দাশরথি রামকে বোঝাতে পারে তেমন 'কৃষ্ণ' বলতেও কৃষ্ণের বিভিন্ন অংশ, কলা বা অবতারকে বোঝাতে পারে। বৈকুণ্ঠতেও এক কৃষ্ণ আছেন যেখানে তাঁর বৈভব বা অংশের সংখ্যা ২৪। বৈকুণ্ঠতে প্রথমে নারায়ণ আছেন, তারপর তাঁর চার বৈভব আছেন, বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। এই চারজনের আরও পাঁচ বৈভব আছেন — সব মিলিয়ে চব্বিশ। এঁদের একজন বৈকুণ্ঠের কৃষ্ণ। এছাড়া আছেন দ্বারকার কৃষ্ণ আর মথুরার কৃষ্ণ।

এইভাবে কৃষ্ণের নানাতত্ত্ব আছে। কিন্তু কৃষ্ণের সর্বোচ্চ তত্ত্ব হলেন বৃন্দাবনের কৃষ্ণ রাধাগোবিন্দ। যখন কেউ সেই তত্ত্ব থেকে নিজেকে সরাতে পারে না তখন সে শ্রীভগবানকে চিন্তা করবে হরি-হরা ভাবে। সে রাধাকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছুই দেখবে না। যারা সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে মধুররসে প্রতিষ্ঠিত আছেন — সর্বোচ্চ চিন্ময় দর্শন যাদের আছে — তাঁরা কিছুতেই সেই স্তর থেকে নেমে আসতে পারেন না। আর যদি তাঁরা তা করেন তা কেবল রাধাগোবিন্দের জন্যেই, তাঁদেরই কোন সেবার জন্যে। সেক্ষেত্রে ভক্ত যে কোন জায়গায় যেতে পারেন, কিন্তু তাঁর প্রকৃত আকর্ষণ সেই বৃন্দাবনেই তালাচাবি দেওয়া থাকবে। শুধু রাধাগোবিন্দের সেবার জন্যেই ভক্ত বৃন্দাবন ছেড়ে যাবেন।

যাঁরা বৃন্দাবন ধারার অনুসরণ করেন তাঁদের কাছে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের

হরে শব্দের অর্থ হরা অর্থাৎ শ্রীমতী রাধারানী। 'হরা' অর্থ 'রাধা' যিনি কৃষ্ণ বা হরির চিত্তকে হরণ করতে পারেন। যিনি চৌর্য্যকার্যে সবচেয়ে পটু, সেই কৃষ্ণেরও হৃদয় যিনি হরণ করতে পারেন, তিনিই হরা। চৌর্য্যপটুতা রাধারাণীর মধ্যেই সর্ব্বোত্তমভাবে দেখা যায়। আর 'কৃষ্ণ' মানে পরম ও চরম অর্থে যিনি সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক। তাঁরা দুজনেই এই মন্ত্রে প্রকাশিত আছেন।

রূপানুগ নাম

যাঁরা রূপানুগ সম্প্রদায়কে অনুসরণ করছেন তাঁদের মহামন্ত্র জপ কখনও এই চেতনা থেকে বিচ্যুত হতে পারে না। আর এই চেতনা নিয়েই তাঁরা হরি-হরা বা রাধাকৃষ্ণের সেবায় যান। তাঁরা রাধাদাস্যে মগ্ন থাকেন। এছাড়া অন্য কোন চিন্তা তাঁরা করতে পারেন না। আর একবার সেই স্তরে পৌঁছবার পরে তাঁরা আর সেই স্তর থেকে, রাধাকৃষ্ণের অভিলাষ থেকে নেমে আসতে পারেন না। তাঁরা নিজেদের সেই বৃত্তের বাইরে যেতে দিতে পারেন না।

আমাদের সর্ব্বোচ্চ, সর্ব্বোত্তম কামনা সেইখানে প্রতিষ্ঠিত। ভক্তের অধিকার বা আধ্যাত্মিক যোগ্যতা অনুযায়ী সেইরকম অর্থ তাঁর হৃদয়ে জেগে উঠবে। সাধনার দ্বারা এই অর্থ আবিষ্কৃত হবে, সাধনার দ্বারা তা জেগে উঠবে। সেইসময়ে হৃদয়ের আবরণ সরে যাবে আর হৃদয়ের ফোয়ারা থেকে স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে চিন্ময় প্রেমের ধারা নির্গত হবে, যা কিনা আত্মার অন্তর্নিহিত বৃত্তি।

নবম অধ্যায়

শ্রীরাধা-দাস্য

একসময় ভরতপুরের দেওয়ান তাঁর পরিবারবর্গকে নিয়ে সবচেয়ে পবিত্র স্থান, শ্রীমতী রাধারাণীর পবিত্র কুন্ডে, শ্রীরাধাকুন্ডে তীর্থ করতে আসেন। তিনি আর তাঁর পরিবার রাধাকুন্ড পরিক্রমা করছিলেন। তাঁরা মাটিতে সটান হয়ে শুয়ে হাতদুটি মাথার উপরে ছড়িয়ে দিয়ে দন্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করছিলেন। প্রত্যেকবার এইভাবে দন্ডবৎ করার সময়ে তাঁদের আঙুলের ডগা মাটির যে জায়গাটা স্পর্শ করছিল সেই জায়গাটা তাঁরা চিহ্নিত করছিলেন। তারপর তাঁরা আস্তে আস্তে উঠে সেই চিহ্নিত জায়গাটায় যাচ্ছিলেন এবং সেইখানে আবার সটান হয়ে শুয়ে খুব শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে দন্ডবৎ করছিলেন। এইভাবে তাঁরা সমস্ত রাধাকুন্ড পরিক্রমা করছিলেন। তাঁদের এই তীব্র ভজন দেখে আমাদের গুরুমহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের একজন অন্তরঙ্গ শিষ্য পরমানন্দ প্রভু (শ্রীল পরমানন্দ বিদ্যারত্ন) প্রভুপাদকে মৃদুস্বরে বললেন দেওয়ান ও তাঁর পরিবারের নিশ্চয়ই রাধারাণীর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে যখন তাঁরা এইভাবে রাধাকুন্ড পরিক্রমা করছেন।

সেইসময়ে প্রভুপাদ বললেন 'রাধারাণী ও রাধাকুন্ড সম্বন্ধে তাঁদের দৃষ্টিকোণ আমাদের থেকে পৃথক। তাঁরা কৃষ্ণকে মানেন ও ভক্তি করেন। আর যেহেতু রাধারাণী কৃষ্ণের প্রিয় তাই রাধাকুন্ডের প্রতিও তাঁদের কিছু ভক্তি আছে। কিন্তু আমাদের দর্শন তার উলটো। আমাদের সম্পর্ক রাধারাণীরই সঙ্গে। আর যেহেতু তিনি কৃষ্ণকে চান তাই আমরাও কৃষ্ণের সঙ্গে যোগাযোগ চাই।'

আর তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা শুধু রাধারাণীকেই জানেন। তাঁদের সম্পর্ক

শুধু তাঁরই সঙ্গে। তাঁর ক্রিয়াকর্ম্ম আর তাঁর প্রয়োজনের সঙ্গে। তাঁরা সর্ব্বতোভাবে তাঁর সেবা করতে প্রস্তুত আছেন এবং তাঁকে ছাড়া তাঁরা কোন সেবার কথা চিন্তাই করতে পারেন না। এটাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সর্ব্বোচ্চ সাধন আর এটাই মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁর বিলাপকুসুমাঞ্জলীতে এই কথাই ঘোষণা করেছিলেন ঃ

আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ কথঞ্চিৎ
কালো ময়াতিগমিতঃ কিল সাম্প্রতং হি।
ত্বঞ্চেৎ কৃপাং ময়ি বিধাস্যসি নৈব কিং মে
প্রাণৈ র্ব্রজে ন চ বরোরু ! বকারিণাপি।

(বিলাপকুসুমাঞ্জলি : ১০২)

অর্থাৎ, 'অয়ি বরোরু (সুন্দরী)! আমি অমৃতসিন্ধু লাভের প্রত্যাশায় সম্প্রতি অতিকষ্টে কাল যাপন করছি। এখন যদি তুমি আমায় কৃপা না কর, তবে আমার প্রাণ, ব্রজবাস, এমনকি শ্রীকৃষ্ণেই বা কি প্রয়োজন?'

এই শ্লোক রাধারাণীর প্রতিই সোজাসুজি প্রার্থনা। এখানে এমন একটি বিশেষ আশাকে বর্ণনা করা হয়েছে যা এত সুমিষ্ট ও আশ্বাসজনক যে তাকে অনন্ত অমৃতসিন্ধুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী বলছেন, 'একটি আশা আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে আর আমার অস্তিত্বকে পুষ্টি দিচ্ছে। সেই আশা নিয়েই আমি কোনরকমে আমার দিন কাটাচ্ছি আর এই ক্লান্তিকর সময়ের মধ্যে আমার জীবনটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছি। সেই আশার অমৃতসিন্ধু আমাকে তাঁর দিকে টানছে আর আমাকে বাঁচিয়ে রাখছে। কিন্তু আমার ধৈর্য্য তার শেষ বিন্দুতে এসে পৌঁছেছে, এ আমি আর সহ্য করতে পারছি না। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।

এই মুহুর্তে তুমি যদি তোমার কৃপা আমাকে না দেখাও তাহলে আমি শেষ হয়ে যাব। আমার ভবিষ্যতের সম্ভাবনা চিরকালের জন্যে লুপ্ত হয়ে যাবে। আমার আর বেঁচে থাকার কোন ইচ্ছে থাকবে না। আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে। তোমার কৃপা ছাড়া আমি আর এক মূহুর্ত্তও বাঁচতে চাই না। আর এই বৃন্দাবন যা কিনা আমার প্রাণের চেয়েও প্রিয় তাতেও আমার

বিরক্তি এসে গেছে। এই বৃন্দাবন আমার কাছে এখন কষ্টকর, এ সবসময়ে আমাকে ব্যথা দিচ্ছে। আর অন্য কিছুর কথা আর কি বলব, এমনকি কৃষ্ণের উপরেও আমার বিরক্তি এসে গেছে। এমন কথা বলতে লজ্জা হওয়া উচিত। কিন্তু কৃষ্ণের প্রতিও আমার কোন প্রেম থাকবে না যদি না এবং যতক্ষণ না তুমি আমাকে তোমার অন্তরঙ্গ সেবার দলে নিচ্ছ।'' এই হল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর প্রার্থনা।

শ্রীল প্রভুপাদ যখন এই শ্লোকের ব্যাখ্যা আরম্ভ করতেন তখন তাঁর অবয়বের রূপান্তর হত। তিনি ভাবাবেগে পরিপূর্ণ হয়ে যেতেন আর তাঁর আনন অপ্রাকৃত রূপ ধারণ করত।

এই শ্লোকে শ্রীরঘুনাথ দাসগোস্বামী এক চরম ঝুঁকি নিয়ে বলছেন 'হে রাধা, তোমার কৃপা যদি আমি না পাই তাহলে আমি কিছুই চাই না। আমি তোমাকে চাই আর শুধু তোমাকেই চাই। তোমাকে বাদ দিয়ে আর কারোর সঙ্গে কোন সম্পর্ক করা আমার জীবনে অসম্ভব। তুমিই থাকবে সবার আগে, আর সবাই পরে। তোমাকে ছাড়া আমি কৃষ্ণের সঙ্গেও কোন আলাদা সম্পর্ক চিন্তাও করতে পারি না।'

শ্রীভক্তিবেদান্ত স্বামী মহারাজ লিখেছেন যে রাধারাণী সঙ্গে না থাকলে কৃষ্ণও তত সুন্দর নন। সবকিছুই আপেক্ষিক, সবকিছুই অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে। শিক্ষক তার ছাত্রের উপর নির্ভর করেন, আবার ছাত্রও শিক্ষকের উপর নির্ভর করে। যদিও কৃষ্ণ হলেন ভোক্তা, আহ্লাদময়, তবুও তিনি তাঁর ভোগ্যা, তাঁর হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধারাণীর উপর নির্ভর করেন। দুটি পরস্পর সম্পর্কিত, একটিকে আর একটির সঙ্গে পৃথক করা যায় না। কৃষ্ণের ভোগ্যা হিসেবে রাধারাণীও সম্পূর্ণরূপে তাঁর ভোক্তা কৃষ্ণের উপর নির্ভর করেন।

রাধারাণী বলেন, 'আমার ভাগ্যকে চিরকালের জন্যে হারিয়েছি, কারণ আমি বহু জায়গায় নিজেকে বিকিয়েছি। যখন আমি বাঁশী শুনলাম তখন আমি সেই বাঁশীর সুরের কাছে নিজেকে সমর্পণ করলাম। যখন আমি কৃষ্ণনাম শুনলাম তখন আমি সেই নামের কাছে নিজেকে নিবেদন করলাম। আর যখন আমি কৃষ্ণের সুন্দর চিত্র দেখলাম তখন আমি সেই চিত্রের

কাছে নিজেকে নিবেদন করলাম। সুতরাং আমি তিন জায়গায় সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বিকিয়েছি। তাই আমার জীবনে সুখশান্তির আর কোন আশা নেই। আমি যদি নিজেকে কেবল একজায়গায় নিবেদন করতাম তাহলে হয়ত আমার শান্তির কোন সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু আমি তিনটি পৃথক জায়গায় নিজেকে নিবেদন করেছি বলে আমার আর কোন আশা নেই।

যখন আমি কৃষ্ণের চিত্র দেখলাম তখন আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। সেই সুন্দর মূর্ত্তির কাছে নিজেকে দিয়ে দেওয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। তাই আমি সম্পূর্ণভাবে নিজেকে নিবেদন করলাম। কৃষ্ণনামও আমাকে সম্পূর্ণরূপে কিনে নিল। আর তাঁর বাঁশীর সেই মধুর সুর তাও আমাকে টেনে নিয়ে গেছে চরম আত্মনিবেদনের দিকে। তাই আমার জীবনে আমি আর কি করে শান্তির আশা করতে পারি? হে সখী, এ অসম্ভব।' সেইসময় রাধারাণী জানতেন না যে কৃষ্ণের বাঁশী, তাঁর নাম, আর তাঁর রূপের উৎস একই জায়গায়। যদি তিনি দেখতে পেতেন কি করে তারা তিনজনে একই জায়গায় মিশেছে তাহলে তাঁর মনে শান্তির সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু এই তত্ত্বকে বোঝা খুব শক্ত।

কি করে কৃষ্ণের বাঁশীর সুর, তাঁর নামের শব্দ, তাঁর রূপের ছবি কৃষ্ণ থেকে আলাদা হতে পারে? এ হল আদর্শ। হেগেলের ভাষায় 'আদর্শ বাস্তব'। পরম তত্ত্বকে কোন অবাস্তব, অবোধ্য ধারণা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়না, পরন্তু এই পরমতত্ত্বই সমস্ত অস্তিত্বের ভিত্তি। বাস্তবতা সেখানে আছে কিন্তু সে হল আদর্শ বাস্তব। আর বৃন্দাবনের বাস্তবতার ভিত্তি আমাদের দেবেন নিত্যানন্দ, বলদেব,

"নিতাই এর করুণা হবে ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে
ধর নিতাইচরণ দুখানি।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর 'শরণাগতি'তে রাধারাণীর অবস্থান কোথায় দেখিয়েছেন। তিনি বলেছেন 'যাঁদের হৃদয়ে রাধারাণীর সেবা আছে আমি তাঁদের সেবা করতে চাই। আমি তাঁদের চরণধূলির সেবা করতে চাই যাঁদের ঐশ্বর্য্য হল রাধারাণীর সেবা।

সখীগণ মম পরম-সুহৃৎ
যুগল প্রেমের গুরু।
তদনুগ হয়ে সেবিব রাধার
চরণ-কলপ-তরু।।

(শরণাগতি ১৬)

অন্যত্র তিনি বলেছেন,

রাধা-ভজনে যদি মতি নাহি ভেলা।
কৃষ্ণ ভজন তব অকারণে গেলা।।
আতপ রহিত সূরয নাহি জানি।
রাধা-বিরহিত মাধব নাহি মানি।।

রাধারাণী হলেন কৃষ্ণের অর্দ্ধ — শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন তিনি হলেন কৃষ্ণের আত্মনিবেদিত অর্দ্ধ। কৃষ্ণের সমস্ত সেবার প্রতিভূ তিনি, কারণ কৃষ্ণের প্রতি তাঁর সেবার তীব্রতা ও ব্যাপকতা দুইই অদ্বিতীয়।

পুরাণের ইতিহাসে অনেক সতীসাধ্বী রমণীর উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যেমন : ইন্দ্রের স্ত্রী শচী, শিবের স্ত্রী সতী, লক্ষ্মীদেবী, দ্বারকায় কৃষ্ণের স্ত্রী সত্যভামা, দ্বারকায় কৃষ্ণের প্রধানা স্ত্রী রুক্মিণী, এমনকি রাধারাণীর বিপক্ষের সখীবৃন্দ যাদের নেত্রী হলেন চন্দ্রাবলী। এঁরা সকলেই রাধারাণীর বিভিন্ন অংশের প্রতিভূ। এঁরা সকলেই সেই এক প্রধান শক্তি থেকে এসেছেন যাঁর নাম রাধা।

রাধা নামটি এসেছে 'আরাধনা' এই শব্দটি থেকে। সুতরাং রাধা অর্থ যিনি কৃষ্ণকে সেবা করতে পারেন, তাঁর পূজা বা আরাধনা করতে পারেন, যিনি কৃষ্ণকে সম্মান দিতে পারেন, যিনি কৃষ্ণকে সত্যই মনপ্রাণ দিয়ে ভালবাসেন, যিনি কৃষ্ণকে অবিরত প্রেমভক্তিময় সেবা দেন। অন্য এইসব রমণী যাঁরা তাঁদের সতীত্ব ও পুণ্যের জন্যে বিখ্যাত তাঁরা সকলেই রাধারাণীর আংশিক প্রতিভূ মাত্র। যদি আমরা শাস্ত্রের প্রতি মনোযোগ দিই এবং এইসব সাধ্বীরমণীদের অবস্থান বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব যে তাঁদের সব সতীত্ব ও ভক্তির উৎস হলেন শ্রীমতী রাধারাণী। তিনি হলেন ভক্তির আদি উৎস। তাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন রাধারাণীর সেবাই যাঁদের একমাত্র ঐশ্বর্য্য

তিনি তাঁদের শ্রীচরণে দন্ডবৎ করেন ও তাঁদের চরণধূলি মাথায় করেন, অন্য কিছুর জন্যে তাঁর অভিলাষ নেই। সুতরাং এই তত্ত্ব যিনি জানেন এবং হৃদয়ে আন্তরিকতা রেখে সবসময়ে এই পথে চলেন তিনিই সবচেয়ে ভাগ্যবান।

একজনের আদর্শই তাঁকে মহান করে, কোন জাগতিক সম্পত্তি নয়। সর্ব্বোচ্চ আদর্শ যাঁর আছে তিনি সত্যিই ধনী। আমাদের সমস্ত সম্পত্তির মধ্যে সর্ব্বোচ্চ আদর্শই সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু। আর যদি আমাদের প্রচেষ্টাকে ঘনীভুত করতে হয় তবে সমস্ত কমদামী জিনিসকে জীবন থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে আর নিজেদের অর্থহীন চেষ্টা থেকে বাঁচাতে হবে। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু সেই সর্ব্বোচ্চ আদর্শকে, সেই চিন্ময় প্রেমের পথকে আমাদের দেখাতে এসেছিলেন। আর তাঁর জীবনে আমরা শ্রীভগবানের প্রতি প্রেমভক্তির চরম তীব্রতা দেখি, আর দেখি শ্রীমদভাগবতমের শিক্ষা। সমস্ত শ্রীমদভাগবতমের উদ্দেশ্য হল সেই চিন্ময় প্রেমের আদর্শ যা শ্রীমতী রাধারাণীর মধ্যে তাঁর পরম পরাকাষ্ঠায় পৌঁছেছে, তাঁর সর্ব্বোচ্চ অভিব্যক্তি পেয়েছে, তাকেই অঙ্কন করা।

রাধাকৃষ্ণের পরকীয়া প্রেমের সম্পর্ককে শ্রীমদভাগবতম খুব গৌরবের সঙ্গে গেয়েছেন। বেদ ও অন্যান্য পুরাণে এই গূঢ়লীলাকে তেমন ভাবে প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু শ্রীমদভাগবতমে আমরা রাধাকৃষ্ণের মাহাত্ম্যের একটি আভাস পাই। আর গোস্বামীরা তাঁদের লেখনীতে রাধারাণীর প্রেমভক্তিকে আরও পূর্ণভাবে প্রকাশ করছেন। রূপগোস্বামীর পদাবলীতে আমরা দেখি রাধারাণী কৃষ্ণকে বলছেন, 'প্রভু, লোকে বলে তোমার সঙ্গে আমার যোগাযোগের জন্যে আমার কুখ্যাতি রটেছে। এর জন্যে আমি মনে কোন কষ্ট পাই না। আমার চিন্তা হল এই যে আমি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে তোমার কাছে দিতে পারিনি। লোকে সাধারণত বলে যে তোমার সঙ্গে আমার অবৈধ যোগাযোগ আছে, কিন্তু আমাকে যা অশান্তি দেয় তা হল আমি সত্যিই তোমার কাছে নিজেকে দিতে পারিনি। আমি মনে করি আমি তোমার সেবার যোগ্য নই। এইটাই আমার মনে একমাত্র কষ্ট।'

আর এই চিন্ময় প্রেমের আনন্দ বিরহে বা বিপ্রলম্ভে আরও বেড়ে যায়।

একদিন কৃষ্ণ যখন বৃন্দাবনের গোচারণ ভূমিতে তাঁর গোপকিশোর সখাদের সঙ্গে খেলছিলেন, হঠাৎ তিনি রাধারাণীর জন্যে তীব্র বিরহ অনুভব করলেন। তিনি তাঁর প্রাণের বন্ধু সুবলকে রাধারাণীর কাছে পাঠাবেন বলে বললেন, 'তুমি যাও রাধার কাছে আর তাঁকে আমার কাছে নিয়ে এস। হঠাৎ তাঁর সঙ্গ পাওয়ার জন্যে আমার এমন ব্যাকুল বাসনা হয়েছে যে আমি তা আর সহ্য করতে পারছি না। যেমন করে হোক তাঁকে নিয়ে এস। সুবল বললেন, এই দিনের বেলায় বনের মধ্যে তাঁকে কি করে নিয়ে আসা সম্ভব?' কৃষ্ণ বললেন, 'সে তুমি যেমন করে পার নিয়ে এস।'

সুবল ভাবতে লাগলেন, 'আমি এখন কি করি?' রাধারাণীর শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সুবলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তিনি রাধারাণীর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সখীদের বললেন, 'কৃষ্ণ আর একমূহুর্তও রাধারাণীর বিরহ সহ্য করতে পারছেন না। তিনি রাধারাণীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্যে এত আকুল হয়েছেন যে তিনি প্রায় পাগল হয়ে যাচ্ছেন; কিছু একটা করে তোমাদের ব্যবস্থা করতে হবে তাঁদের দুজনের মিলন ঘটাবার।'

গোপীরা বললেন, 'তা কি করে সম্ভব?' সুবল তাঁদের বললেন কৃষ্ণ কাছেই একটা বনে রয়েছেন। তখন তাঁরা সব নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে লাগলেন কি করা যায়। সুবল একজন রূপবান কিশোর যাঁর সঙ্গে রাধারাণীর মুখের সাদৃশ্য আছে। তাই সুবল রাধারাণীর বেশ ধরলেন আর রাধারাণী সুবলের গোপকিশোরের বেশ ধরলেন।

যখন রাধারাণীকে সুবলের পরিচ্ছদে দেখা গেল তখন রাধারাণীর পরিবারের লোকেরা এসে তাকে তাড়া দিতে লাগল, 'সুবল। তুমি এখানে কি করছ?' সুবলের বেশে রাধারাণী বললেন, 'একটা বাছুরকে পাওয়া যাচ্ছে না আর তার মা খুব কান্নাকাটি করছে। আমি তাই এখানে সেই বাছুরের খোঁজে এসেছি।' তখন সখীরা তাঁকে একটা বাছুর দিল আর সেই বাছুরকে বুকের উপর ধরে সুবলের ছদ্মবেশে রাধারাণী বনে চলে গেলেন। আর সুবল রাধারাণীর ছদ্মবেশে রাধারাণীর ঘরে থেকে গেলেন।

কৃষ্ণ বনের কোথায় লুকিয়ে আছেন সেবিষয়ে সুবল রাধারাণীকে একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। রাধারাণী সেখানে তাঁকে খুঁজতে গেলেন। অবশেষে

রাধারাণী যখন কৃষ্ণকে দেখতে পেলেন তখন সুবলের বেশেই তিনি তাঁর কাছে গেলেন। কৃষ্ণ পাগলের মত হয়েছিলেন। তিনি ধরতে পারলেন না যে রাধারাণীই এসেছেন, তিনি তাঁকে সুবল মনে করলেন। কৃষ্ণ বললেন 'ও সুবল! তুমি রাধারাণীকে ছাড়াই এলে! তুমি তাঁকে আনতে পারলে না?'

তখন রাধারাণী পরিহাস শুরু করলেন। তিনি বললেন 'না, এ দিনের বেলায় তাঁকে আনা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল।' কৃষ্ণ বললেন 'তবে আমি এখন কি করি? আমার জীবন আর সহ্য হচ্ছে না আমার!' রাধারাণী বললেন, 'যদি তুমি বল তবে আমি চন্দ্রাবলীকে গিয়ে নিয়ে আসতে পারি।' কৃষ্ণ বললেন, 'না, না, দুধের স্বাদ কখনও ঘোলে মেটে না। তা সম্ভব নয়।' হতাশায় কৃষ্ণ ম্রিয়মান হয়ে গেলেন। তখন রাধারাণী তাকে আলিঙ্গন করে বললেন, 'প্রভু তোমার দাসীকে তুমি চিনতে পারলে না? তুমি আমাকে চিনতে পারলে না!' তখন কৃষ্ণ আনন্দে উচ্ছল হলেন।

যদিও শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলা শাস্ত্রে উল্লেখিত হয়েছে তবু এ সমস্ত খুবই গূঢ় ও উচ্চ তত্ত্ব। সাধারণত এসব লীলা ভাষায় ব্যক্ত করার নয়, তবুও আমরা কখনও কখনও এসব কথা বলতে বাধ্য হই কারণ শ্রীমদভাগবতমে চিন্ময় প্রেমের যে উচ্চ আদর্শ দেওয়া হয়েছে তাই হল জীবনের পরম লক্ষ্য। অবশ্য শুকদেব গোস্বামী আর শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পান্ডিত্য খানিকটা সাহায্য করেছে এই তত্ত্বের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করতে, যে প্রেম হল জ্ঞানের উপরে। একথা সকলেই স্বীকার করতেন যে বিদ্বানদের মধ্যে শুকদেবের সাফল্য ছিল সর্ব্বোচ্চ, সব বিদ্বানরা একযোগে স্বীকার করতেন যে শুকদেবের স্থান ছিল সবার উপরে। সেজন্যে শুকদেব গোস্বামী যখন এই তত্ত্বকে প্রবর্ত্তন করতে এলেন যে চিন্ময় প্রেমের স্থান অন্য সবকিছুর উপরে, তখন বিদ্বানদের সেদিকে মন দিতে হল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পন্ডিতদের দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁর বুদ্ধি ও বিদ্যা অন্য সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তাই তিনি যখন চিন্ময় প্রেমের সংবাদ আনলেন তখন সাধারণ লোকের পক্ষে সহজ হয়েছিল তাঁকেই সর্ব্বোচ্চ আদর্শ বলে গ্রহণ করা আর তার জন্যে চেষ্টা করা।

তাই বাসুদেব ঘোষ গেয়েছেন—

'যদি গৌর না হইত তবে কি হইত
কেমনে ধরিতাম দে।'

মহাপ্রভু যদি এ কলিযুগে না আবির্ভূত হতেন তবে আমাদের জীবনকে আমরা সহ্য করতাম কি করে? আমরা বেঁচে থাকতাম কি করে? তিনি যা দিয়েছেন — যা জীবনের সারবস্তু, যা জীবনের একমাত্র স্বাদুবস্তু, যা জীবনের মাধুর্য্য — তাকে ছাড়া আমাদের মনে হয় এই পৃথিবীতে কারোর পক্ষে বেঁচে থাকাই অসম্ভব। এমন একটি বস্তু আবিষ্কৃত হয়েছিল, আবিষ্কৃত হয়েছিল শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বারা। তিনি যদি না আসতেন তবে আমরা কেমন করে বাঁচতাম? এই চিন্ময় প্রেমের মত পবিত্র ও কৃপাময় বস্তু ছাড়া বেঁচে থাকাই অসম্ভব। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছাড়া কে আমাদের জানাত যে চিন্ময় প্রেমের জগতে রাধারাণীর স্থানই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ? এইসব বস্তু আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি আর এখন আমরা মনে করি জীবনের কোন অর্থ আছে। তা না হলে বেঁচে থাকা আত্মহত্যারই সামিল হত।

আর যাঁরা রাধারাণীকে সেবা করেন তাঁদের সেবা করাই তাঁর এলাকায় যাবার উপায়। দাসীর দাসীর সেবা করেই আমরা কৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে সফল হব এই আশ্বাস অমাদের দেওয়া হয়েছে। যদি কোনভাবে কেউ শ্রীমতী রাধারাণীর দাসীর দলে গণ্য হতে পারেন, তবে তাঁর ভবিষ্যতের সাফল্য নিশ্চিত।

রাধারাণীর সেবিকার দলে আমরা রূপানুগা হবার অভিলাষ করি। আর যাঁরা রূপমঞ্জরী বা শ্রীরূপের অনুগত, তাঁদের প্রবল আগ্রহ আছে তাঁর আজ্ঞা পালন করার, তাঁর ধারাকে রক্ষা করার, যেমন তাঁর আগ্রহ আছে ললিতার প্রতি। এইভাবে রূপগোস্বামীর মাধ্যমে আমাদের প্রেমভক্তির সেবা সর্ব্বোচ্চ স্থানে পৌঁছবে। আর সেখানেই আমাদের পরম প্রাপ্তি। এমনকি রাধারাণী বা ললিতা দেবীর সঙ্গে যোগাযোগও আমাদের জীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য নয়, পরন্তু রূপানুগ সম্প্রদায়ের সেবাই আমাদের সর্ব্বোচ্চ অভিলাষ, তার অর্থ শ্রীরূপের সঙ্গে যোগাযোগই আমাদের সর্ব্বোচ্চ সাফল্য।

রাধাদাস্যকেই সর্ব্বোচ্চ প্রাপ্তি বলা হয়েছে। কেন? রাধারাণী কৃষ্ণের কাছ থেকে যে রস নিষ্কাশন করেন তার গুণ ও পরিমাণ অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। তাই কেউ যদি ঠিক রাধারাণীর পিছনে থাকে তাহলে সে যে সবচেয়ে বেশী রস আস্বাদন করতে পারবে তাই নয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রসও আস্বাদন করবে।

অন্য কেউই কৃষ্ণের কাছ থেকে এমন নিগূঢ় রস পেতে পারে না। রাধারাণীর সঙ্গেতেই কৃষ্ণের সম্পূর্ণ নিগূঢ়তম রস পাওয়া যায়, সেখানেই তিনি নিজের সবকিছু সম্পূর্ণভাবে ও গভীরভাবে দান করেন। তাই কেউ যদি শ্রীরূপের সম্প্রদায়ের থাকে তবে সেও সেইরকম রসের আস্বাদন পাবে।

রাধারাণীর দলে যখন রাধাকৃষ্ণ কোন নির্জ্জন স্থানে তাঁদের খুব অন্তরঙ্গ লীলা উপভোগ করেন তখন প্রাপ্তবয়স্কা সখীরা সেই কুঞ্জে বা কক্ষে গিয়ে তাদের সাহায্য করতে যেতে চান না। তখন মঞ্জরীরা, যারা বালিকা বা কিশোরী, তাদের সেখানে পাঠানো হয়। যেখানে রাধাগোবিন্দ খুব ঘনিষ্ঠভাবে রয়েছেন, সেখানে সখীরা লীলার ব্যাঘাত হবে এই ভয়ে যেতে পারেন না, সেখানে এই কিশোরীদের নেত্রী যেতে পারেন। তাদের অল্প বয়সের জন্যে শ্রীরূপমঞ্জরী ও অন্য মঞ্জরীরা সেখানে যেতে পারেন। সেইরকম রস যা সখীদের মাধ্যমেও পাওয়া যায় না, তা মঞ্জরীদের মাধ্যমে পাওয়া যায়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেখানে প্রবেশাধিকার পাওয়ার জন্যে প্রার্থনা করেছেন। এইরকম উচ্চপ্রকৃতির আকাঙ্খা তাঁর ছিল। তিনি বলেছেন 'রূপানুগ হইতে সে ধায়।' তিনি সেই শ্রীরূপের দলে ভর্ত্তি হবেন বলে ব্যাকুল হন, যিনি আমাদের সেইরকম সম্ভাবনা দিতে পারেন। এইসব তত্ত্বের উপলব্ধি হওয়ার জন্যে যা প্রয়োজন তাকে শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী বর্ণনা করেছেন :

যথা যথা গৌরপদারবিন্দে, বিন্দেত ভক্তিং কৃতপুণ্যরাশিঃ।
তথা তথোৎসর্পতি হৃদ্যকস্মাৎ রাধাপদাম্ভোজ-সুধাম্বুরাশিঃ।।

(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত — ৮৮)

অর্থাৎ 'পূণ্যাত্মা ভক্ত সাধকের শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে যে পরিমাণে

ভক্তির উদয় হবে, সেই অনুপাতে তাঁর হৃদয়ে অকস্মাৎ শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণকমল-সুধাম্বুরাশি উচ্ছলিত হয়ে উঠবে।'

তিনি বলেছেন যতই তুমি শ্রীগৌরাঙ্গের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করবে ততই তুমি রাধাগোবিন্দের সেবায় সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। সোজাসুজি রাধা-গোবিন্দের কাছে যাওয়ার চেষ্টা কোর না, তা যদি কর তাহলে অসুবিধায় পড়বে। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গের চরণপদ্মের আশ্রয় সেখানে তোমাকে নিরাপদে নিয়ে যাবে।

শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রতি নিবেদিত আমার সংস্কৃত স্তবে আমি এইসব তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছিলাম।

শ্রীগৌরানুমতং স্বরূপবিদিতং রূপাগ্রজেনাদৃতং
রূপাদ্যৈঃ পরিবেশিতং রঘুগণৈরাস্বাদিতং সেবিতম্।
জীবাদ্যৈরভিরক্ষিতং শুক-শিব-ব্রহ্মাদি-সম্মানিতং
শ্রীরাধাপদসেবনামৃতমহো তদ্দাতুমীশো ভবান্।।

(শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ বিরহদশকম্ — ৯)

অর্থাৎ, 'শ্রীগৌরচন্দ্রের অনুপালক শ্রীস্বরূপ দামোদর যার মর্ম্মজ্ঞ, শ্রীসনাতন গোস্বামী যার আদরকারী, শ্রীরূপপ্রমুখ রসতত্ত্বাচার্য্যগণ যা পরিবেশন করছেন, শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রমুখ যা আস্বাদন ও সমৃদ্ধ করছেন, শ্রীজীবপ্রভু প্রভৃতি যার রক্ষণাবেক্ষণ করছেন এবং শ্রীশুক, দেবাদিদেব মহাদেব ও লোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রভৃতি যা (দূর থেকে) সম্মান করছেন — অহো সেই শ্রীরাধাপদপরিচর্য্যা রসামৃত তাও দান করতে আপনি সমর্থ।'

তাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীভগবানের ঔদার্য্যময় অবতার, আমাদের পরম-কারুণিক প্রভু এসেছিলেন তাঁর বহুদিনের হারানো ভৃত্যদের প্রেমময় অন্বেষণে, চিন্ময় প্রেমের এই পরম আদর্শ তাদের দান করবেন বলে।

নিতাই গৌর হরিবোল।

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠের প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসকুলবরেণ্য

শ্রীল ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেবগোস্বামী মহারাজের গ্রন্থাবলী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সম্পাদিত)
শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু (সম্পাদিত)
শ্রীপ্রপন্নজীবনামৃতম্
শ্রীপ্রেমধাম দেব-স্তোত্রম্
অমৃতবিদ্যা (বাংলা, উড়িয়া)
শ্রীশিক্ষাষ্টক
সুবর্ণ সোপান
শ্রীগুরুদেব ও তাঁর করুণা
শাশ্বত সুখনিকেতন
শ্রীভক্তিরক্ষক দিব্যবাণী
প্রেমময় অন্বেষণ
Centenary Anthology
Golden Staircase
Heart and Halo
Home Comfort
Holy Engagement
Inner Fulfilment
Life Nectar of the Surrendered Souls
(Sri Sri Prapanna-jivanamritam)
Loving Search for the Lost Servant
Sermons of the Guardian of Devotion
(Vol I, II, III, & IV)
Sri Guru and His Grace
Srimad Bhagavad-Gita-
The Hidden Treasure of the Sweet Absolute
Subjective Evolution of Consciousness
The Golden Volcano of Divine Love
The Search for Sri Krishna Reality the Beautiful

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ দেবগোস্বামী মহারাজের ও তাঁর সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী

Benedictine Tree of Divine Aspiration
Dignity of the Divine Servitor
Divine Guidance
Divine Message for the Devotees
Golden Reflections
Original Source
The Divine Servitor

শ্রীভক্তিকল্পবৃক্ষ
রচনামৃত

নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ থেকে প্রকাশিত ও প্রাপ্তব্য অন্যান্য গ্রন্থাবলী

শ্রীব্রহ্মসংহিতা
শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম
গর্গসংহিতা
শ্রীগৌড়ীয় গীতাঞ্জলী
শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য
শ্রীনবদ্বীপ ভাবতরঙ্গ
শ্রীনামতত্ত্ব নামাভাস ও নামাপরাধ বিচার
শ্রীনাম ভজন বিচার ও প্রণালী
শরণাগতি
কল্যাণকল্পতরু
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত
শ্রীচৈতন্যভাগবত
শ্রীহরিনাম মাহাত্ম্য ও নামাপরাধ

ভারত ও বহির্ভারতের প্রধান কেন্দ্রসমূহ

ঃ সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র ঃ

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ

কোলেরগঞ্জ, নবদ্বীপ, নদীয়া, পিন ৭৪১ ৩০২ ফোন—(০৩৪৭২) ৪০০৮৬/৪০৭৫২
Email : govindam@scsmath.com Website: www.scsmath.com

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
৪৮৭, দমদম পার্ক, ৩ নং পুকুরের নিকট,
কোলকাতা—৭০০ ০৫৫
ফোন—৫৫১-৯১৭৫ / ৫৪৯-৬৪০৮

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
বিধবা আশ্রম রোড, গৌরবাটসাহী,
পুরী, উড়িষ্যা
পিন—৭৫২ ০০১
ফোন—(০৬৭৫২) ৩১৪১৩

শ্রীচৈতন্য সারস্বত আশ্রম
গ্রাম ও পোঃ—হাপানিয়া,
জেলা—বর্দ্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন—(০৩৪৫৩) ৪৯৫০৫

শ্রীচৈতন্য সারস্বত কৃষ্ণানুশীলন সংঘ
কৈখালী, চিড়িয়ামোড়, পোঃ এয়ারপোর্ট,
কোলকাতা—৭০০ ০৫২
ফোন—(০৩৩) ৫৭৩ ৫৪২৮

শ্রীল শ্রীধরস্বামী সেবাশ্রম
দশবিসা, পোঃ গোবর্দ্ধন, মথুরা,
উত্তর প্রদেশ—২৮১৫০২
ফোন—(০৫৬৫) ৮১৫ ৪৯৫

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
৯৬, সেবাকুঞ্জ, বৃন্দাবন, মথুরা
উত্তরপ্রদেশ—২৮১ ১২১
ফোন—(০৫৬৫) ৪৪৬ ৭৭৮

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ
E466 Green Street, London, E13 9DB, U.K.
Phone : 020 8552 3551

শ্রীচৈতন্য সারস্বত সেবাশ্রম
2900 North Rodeo Gulch Road,
Soquel, California,
CA 95073, U.S.A.
Phone (831) 462 4712

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর মিশন
শ্রীগোবিন্দধাম
P.O. Box 72, Uki,
Via Murwillumbah, N.S.W. 2484,
Australia
Phone (066) 795541

শ্রীল ভক্তিসুন্দর গোবিন্দ আশ্রম
নবদ্বীপ ধাম রোড
Long Mountain, Mauritius
Phone (230) 245 3118

শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ
Pin 197229 St. Petersburg,
P. Lahta, Ul. Morskaya h. 13,
Russia,
Phone (812) 238 2989

শ্রীচৈতন্য সারস্বত শ্রীধর সেবাশ্রম
A.R. Calle 69-B, No 537,
Fracc. Santa Isabel, Kanasin,
Yucatan, c.p. 97370,
Mexico,
Phone (52-99) 82-84-44

কৃষ্ণ যখন চিন্ময় জগত থেকে শব্দরূপে হৃদয়ে অবতরণ করেন এবং হৃদয় থেকে স্নায়ুতন্ত্রের সমস্ত অংশ অধিকার করে মুখের মধ্যে এসে নৃত্য করেন সেই হল কৃষ্ণনাম। তার উৎস হল চিন্ময় জগতে। সেই শব্দের সৃষ্টি শারীরিক স্তরে নয়। সেই চিন্ময় শব্দকে এই স্তরে নেমে আসতে হবে, তিনি নেমে আসতে পারেন, কিন্তু আমরা এত সহজে সেখানে উঠে যেতে পারি না। তিনি হলেন পরমকর্ত্তা, আমরা তাঁর অধীনে আছি। তাঁর স্বতন্ত্রতার মধ্যে আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারি না। কেবলমাত্র আত্মসমর্পণের দৈন্যময়ী শক্তির দ্বারাই আমরা সেই পরমপুরুষকে আকর্ষণ করতে পারি আমাদের স্তরে নেমে আসার জন্যে। সুতরাং শ্রীনাম আমাদের ইন্দ্রিয়ের সৃষ্টি নয়। শ্রীনামকে তখনই উপলব্ধি করা যাবে যখন আমরা শ্রীভগবানের কাছে যাব তীব্র সেবার মনোভাব নিয়ে। সেইসময়ে আমাদের সেবাপ্রবৃত্তি দ্বারা আকর্ষিত হয়ে কৃষ্ণ নিজেই নেমে আসতে পারেন তাঁর কৃপার দ্বারা।

ভগবান তাঁর হারানো ভৃত্যদের জন্যে যে অন্বেষণ করেন, সে এক প্রেমময় অন্বেষণ। এই অন্বেষণ কোন সামান্য জিনিস নয়, এ হল তাঁর হৃদয়ের বস্তু। আর ভগবানের হৃদয়ও তো সামান্য হৃদয় নয়। তিনি আমাদের জন্যে কি ব্যাকুলতার সঙ্গে সন্ধান করেছেন কে তার পরিমাপ করতে পারে? যদিও তিনি পূর্ণব্রহ্ম, আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ, তবুও আমাদের প্রত্যেকের জন্যে – সে যত ক্ষুদ্রই আমরা হই না কেন – তিনি বিরহবেদনা ভোগ করেন। যদিও তিনি স্বয়ং পরমেশ্বর, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তবুও তাঁর অনন্ত প্রেমময় হৃদয়ে আমাদের সকলের জন্যই একটি স্থান আছে। যিনি অনন্ত তাঁর প্রকৃতিই এইরকম। কৃষ্ণ হলেন এইরকম পরম সার্ব্বভৌম, পরম মঙ্গলময়, পরম প্রেমময় ভগবান।

শ্রীচৈতন্য-সারস্বত মঠ